শাহজাদা খসরু

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা।

১৩৪৮

মূল্য দুই টাকা।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

শাহজাদা খসরু, পাঠকবর্গের করকমলে অর্পিত হইল। দৈহিক অসুস্থতা প্রভৃতি নানা বিঘ্ন ঘটায়—উপন্যাসখানি বাহির হইতে একটু বিলম্ব ঘটিয়াছে। এজন্য আমার চিরানুগ্রাহক সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

শাহজাদা খসরু, সম্রাট আকবরের পৌত্র—জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র। নানা বিপ্লবময় ঘটনার মধ্যে, তাঁহার জীবন কাটিয়াছিল। খসরু বাঁচিয়া থাকিলে, সাহজাহান সম্রাট হইতেন কিনা সন্দেহ! সাহজাহান কি ভয়ানক উপায় অবলম্বনে, হিন্দুস্থানের সিংহাসনাধিকার করিয়াছিলেন, সে রহস্য আমার পরবর্ত্তী উপন্যাস "সম্রাজ্ঞী নূরজাহানে" প্রকাশ করিব। পাঠকগণ আশা প্রতীক্ষায় থাকুন।

ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর, তদুপরি কল্পনা সহায়ে, শাহজাদা খসরুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা। উপন্যাসখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে, পাঠকপাঠিকা মোগলরাজত্বের অনেক রহস্যময় ঘটনাই জানিতে পারিবেন। আর তাঁহাদের নিকট আমার সবিনয় অনুরোধ, সর্ব্ববিধ ত্রুটি ত্যাগ করিয়া, এই নবপ্রকাশিত উপন্যাসখানিকে পূর্ব্ববৎ স্নেহচক্ষে দেখিলে, বড়ই বাধিত হইব।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

শাহজাদা খসরু

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"দুর্জ্জয় সিংহ ?"

"অনুমতি করুন, শাহজাদা !"

"চুপ্—চুপ্ ! শাহজাদা' বলিও না। এই গুহাবেষ্টনকারী পাষাণেরও কাণ আছে—চেতনা আছে। আর একথাও মনে রাখিও, লুক্কায়িত গুপ্ত শত্রুর শ্রবণশক্তি, অতি তীক্ষ্ণ।"

"বুঝিয়াছি। এখন জনাবালির আদেশ কি ?"

"দুর্জ্জয়। তোমার কোষনিবদ্ধ তীক্ষ্ণধার অসি বাহির কর।"

"করিলাম।"

"অসি স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর।"

"প্রতিজ্ঞার বিষয়টী কি—আগে যে জানিতে চাই জনাব !"

"কিন্তু তুমি প্রথম হইতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যে—কোন প্রশ্ন না করিয়া আমার আদেশ পালন করিবে।"

"সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা, এই সমস্যাময় কার্য্যক্ষেত্রে পালন করা অসম্ভব।"

"কেন ?"

"এখনও আপনার মনের সংকল্প ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। ইতিপূর্ব্বে অন্য কিছু ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু এখন—"

"এখন তাহা হইলে আমার মনের সংকল্প বুঝিতে পারিয়াছ দুর্জ্জয় ?"

"পারিয়াছি বই কি।"

"কি বল দেখি ?"

"মহারাজ মানসিংহকে হত্যা করাই আপনার মনের সংকল্প।"

"সত্যই—তাই।"

"কিন্তু আগে যেন বুঝিয়াছিলাম, শাহজাদা সেলিমই আপনার লক্ষ্য।"

"ছিলেন বটে—এখন নয়। দুর্জ্জয়! আমার গর্ভধারিণী যোধাবাই আমায় বুঝাইয়াছেন, সন্তানের পক্ষে পিতা স্বর্গ। পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া পাপ ও কলঙ্ক কিনিও না। সে পাপ-কলঙ্ক অতি ভীষণ। অনন্ত যুগযুগান্তরব্যাপী ভবিষ্য ইতিহাসে, সে কলঙ্ককাহিনী শোণিতাক্ষরে লেখা থাকিবে। তাই আমি পিতৃহত্যার সংকল্প ত্যাগ করিয়াছি।"

"কিন্তু মাতুল হত্যার পাপ ?"

"পিতৃহত্যার ঘোর কলঙ্কময় পাপের তুলনায় তা অতি তুচ্ছ।"

"একথা মহারাজ মানসিংহের ভাগিনেয়ের উপযুক্ত নহে!"

"হোক আর না হোক—তাহার বিচারক তুমি নও। আমি এখনি জানিতে চাই, তুমি আমার সহায়তায় প্রস্তুত আছ কি না? এ কাজের জন্য তোমায় দশ সহস্র আসরফি এনাম্ দিব।"

"লক্ষ আসরফির বিনিময়েও নয়—মোগলের অধিকৃত পুরা হিন্দু-স্থানের বিনিময়েও নয় শাহজাদা! আমি মানসিংহের বিশ্বাসী পার্শ্বচর ও গোলামের গোলাম। মহারাজ মানসিংহ, বহুবার এ অধমের জীবন রক্ষা করিয়াছেন। অম্বর রাজসংসারের অন্নে এ দেহ পুষ্ট। গুপ্তহত্যা

কাপুরুষের কাজ। নীচের কাজ। রাজপুত বীর, এ সমস্ত ঘৃণিত কাজের জন্য, অর্থপণে ক্রীত হইতে চায় না।"

"কিন্তু শাহজাদা সেলিমকে হত্যা করিতে ত তুমি স্বীকৃত হইয়াছিলে ?"

"তার কারণ আছে।"

"কি কারণ জানিতে পারি না কি দুর্জ্জয়সিংহ ?"

"একদিন আগরা রাজপ্রাসাদে সুলতান সেলিম, এক সামান্য ত্রুটির জন্য, আমাকে বড়ই অপমান করিয়াছিলেন। রাজপুত আমি। এ অপমানের প্রতিশোধ এখনও লওয়া হয় নাই।"

"চুপ! আর শুনিতে চাহি না। আমার প্রস্তাবে যখন স্বীকৃত হইলে না—তখন তুমি আমার শত্রু!"

"যদি শত্রু ভাবেন—ত তাই।"

"তোমায় এখান হইতে জীবন্ত ফিরিতে দিব না। এ ক্ষুদ্র গুহা তোমার শোণিত-ধারায় রঞ্জিত হইবে। দুর্জ্জয়সিংহ! এখনিই তোমার অই অসি সমর্পণ কর। না কর—মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।"

"মৃত্যু—মৃত্যু! মৃত্যু তো রাজপুতের খেলার জিনিস শাহজাদা! আমি মরিতে প্রস্তুত। কিন্তু প্রাণ থাকিতে এ অসি সমর্পণ করিব না।"

"কেন ?"

"গৌরবচিহ্নস্বরূপ, মানসিংহ স্বহস্তে এই অসি আমাকে দিয়াছেন।"

"তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। খোদার দোহাই—দুর্জ্জয়! এখনও বিবেচনার সময় আছে।"

"আমিও বলিতেছি—ভগবান্ একলিঙ্গের দোহাই। বিবেচনার সময় থাকিলেও আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত নই।"

"তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।"

"হইয়াছি—"

কোষবিমুক্ত উজ্জ্বল অসি হস্তে, দুর্জ্জয়সিংহ দর্পিতভাবে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গুহামধ্যস্থ স্তিমিত দীপালোকে, সেই সুশাণিত অসি ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। বোধ হইল—যেন দুইটী বিদ্যুত রেখা, সেই অল্পান্ধকারময় গুহামধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

তখন দুইজনেই উন্মুক্ত অসিহস্তে, গুহার বাহিরের এক ক্ষুদ্র উন্মুক্তক্ষেত্রে আসিলেন। সেই বিরলান্ধকারময় সংকীর্ণ গুহাপ্রাঙ্গণে, দুই বীরে মহাযুদ্ধ বাধিল। অসির ঘাত-প্রতিঘাতে প্রতি মুহূর্ত্তেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠিতে লাগিল। সহসা দুর্জ্জয়সিংহের অসি ভগ্ন হইল। হা—দুর্জ্জয়।

দুর্জ্জয়সিংহের আততায়ী আর কেহই নয়—স্বয়ং শাহজাদা খসরু। কি কারণে উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছিল—পূর্ব্বেই পাঠক, তাহার কিছু আভাস পাইয়াছেন।

দুর্জ্জয়সিংহের অসি দ্বিখণ্ডিত হইতে দেখিয়া, খসরু তাহাকে পুনরাক্রমণের জন্য তরবারি লক্ষ্য করিলেন।

রিক্তহস্তে, প্রসারিত বক্ষে অগ্রসর হইয়া, দুর্জ্জয়সিংহ হাস্যমুখে বলিল, "যুবরাজ! মৃত্যু তো রাজপুতের ক্রীড়ার জিনিষ। কিন্তু—"

খসরু অসি নামাইয়া অপেক্ষাকৃত ধীরভাবে বলিলেন—"কিন্তু কি?"

দুর্জ্জয়সিংহ কঠোর বিদ্রূপের সহিত বলিল—"যিনি, দিল্লীর সিংহাসন প্রার্থী, যিনি ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট্—তাঁর প্রাণে এতটা নীচতা?"

"সাবধান! নীচতা—কোথায় দেখিলে?"

"আমার অসি দ্বিখণ্ডিত। আপনার ধমনীতেও রাজপুত শোণিত

প্রবাহিত। মোগলবীরের চিরাভ্যস্ত ধর্ম্ম পালন করুন শাহজাদা ! অস্ত্রহীন আততায়ীকে অস্ত্র দিন।"

"বুঝিলাম—তুমি প্রাণভয়ে ভীত। কথার ছলনায়, আমায় ভুলাইতেছ। তোমায় জীবিত ফিরিয়া যাইতে দিলে, আমার মহা সর্ব্বনাশ হইবে। আমি না বুঝিতে পারিয়াই—তোমাকে অযথা বিশ্বাস করিয়াছিলাম। আমার সে ভ্রম এখন ঘুচিয়াছে। তোমায় বধ না করিলে, অদ্যকার সমস্ত ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তোমার অসি ভগ্ন হইয়াছে। তোমায় সবল হইতে দিব না।"

যুবরাজ খসরু, আর কিছু না বলিয়া, পুনরায় দুর্জ্জয়সিংহের মস্তক লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণধার অসি তুলিলেন। আর সেই মুহূর্ত্তে, এক পরমা সুন্দরী রমণী, সেই স্থানে আসিয়া যুবরাজের মণিবন্ধ সজোরে চাপিয়া ধরিল। শাহজাদা সেই রমণীর শক্তিতে বড়ই অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "রমণি ! তোমার অই পুষ্পকোমল, সুখস্পর্শময়, সৌন্দর্য্যভরা, কোমল বাহুতে কি শক্তি !" বলাবাহুল্য—সেই রমণীর শক্তির প্রভাবে, খসরুর তীক্ষ্ণধার অসি, তাঁহার তখনই হস্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িল।

তখন সেই অসীমসৌন্দর্য্যশালিনী সুন্দরী, বিদ্যুৎবেগে সেই সুতীক্ষ্ণ অসি কুড়াইয়া লইয়া, দুর্জ্জয়সিংহের সম্মুখে ধরিয়া, কঠোর হাস্যের সহিত বলিল,—"দুর্জ্জয় ! এইবার তোমার পালা। এই অসির সহায়তায়, এই রাজকুলকলঙ্কের মস্তক এখনই স্কন্ধচ্যুত করিয়া দাও। মোগলের মসনদ প্রতিদ্বন্দ্বী শূন্য হোক্।"

খসরু, সত্যসত্যই সেই রমণীর বাহুর শক্তি, মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া-

ছিলেন। তাহার উপর তিনি সেই যুবতীর অতুলনীয় রূপরাশি দর্শনে, মোহিত হইয়া, জিঘাংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিলেন।

কি সুন্দর কৃষ্ণতারকাময় দুটি চক্ষু! কি সুন্দর এলায়িত, সংসর্পিত, কুঞ্চিত, অবেণীসম্বদ্ধ, চিকুরজাল! কি তীব্র তেজোব্যঞ্জক দৃষ্টি! আর সেই দৃষ্টিতে কত ঘৃণা—কত বিদ্রূপ! কত উপেক্ষা—কত আত্মম্ভরিতা! আর সেই মৃণাললাঞ্ছিত, পুষ্প-স্পর্শময়, সুকোমল বাহুতে কি দানবী শক্তি!

যুবরাজ খসরু বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে, পলকহীননেত্রে, একদৃষ্টে সেই অনিন্দ্য রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন। চক্ষুর প্রতি পলকে—তিনি সেই রমণীর অফুরন্ত শোভাসম্পদ দেখিয়া, অভিভূত হইলেন। সেই মাধুরীময় অপ্সরকান্তির স্নিগ্ধজ্যোতিতে আত্মহারা হইয়া, তিনি শয়তানের অন্ধতমসাবৃত নারকীয় রাজ্য হইতে, যেন বেহেস্তের উজ্জ্বল জ্যোতিপ্লাবিত, সুখময় রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। কৌতূহলপূর্ণ স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "সুন্দরী তুমি কে?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আগুন ধরিয়াছে দেখিয়া, সেই সুন্দরী অপাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলাইয়া, সেই রক্তলোহিত স্ফুরিতাধরে মৃদু হাসি আনিয়া, ধীরভাবে বলিল—"আমি কে? আমি—এক রাজপুত কন্যা।"

যুবরাজ একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন,—"তাহা ত তোমার অই সুকোমল বাহুর শক্তি হইতেই বুঝিয়াছি। কিন্তু এই দুর্জ্জয়সিংহের জীবন রক্ষার জন্য, তোমার এত আগ্রহ কেন সুন্দরি?"

"কেন—কেন? শুনিবে শাহজাদা! এই দুর্জ্জয়সিংহ, আমার সর্ব্বস্ব—আমার জীবনীশক্তি, প্রাণকোষে প্রাণ, হৃদকোষে শোণিত, ধমনীতে স্পন্দন, হৃদয়াকাশের অকলঙ্ক চন্দ্র। আরও শুনিতে চাও কি?"

"না—সব বুঝিয়াছি। তোমার অই দেবীদুর্লভ সৌন্দর্য্যের অনুরোধে, আমি দুর্জ্জয়সিংহকে মার্জ্জনা করিলাম।"

এই কথায় আহত ব্যাঘ্রের মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া, দুর্জ্জয়সিংহ গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"পূর্ণিমা! তুমি এখানে আসিলে কেন? চলিয়া যাও এখান হইতে!"

সেই রমণী দৃঢ়স্বরে বলিল, "তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার দেবতা, তুমি আমার সর্ব্বস্ব! তুমি যখন বলিতেছ, তখন আমি চলিয়া যাইতেছি। কিন্তু এই যুবরাজ খসরু—শয়তান! এই শয়তানের হাতে আমি আমার দেবতাকে, অসহায় অবস্থায় বিনষ্ট হইতে দিব না।"

সেই রাজপুতরমণী, দুর্জ্জয়সিংহের দ্বিধাবিভক্ত অসি কুড়াইয়া লইয়া, ভীমভৈরবগর্জ্জনে সরোষে বলিল,—"শাহজাদা!"

খসরু, তখনও সে অনিন্দ্যরূপের উজ্জ্বল প্রভায় আত্মহারা। তিনি বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে, নির্ণিমেষনয়নে, তখনও সেই দেবীদুর্লভ অফুরন্ত রূপরাশি দেখিতেছেন। তন্ময়চিত্ত হইয়া ভাবিতেছেন—"ধন্য! এই দুর্জ্জয়-সিংহ, যে এই রূপসী পূর্ণিমার ভালবাসা পাইয়াছে।"

রমণী, খসরুকে অন্যমনস্ক দেখিয়া বলিল—"শাহজাদা! আপনার অসি তুলিয়া লউন। আমি রাজপুতকন্যা। আমার স্বামীর কলঙ্ক আমিই মোচন করিব। আমার এই ভীষণ ছুরিকা আপনার হৃদয়ের শোণিত আকর্ষণ করিবে।" এই কথা বলিয়া পূর্ণিমা, তাহার বক্ষবসন মধ্য হইতে, এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিল।

খসরু—মহা বিপদে পড়িলেন। এত সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী যে, তাহার এই বিনাশের আহ্বানও যেন কত সুখকর—কত সুন্দর!

খসরু হাস্যপূর্ণ মুখে বলিলেন—"সুন্দরি! আমি তোমার নিকট অমনিই পরাভব স্বীকার করিতেছি। আমি চলিলাম।"

এই সময়ে দুর্জ্জয়সিংহ, সহসা শাহজাদার সম্মুখে আসিয়া, পথরোধ করিয়া বলিল—"কোথায় যাইবে শাহজাদা খসরু! আজ এই নির্জ্জন গুহাপ্রাঙ্গণ, নরশোণিত-পানের জন্য পাষাণবদন ব্যাদন করিয়াছে। আগে, এই রুধিরপিপাসু পাষাণের ক্ষুধা নিবারণ কর। আমার এই ভগ্ন অসিই আমার পক্ষে যথেষ্ট। যাও—পূর্ণিমা! রাজপুতবীরের নামে আর অযথা কলঙ্ক আনিও না। যদি যথার্থই আমাকে স্বামী বলিয়া পূজা কর—আমার নামের সম্মান, তোমার ভালবাসার চেয়ে বহুমূল্য বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে এখনি এখান হইতে চলিয়া যাও।"

দুর্জ্জয়সিংহের অমিত বাহুবলের কথা, পূর্ণিমা যে না জানিত তাহা নয়। সুতরাং সে আর দ্বিরুক্তি করিল না। মরালীর মত ধীরগতিতে, সেই গুহা প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। দুর্জ্জয়সিংহ মনে মনে বলিল—"যাও দেবী! এতদিন তোমাকে উপেক্ষার ও অনাদরের চক্ষে দেখিয়াছি। অতি হতভাগ্য আমি, তোমার প্রাণের মহত্ত্ব বুঝিতে পারি নাই। যাও—

সুচরিতে ! আজ যদি যুবরাজ খসরুর অসির মুখ হইতে, এ বিশাল বক্ষকে রক্ষা করিতে পারি—জানিও তাহা তোমারই।"

আর শাহাজাদা খসরু ! খসরু, রূপের সেরা রূপ দেখিয়াছেন। বাদসাহের রঙ্গমহলে রূপসী রমণীর অভাব নাই। কিন্তু সেখানে যাহারা আছে, তাহাবা যেন এর তুলনায় কিছুই নয়। এই জ্যোতির্ম্ময়ী, রূপময়ী, তেজোময়ী, গর্ব্বময়ী মূর্ত্তিব নাম, যে পূর্ণিমা রাখিয়াছিল—সে অতি ধন্য ! মেঘবক্ষবিহারী পূর্ণজ্যোতির্ম্ময়ী চমকিত চপলাব জ্যোতিও যে এর রূপের প্রভাব কাছে অতি মলিন।

খসরু নির্ব্বাক্। দুর্জ্জয়সিংহও তদবস্থ। কাহারও মুখে কথা নাই। দুইজনেই একই কথা ভাবিতেছেন—কিন্তু চিন্তার অবস্থা ও প্রথা উভয়েরই বিভিন্ন। এইভাবেই কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল।

রজনী তখন দ্বিযাম উত্তীর্ণ। যে মশালেব আলোকে, সেই গুহা-প্রাঙ্গণ এতক্ষণ উজ্জ্বলিত হইতেছিল, তাহাও ক্রমশঃ ক্ষীণজ্যোতিঃ হইয়া পড়িতেছে। বুভুক্ষু অগ্নি, প্রচণ্ডবেগে তাহার স্নেহরস শোষণ করিতেছে, সে জ্বলিবে কি করিয়া ? আসন্নমৃত্যুকবলিত রোগীব মলিন মুখের নির্ব্বাণোন্মুখ জ্যোতিব মত—সেই মশালেব জ্যোতিঃও ক্রমশঃ যেন প্রভাহীন হইতে লাগিল।

সহসা মৌনভঙ্গ করিয়া দুর্জ্জয়সিংহ কঠোরস্বরে ডাকিল—"শাহজাদা !"

শাহজাদার চিত্ত তখন এক অজানিত স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করিয়া, কি একটা অব্যক্ত সুখের উচ্ছাসে, বেগময়ী তরঙ্গপ্রতিহত ক্ষুদ্র তৃণের মত, ইতস্ততঃ ঘুরিতে ফিরিতেছিল। দুর্জ্জয়সিংহের আহ্বানে, আবার তাঁহাব উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে, জ্ঞানের পুর্ণসঞ্চার হইল। স্বপ্নের মোহ কাটিল।

খসরু বলিলেন—"কেন দুর্জ্জয় ?"

"রজনী মধ্যযামে আসিয়াছে। আমাদের দুজনের মধ্যে শীঘ্রই একটা মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। সে কথা কি ভুলিয়া গিয়াছেন শাহজাদা ?"

"কিসের মীমাংসা দুর্জ্জয় ?"

"আপনি রাজপুতের তরবারি ভাঙ্গিয়াছেন। আমি এজন্য এই অপমানের প্রতিশোধ প্রতীক্ষা করিতেছি।"

"যে অই রূপসী পূর্ণিমার আদরের ধন, যে তার হৃদয়রত্ন, তাহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিবার জন্য—খসরুর সুশাণিত অসি নির্ম্মিত হয় নাই।"

"ও কথা শুনিতে চাহি না। এ পাষাণ গহ্বরেরও কাণ আছে। দুর্জ্জয়সিংহ তাহার পরাজয়ের কলঙ্ক মোচন করিতে চায়।"

"তুমি ত পরাজিত হও নাই,—দুর্জ্জয় ?"

"কিন্তু আপনি মুসলমান হইয়া, রাজপুতের অসি ভাঙ্গিয়াছেন।"

"ইহা ত নূতন কথা নয় দুর্জ্জয়সিংহ! আমার পিতামহ আকবর সাহ রাজপুতশ্রেষ্ঠ রাণা প্রতাপের, অসির গৌরব চূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন।"

"না—যুবরাজ! সে কথা ঠিক নয়। তবে মোগলেরা রটাইয়াছে অন্যরূপ বটে। আপনার পিতামহ আকবর সাহ নয়—আমার প্রভু মহারাজ মানসিংহই রাজপুত হইয়া রাজপুতের অসি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এটা তাঁর ঘোর কলঙ্ক! তাঁর ভৃত্য হইয়াও, এজন্য তাঁহাকে নিন্দা করিতে আমি প্রস্তুত।"

"না দুর্জ্জয়! তুমি ভুল বুঝিয়াছ। যদিও আমি আমার পিতার হতভাগ্য সন্তান, যদিও আমি পিতৃদ্রোহী, তবু পিতৃত্বের গৌরব ভুলিতে পারি না। আমার পিতা সুলতান সেলিম—"

"এ নূতন বিবাদের মীমাংসাও আমরা করিয়া লইতেছি। আপনি বলিতেছেন—আপনার পিতা সুলতান সেলিম, প্রতাপসিংহের দর্পচুর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু আমি বলিতেছি, আমার প্রভু মানসিংহ, রাণা প্রতাপের দর্পচুর্ণ করিয়া, রাজপুতের অসিগৌরবের মহত্ত্ব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এ কলঙ্কমাখা গৌরব, মানসিংহের—সেলিমের নয়।"

খসরু দুর্জ্জয়সিংহের এই তীব্রবিদ্রূপময় কথায় উত্তেজিত হইয়া, পুনর্ব্বার অসিকোষ হইতে শাণিত তরবারি বাহির করিয়া লইয়া বলিলেন,—"দুর্জ্জয়সিংহ! সাবধান! আমার বীরশ্রেষ্ঠ পিতার অবমাননা করিও না। যে তাঁহার নাম এরূপ অশ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করে, সে আমার বধ্য।"

দুর্জ্জয়সিংহ, বিদ্রূপপূর্ণহাস্যের সহিত বলিল—"শাহজাদার পিতৃভক্তি অতি প্রশংসনীয়। কিন্তু—"

কথাটা বলা শেষ হইল না। কে যেন পিছন হইতে বিদ্রুপপূর্ণ স্বরে প্রতিধ্বনি করিল—"হায়! হতভাগ্য খসরু। হা! অতিদর্পিত দুর্জ্জয়!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই চেতনাহীন, শব্দবিহীন, পাষাণরাজি পরিবেষ্টিত গুহাপ্রাঙ্গণমধ্যে প্রতিধ্বনি যেন আগন্তুকের মুখের কথাগুলি লুফিয়া লইয়া, ভীষস্বরে বলিল—"হায়! হতভাগ্য খসরু!"

সেই স্তিমিত, অর্দ্ধনির্ব্বাপিত মশালটী যেন বিদ্রূপচ্ছলে, আর একবার জ্বলিয়া উঠিল। আবার তখনই হীনপ্রভ হইয়া, সেই স্থানকে স্বল্পান্ধকারময় করিয়া দিল।

বিরলালোকোজ্জ্বলিত পাষাণনির্ম্মিত সেই নিশ্চল গুহা—যেন বদন ব্যাদন করিয়া খস্রুকে গ্রাস করিতে আসিল। এই অন্ধকারবেষ্টিত দীর্ঘবপু আগন্তুকের, গম্ভীর কণ্ঠনিঃসৃত কথাগুলি, খসরুর কাণে বজ্রধ্বনির অপেক্ষাও ভীমনাদে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সে বিদ্রূপমাখা বাক্য যাঁর মুখনিঃসৃত—খস্রু স্বর শুনিয়াই তাঁহাকে তখনই চিনিতে পারিল।

ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট, পিতৃদ্রোহী খস্রু, মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চল ও নিস্তব্ধ। যেন তাঁহার জীবনীশক্তি লোপ পাইতেছে। খস্রু একদৃষ্টে, উদ্‌ভ্রান্তনেত্রে, সেই আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। মুখে বাক্য নাই—আর বিস্ময়ের ঘনান্ধকারে, তাঁহার সেই সুন্দরকান্তি, যেন শবের ন্যায় মলিন হইয়া পড়িয়াছে। সেই দীর্ঘকায় আগন্তুক সম্মুখে আসিয়া ভীমনাদে ডাকিলেন—"খসরু!"

এ আহ্বানের উত্তর নাই। খস্রু নির্ব্বাক্। প্রলয়ের মেঘনির্ঘোষবৎ সেই গম্ভীর স্বরে, তাঁহার বীরহৃদয় বায়ুচালিত শরপত্রের ন্যায় কম্পিত ও মৃদু স্পন্দিত।

সেই আগন্তুক, পুনর্ব্বার বিদ্রূপমিশ্রিত স্বরে বলিলেন, "শাহজাদা খস্রু! আকবর সাহেব উপযুক্ত বংশধরই তুমি। কেননা তুমি আমার মৃত্যুর ব্যবস্থা করিতেছিলে? হা হতভাগ্য! তোমার জন্য আমি যে সব হারাইতে প্রস্তুত! ঐশ্বর্য্য, পদগর্ব্ব, মানসম্ভ্রম, ভারতব্যাপী একাধিপত্য,সবই ধ্বংস করিতে প্রস্তুত! কিন্তু এই সব আত্মত্যাগের কৃতজ্ঞতা দেখাইবার

জন্য, তুমি চাও কিনা, আমার হৃদয়ের শোণিত ! বৎস ! এ বিশাল হৃদয়ের উত্তপ্ত শোণিত, এ অনুশোচনাময় জীবনের জীবনীশক্তির আকর্ষণে, যদি তোমার ইষ্টসিদ্ধি হয়, স্বার্থের সম্পূরণ হয়, তাহাই করিতে পার। জানিও এই সমুষ্ণ শোণিতধারা তোমার জন্যই এই হৃৎকোষে সঞ্চিত হইয়াছে।”

আগন্তুক, সেই গুহাসম্মুখে সহাস্যমুখে দাঁড়াইয়া, তাঁহার বিশাল বক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, তীব্র বিদ্রুপময় স্বরে আবার বলিলেন—“খস্রু ! তোমার মঙ্গলের চেষ্টা করিতে গিয়া, আমি আকবর-সাহের বিরাগভাজন হইয়াছি। তোমার পিতারও চক্ষুশূল হইয়াছি। কিন্তু তবু তুমি আমার হৃদয়ের শোণিত চাও ! এ হৃৎপিণ্ডের সমুষ্ণ শোণিতধারায়, যদি তোমার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়—ভারত-বিজয়ী মানসিংহ তাহার বিশাল বক্ষঃ প্রসারিত করিয়া বলিতেছে—“এস শাহজাদা খস্রু ! তোমার আশা পূর্ণ কর। তোমার প্রয়োজন যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দাও।”

খস্রু, মহারাজ মানসিংহের এ তীব্র বিদ্রূপময়, জ্বালাময় কথায়, মর্ম্মে মর্ম্মে কাঁপিয়া উঠিলেন। তাঁহার জীবনে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও এরূপ ভীষণ পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয় নাই।

মানসিংহ পুনরায় গম্ভীরস্বরে বলিলেন—“খস্রু ! প্রাণাধিক ! এস, তোমার অভীষ্ট সাধনে অগ্রসর হও। আমার এ বক্ষনিঃসৃত শোণিতে যদি আকবরসাহের বহুমূল্য মসনদ তোমার এক্তিয়ারে আসে—তাহা হইলে এ প্রাণের উষ্ণ শোণিত দানে আমি এখনই প্রস্তুত ! তোমার জননীকে আমি হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছি। তাহার কাছে, ভগবান একলিঙ্গের নাম লইয়া, মহাকালের নির্ম্মাল্য স্পর্শ করিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যতদিন বাঁচিব—তোমার ইষ্টসাধন করিব, তোমার স্বার্থরক্ষা
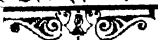
করিব। নিজের স্বার্থ ভাসাইয়া দিয়া, তোমার স্বার্থ দেখিব। কই বৎস! অগ্রসর হইতেছ না কেন? এই নাও আমার তরবারি।"

মানসিংহ, মুহূর্ত্তমধ্যে কোষ হইতে মণিখচিত, সুতীক্ষ্ণ তরবারি বাহির করিয়া বলিলেন—"এই তরবারি, যাহার ক্ষুরধারে এখনি এ গুহাপ্রাঙ্গণে বিদ্যুৎ ঝলকিয়া উঠিল, তাহা তোমার পিতামহ আকবরসাহ, চিতোব জয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে স্বহস্তে আমায় পরাইয়া দিয়াছিলেন। বৎস! আজ বুঝিলাম, আমি রাজপুত হইয়া চিতোরনাশে, রাজপুতের সর্ব্বনাশ করিয়াছি। যে তরবারি আমি এতদিন কলঙ্কের বোঝাস্বরূপ বহিয়া আসিতেছি, আমার কোষনিবদ্ধ, আমাব স্বাধীন-ইচ্ছা-পরিচালিত, সেই অসিই আমি তোমার হাতে তুলিয়া দিতেছি। যে কার্য্যে আমি নিজে অগ্রসব, তাহার জন্য দুর্জ্জয়সিহের সহায়তা লইবার প্রয়োজন কি খসরু?"

দুর্জ্জয়সিংহও বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া, মানসিংহেব জ্বালাময়, তীব্র-বিদ্রূপবাক্যগুলি শুনিতেছিল। তাহার প্রভু মানসিংহ, উত্তেজনাবশে আত্মরক্ষার শেষ উপায় পর্য্যন্ত নষ্ট করিতেছেন দেখিয়া, সে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া বলিল—"ও কি করিতেছেন, প্রভু! আপনার তববারি ছাড়িবেন না।"

মানসিংহ রোষকষায়িত লোচনে, দুর্জ্জয়সিংহের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সাবধান! দুর্জ্জয়সিংহ! তুমি আমার নফর বইতো আর কিছু নও। জানিও, এখনও তুমি আমার হুকুমের অধীন। তুমি আমার ভাগিনেয়, আমার প্রাণের প্রাণ, আমার ভগিনীর জীবনসর্ব্বস্ব, শাহজাদাকে একটু আগে আক্রমণ করিয়াছিলে। তাহার জীবনবিনাশের সঙ্কল্প করিয়াছিলে! নরাধম! এখনি এ গুহা ত্যাগ কর্! তাহা না

হইলে, এই খস্রু যাহা পারে নাই, তাহা আমিই করিব। অন্তরালে থাকিয়া আমি সব ব্যাপারই দেখিয়াছি।”

দুর্জ্জয়সিংহ, এই ভাবে তিরস্কৃত হইয়া মলিনমুখে, কম্পিতহৃদয়ে দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া, সেই গুহাপ্রাঙ্গণ ত্যাগ করিল। যাইবার সময় মনে মনে বলিল—“মনে রাখিবেন মহারাজ! আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী গোলাম বই আর কিছুই নই। এতদিন আমি আপনার তরবারির শক্তিই দেখিয়াছি, এখন বুঝিলাম, স্নেহের শক্তিতেও আপনি অদ্বিতীয়। বুঝিতেছি, আপনার অই পাষাণবক্ষে স্নেহ ও মহত্ত্বের কোন অভাব নাই। তাহা না হইলে, যে খস্রু আপনার প্রাণনাশের চক্রান্ত করিতেছিল, তাহার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, তাহাকে এত করুণা দেখাইবেন কেন? কিন্তু আপনি এটুকু বুঝিলেন না, বুঝিবার চেষ্টাও করিলেন না—ত প্রভু! আপনার এ নরাধম ভৃত্য, আপনার অসংখ্য করুণা, অযাচিত অনুগ্রহের জন্য, সামান্য কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য, গুপ্তহত্যা হইতে আপনার বহুমূল্য জীবন রক্ষার জন্যই, আজ শাহজাদাকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল।”

মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের মত দুর্জ্জয়সিংহ, মনে মনে এই সমস্ত কথা আলোচনা করিতে করিতে, বিষণ্নমুখে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে সেই গুহা ত্যাগ করিল।

আর শাহজাদা খস্রু! সেই হতভাগ্য রাজকুমার, সুলতান সেলিমের পুত্র, সম্রাট আকবরের পৌত্র, এই অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ দেখিয়া নির্ব্বাক ও নিরুত্তর। কম্পিত ও সন্ত্রস্ত হৃদয়ে, মানসিংহের তীব্র বিদ্রূপের জ্বালা সহ্য করিবার জন্য, সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত। ভীষণ অনুতাপে, তাঁহার হৃদয়ে তখন প্রচণ্ড দাবানল জ্বলিতেছে।

খসুরুর বিশালায়তলোচনদ্বয় অনুশোচনায় অশ্রুপূর্ণ হইল। তাঁহার

প্রাণের মধ্যে, একটা ভীষণ ঝড় বহিতে লাগিল। সেই প্রবল ঝড়ে—তাঁহার চিত্তের অতীত সংকল্প, দুরাশা, নিরাশা, কৃতঘ্নতা, সব কোথায় উড়িয়া গেল। শেষ রহিল—কেবল বৃষ্টি। সে বৃষ্টি, অজস্র ধারায় পড়িতে আরম্ভ হইল। কেননা খস্রুর লোচননিঃসৃত উত্তপ্ত অশ্রুবিন্দু, মানসিংহের হস্তস্পর্শ করিল।

মানসিংহ বুঝিলেন, খস্রুর চিত্ত অনুতাপ-বহ্নি-বিদগ্ধ। আবাব তাহাতে প্রতিহিংসার পরিবর্ত্তে অনুতাপ ও স্নেহ জাগিয়া উঠিয়াছে। দানের প্রতিদান আছে, কাজেই তিনি খস্রুকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। খস্রু মাতুলের সে স্নেহময় আকর্ষণে, সে ঔদার্য্যপূর্ণ আদরে, সে দেবসুলভ ক্ষমায়, সে অতুলনীয় মহত্বে মোহিত হইয়া, নিজের শোচনীয় অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, নতজানু হইয়া ভূমে বসিয়া মানসিংহের বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া, রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"মহারাজ! আমায় মার্জ্জনা করুন। আমি অতি পাপিষ্ঠ। গরবিনী রাজপুত মাতার গর্ভের কলঙ্ক!"

মানসিংহ খসরুর হাত দুখানি স্নেহভবে পীড়িত করিয়া—ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"হায়! হতভাগ্য রাজকুমার! এখনও তুমি নিজের ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিতেছ না? তোমার অদৃষ্টাকাশ যে ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন তাহা কি দেখিয়াও দেখিতেছ না? কি বুঝিবে তুমি খসরু! এ প্রাণে তোমার জন্য কত স্নেহ, কত আশা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি। কেমন করিয়া জানিবে তুমি খসরু—মোগল রাজদরবারের এক ঘোর চক্রান্তের মুখ হইতে, আমি তোমায় কত কৌশলে রক্ষা করিয়া আসিতেছি? যে মানসিংহ তাঁহার অভাগিনী ভগ্নির মুখ চাহিয়া, তোমার জন্য তাহার সকল স্বার্থ, সকল সম্মান, সকল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, যে তোমার জন্য

বনের রুধিরদান করিতেও প্রস্তুত—তুমি নির্ব্বোধ যুবক! তাহাকে না হত্যা করিবার সংকল্প করিতেছিলে? আজ নয়—একদিন তুমি ঝিবে, এই মানসিংহ তোমার পার্শ্ব ত্যাগ করিলে, কি ভীষণ সর্ব্বনাশ পস্থিত হইবে? না—না তোমার দোষ কিছুই নাই। রাজপুত হইয়া ামি বাজপুতের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, পবিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়া, মোগলের স্তে ভগ্নিসমর্পণ করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্তের দিন আসিতেছে সরু! তোমাব কোন অপরাধই নাই—আমি তোমায় প্রাণ খুলিয়া র্জ্জনা করিলাম। এস বৎস—আমার সঙ্গে।"

খসরু দেখিল—এ দেবোচিত উদারতা! চিরদিন দর্পিত, প্রতিশোধ রায়ণ, মমতাহীন মানসিংহের হৃদয়ে যে এত ক্ষমা সঞ্চিত ছিল, তাহা প্নেও যে অবিশ্বাস্য। দেখিতে পাই—যেখানে হৃদয় অতি স্নেহশীল, েখানে ক্ষমার পরিমাণ খুব বেশী। কিন্তু স্নেহের অপরাধের একটা ত্রা আছে, ক্ষমারও একটা সীমা আছে। সে যে তাহার এই স্নেহময় তুলকে হত্যা করিবার সংকল্প করিতেছিল।

কাতরহৃদয়ে, মলিনমুখে, অশ্রুপূর্ণনেত্রে—খসরু আবার মানসিংহের দমূলে বসিয়া তাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া বলিল—"কোথায় যাইব হারাজ! আমি আপনার সঙ্গে? অম্বরের রাজপ্রাসাদে আর কোন্ খে প্রবেশ করিব? এ নরাধমকে এত করুণা, এত মার্জ্জনা—এত নুগ্রহ কেন মহারাজ? বিরাগের পরিবর্ত্তে এ অনুরাগ কেন? প্রতি-সার বিনিময়ে এ ব্রাহ্মণোচিত ক্ষমা কেন? ক্ষত্রিয়—কখনই তাহার ক্রকে মার্জ্জনা করে না। তবে কেন আমার মত হতভাগ্যকে এত রুণা দেখাইতেছেন মহারাজ?"

মানসিংহ ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন—"কেন—তা আমি তোমায় পরে বুঝাইয়া দিব। এখন তুমি বিনাপ্রশ্নে আমার পশ্চাৎবর্ত্তী হও।

খসরু, মন্ত্রমুগ্ধবৎ মানসিংহের অনুসরণ করিলেন। পাহাড়ের উপর হইতে নামিয়া, তাঁহারা অম্বরপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন মেঘের সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় জয়লাভ করিয়া, চাঁদ আকাশ আলো করিয়া হাসিতেছিল। সেই চন্দ্রালোকে অম্বরপ্রাসাদের দেবমন্দিরের স্বর্ণময় চূড়া চিক্‌মিক করিতেছিল।

এই উজ্জ্বল আলোকছটার মধ্যেও, প্রাণে অমানিশার অন্ধকার লইয়া, খসরু প্রাসাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। পথে মাতুল ও ভাগিনেয়র মধ্যে কোন কথাবার্ত্তাই হইল না। কেন না—উভয়েই বিভিন্নমুখগামী চিন্তায় বাক্যহীন, চঞ্চলচিত্ত ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ।

দ্বারের প্রহরী, মহারাজ মানসিংহকে সহসা সম্মুখীন দেখিয়া সম্মানের সহিত অস্ত্র নোয়াইয়া, প্রাসাদের লৌহদ্বার খুলিয়া দিয়া—সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। উভয়ে নির্ব্বাক অবস্থায় পুরী প্রবেশ করিলেন। অন্দরের পথে খসরুকে পৌছাইয়া দিয়া, মানসিংহ স্নেহময় স্বরে বলিলেন—"শাহজাদা! তোমার মাতা হয়ত তোমার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে রহিয়াছেন। তাঁর সঙ্গে এখন দেখা করগে। কাল প্রভাতে আবার আমার সাক্ষাৎ পাইবে।"

আর কিছু বলিবার অবসর না দিয়া—মানসিংহ সহসা অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। আর স্নেহের সমরে পরাজিত, বিধ্বস্ত, শাহজাদা খসরু জ্বালাময় প্রাণে, শঙ্কিতহৃদয়ে, কম্পিতচিত্তে, মাতার কক্ষদ্বারের সন্নিকটে যাইবামাত্রই চমকিয়া দাঁড়াইলেন।

খসরু সবিস্ময়ে দেখিলেন—সেই অফুরন্ত জ্যোৎস্নালোকিত, অম্বর প্রাসাদের এক মর্ম্মরপ্রস্তরময় কক্ষের শুভ্রমর্ম্মর সোপানে দাঁড়াইয়া, এক রত্নখচিত শুভ্রবসনপরিহিতা, স্নেহশালিনী—মাতৃমূর্ত্তি। সে মূর্ত্তির প্রত্যেক অঙ্গ হইতেই যেন স্নেহ ক্ষরিত হইতেছিল। সেই মূর্ত্তি অতি অধীর হৃদয়ে নিশ্চল পাষাণপ্রতিমার মত, সেই চন্দ্রালোকপ্লাবিত শুভ্র মর্ম্মরসোপানে দাঁড়াইয়া—খসরুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রালোকিত শুভ্রসোপানোপরি দণ্ডায়মানা মাতৃমূর্ত্তি—কঠোরস্বরে ডাকিলেন—"খসরু!"

এই সম্বোধন—যেন কত তিরস্কারপূর্ণ, কত শ্লেষ মাখানো, কত বিরক্তির অভিব্যক্তি।

খসরু সপ্রতিভের মত বলিল—"মা! তুমি এখনও নিদ্রা যাও নাই কেন?"

যোধাবাই ঘৃণাপূর্ণস্বরে বলিলেন—"তোমার মত সুসন্তান যখন গর্ভে ধরিয়াছি, তখন আমার নিদ্রার সম্ভাবনা কোথায় খসরু? কেন
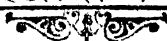
তুমি আমার গর্ভে জন্মিয়াছিলে? কেন তুমি রাজকুলে জন্মিয়াছিলে? অতি হীনদস্যু বা নরঘাতকে যে ভয়ানক কাজ কল্পনাতে আনিতে পারে না, আজ তুমি তাহাই করিতে বসিয়াছিলে? হা! হতভাগ্য সন্তান!"

মাতার এ তিরস্কারে খসরুর প্রাণে আবার ঝড় উঠিল। চক্ষে মর্ম্মদাহী অশ্রুধারা বহিল। চোখের জল মুছিয়া, লজ্জাবিজড়িত, অনুতাপবিদগ্ধ স্বরে, শাহজাদা বলিলেন—"মা! তুমিও আমায় ত্যাগ করিলে? পিতার বিষনেত্রে পড়িয়াছি—মাতুলের বিরাগভাজন হইয়াছি—কিন্তু তুমি কেন আমায় বক্ষচ্যুত করিলে মা? আমার তাহা হইলে দাঁড়াইবার পথ কোথায়, বলিয়া দাও জননী? দেখিতেছি, মোগল রাজবংশে জন্মান, একটা মহা অভিশাপ!"

যোধাবাই কম্পিতস্বরে বলিলেন—"হতভাগ্য সন্তান! তুমি এই গর্ভে জন্মিয়া মাতার বৈধব্য কামনা করিতেছিলে? মাতুল হত্যার চেষ্টা করিতেছিলে? তোমার অপরাধ যে অমার্জ্জনীয়।"

অনুতপ্ত স্বরে খসরু বলিলেন—"ভ্রমবশে যাহা করিয়াছি, তাহার কি মার্জ্জনা নাই মা?"

"তোমায় আমি না হয় স্নেহবশে মার্জ্জনা করিলাম। কিন্তু আজ দুর্জ্জয়সিংহের সহিত যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহার কারণ কি খসরু?"

"তাহা ঠিক বলিতে পারি না জননি! বোধ হয় শয়তান আমার স্কন্ধে চাপিয়াছিল।"

"বুঝিয়াছি। কোন কথা বলিবার মুখ তোমার নাই। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন যুক্তিই নাই। সত্য কথা বল। রাজপুতকন্যার গর্ভজাত সন্তান হইয়া, সম্রাট আকবর শাহের পৌত্র হইয়া, সেই সম্রাট

আকবরের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মহারাজ মানসিংহকে হত্যা করিবার জন্য, আজ দুর্জ্জয়সিংহকে উত্তেজিত করিয়াছিলে কি না?"

"মিথ্যা বলিব না। করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি কেমন করিয়া জানিলে মা?"

"সে প্রশ্নে তোমার কোন অধিকার নাই। কেন খসরু! এ ভয়ানক পাপকর্ম্ম করিতে অগ্রসর হইয়াছিলে?"

"তা ঠিক জানিনা—বলিতে পারি না। আমি আমার মোহময় চিত্তের ক্রীতদাস। প্রবৃত্তির নারকীয় শক্তির অধীন। জান ত মা! শয়তান আমায় সহজেই বিপথচালিত করে।"

"যে মানসিংহ তোমার স্বার্থরক্ষার জন্য—তাঁহার নিজের মহা স্বার্থ পদদলিত করিয়াছেন,—তাঁহাকে তুমি হত্যা করিতে চাও? যিনি এ জগতে তোমার একান্ত মিত্র, একমাত্র হিতেচ্ছু—তাঁহার হৃদয়ের শোণিতে তোমার কি প্রয়োজন মিটিবে খসরু? এত বড় মোগল-রাজসংসারে এই মানসিংহ ব্যতীত তোমার আপনার বলিবার কে আছে শাহজাদা?"

"মা!—মা! আমায় মার্জ্জনা কর মা! আমি তোমার মত স্নেহময়ী মাতার জ্বালার কারণ, পিতার অশান্তির কারণ, অমন স্নেহময় মাতুলের মর্ম্মযাতনার হেতু। আমায় অনুমতি দাও মা! আমি আবার আগরায় ফিরিয়া যাই। তোমার সঙ্গে এখানে থাকিয়া আমার কোন লাভ নাই। আদেশ কর মা! পিতামহ আকবরশাহের নিকট গিয়া, মুক্তপ্রাণে অপরাধ স্বীকার করিয়া বলি—"শাহান্ শা! আমি অতি নরাধম! আমি পিতৃদ্রোহী! আমি আপনার প্রিয়তম পুত্রকে, সিংহাসনাধিকারীকে ছার রাজ্যলোভে হত্যার সংকল্প করিয়াছিলাম। আমি আপনার দক্ষিণ

বাহস্বরূপ মহারাজ মানসিংহকে বিনষ্ট করিতে গিয়াছিলাম। জাহাপনা! আমায় উপযুক্ত শাস্তি দিন।" মা! সত্যই আমি যাহা করিয়াছি, তাহাতে আমার বুক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তোমাদের কাহারও নিকট আমার মুখ দেখাইবার পথ নাই!"

যোধাবাই সেই মর্ম্মরমণ্ডিত-সোপানোপরি দাঁড়াইয়া, উজ্জল চন্দ্রালোকে দেখিলেন, অনুতপ্ত সন্তানের নেত্রদ্বয় দিয়া প্রবলবেগে অশ্রুধারা উছলিয়া পড়িতেছে। সে দৃশ্য তাঁহার সহ্য হইল না। ছার সিংহাসন! ছার পিতৃদ্রোহিতা! ছার মানসিংহ! মা'র কাছে সন্তানের চেয়ে বেশী কে? মায়ের প্রাণ। একটু আগে পিতৃদ্রোহী, মাতুলদ্রোহী বলিয়া, যোধাবাই যে সন্তানকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন, সেই সন্তানের চক্ষে প্রবহমান অশ্রুধারা দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ের কাঠিন্য, বিরাগ, তিরস্কার, সবই স্নেহের প্রবল বন্যামুখে, ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গেল। তাঁহার আয়ত, ইন্দীবর-নেত্রেও, সহানুভূতিসূচক অশ্রু দেখা দিল। যোধাবাই, স্নেহপ্লাবিত স্বরে, খসরুর চোখের অশ্রুধারা মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—"খসরু! খসরু! তোর অই নেত্রনিঃসৃত অশ্রুধারার নিকট দিল্লীর সিংহাসন আমার কাছে অতি তুচ্ছ! আর তোকে কখনও তিরস্কার করিব না। আমি তোর সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম।"

কৃতজ্ঞতা-প্লাবিত হৃদয়ে খসরু মাতৃচরণ বন্দনা করিলেন। তাঁহার প্রাণে যে একটা ভীষণ দাবানলের জ্বালা জ্বলিতেছিল, যে জ্বালায় তাঁহার হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক শোণিতকণা শুষ্ক হইতেছিল, সে প্রচণ্ড জ্বালাও সম্পূর্ণরূপে কমিয়া আসিল। প্রাণে শান্তি, হৃদয়ে সান্ত্বনা পাইয়া, খসরু অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন।

যোধাবাই, খসরুকে লইয়া, তাঁহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এক মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, মনে মনে বলিলেন—"হায় হতভাগ্য খসরু! কেন আমি তোর মা হইয়াছিলাম?"

শাহজাদা খসরুও, সেই সময়ে মনে মনে বলিতেছিলেন—"হায় মা! কেন এ হতভাগ্য সন্তান তোমাব গর্ভে জন্মিয়াছিল? তুমি হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ রাজ-রাজেশ্বরী। সম্রাট আকবর শাহের পুত্রবধূ! তোমার কিসের অভাব—কিসের কষ্ট জননী? কিন্তু এই হতভাগ্য সন্তান হইতেই তোমার শান্তিময় জীবনে অশান্তির জ্বালা আসিয়া জুটিয়াছে। মা! আমাকে মার্জ্জনা কর!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।
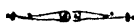
ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা। অম্বরের পূর্ব্বাস্তেস্থিত পাহাড়ের গগনতলচুম্বী চূড়া হইতে আরম্ভ করিয়া, সৌধতল পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান জ্যোৎস্নার শুভ্রপ্রবাহে ভাসমান। চন্দ্রমার সমুজ্জল কান্তি বক্ষমধ্যে ধারণ করিয়া, অনন্ত নীলাকাশ যেন গর্ব্বে স্ফীত হইতেছিল। পাহাড়ের উচ্চচূড়াস্থিত এক ঘনপল্লবাবৃত তমালবৃক্ষের ছায়ায় কালো অঙ্গ লুকাইয়া, একটা কোয়েলা, পঞ্চমে সুর বাঁধিয়া ক্রমাগতঃ কূ—উ—উ শব্দ করিতেছিল—আর সেই পঞ্চমাশ্রিত কাকলী, নীরব নিথর নৈশগগনের তলদেশে গিয়া বিলীন হইতেছিল।

মানসিংহ, আগরা রঙ্গমহলের মধ্যস্থ এক গুলাববাগের অনুকরণে
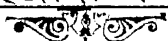
অম্বরপ্রাসাদ মধ্যে, একটী "গুলাববাগ" প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বাসন্তী মকরন্দপরিচুম্বিত, প্রস্ফুটিত গুলাবরাশি হইতে, অতি মধুর চিত্তোন্মাদকারী সুগন্ধ বাহির হইতেছিল। চন্দ্রালোকে উদ্ভ্রান্তপ্রাণ, পুষ্পবাসগন্ধে মদাকুলিতচিত্ত, দুই চারিটা লজ্জাহীন অলি, তখনও নীরবনিশীথের নিস্তব্ধাবসরে অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত গুলাবের উপর বসিয়া, আপনাদের সৌন্দর্য্য বিচারের ও রসজ্ঞতার পরিচয় দেখাইতেছিল।

চ্যুতমুকুল সুবাসে, পর্ব্বতের নির্জ্জন উপত্যকা, যেন নব বসন্তের বিলাস কাননবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। মৃদুমলয়স্পর্শবিচ্যুত চ্যুতকলিকারেণু, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শ্যামল দূর্ব্বাশিরে প'ড়য়া, সুগন্ধে দিক্‌বলয় উদ্ভ্রান্ত করিতেছিল।

আকাশে ষোলকলা শশী, ধরায় বসন্তের পূর্ণ বিকাশ, পুষ্পবাস হবরে মলয়ের তস্করবৃত্তি, কোকিলের পঞ্চমরাগ মুখরিত কোমলকাকলী, সব একসঙ্গে মিশিয়া, কি যেন এক স্বর্গীয় সুষমার বিস্তার করিতেছিল। আর এই সৌন্দর্য্যের তীব্রতা ও প্রাখর্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া, মৃদু কলনাদিনী গিরিনদী উপকূলস্থ এক বিটপীশীর্ষে বসিয়া—পাপিয়া "চোখ্-গেল" বলিয়া চীৎকার করিতেছিল।

"ফাগুয়া" অম্বরের প্রধান উৎসব। হিন্দু রাজার শাসনাধীন অম্বর সহরে, রমণীর অবগুণ্ঠনের প্রথা প্রায়ই ছিল না। দলে দলে যুবতীগণ, সারি বাঁধিয়া, চম্পাচামেলীমালতীমালিকাপূর্ণ রজতথালা হাতে লইয়া, শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দিরের দিকে চলিয়াছে। আর এই রৌপ্যপাত্রে-রক্ষিত পীতচন্দন, অগুরু ও মৃগনাভি মিশ্রিত মালিকার সুগন্ধস্রাবে, মলয়বাহিত চ্যুতমুকুলগন্ধ যেন ডুবিয়া যাইতেছিল।

বড়ই নয়নারাম দৃশ্য, সেই সুখের যামিনীতে, সেই পৌর্ণমাসী রজতধারা-চুম্বিত প্রকৃতিবক্ষে, নবদূর্ব্বাদল ও কিশলয়রাজি পদদলিত করিতে করিতে, রাধাকৃষ্ণের "মান-মাথুর-বিরহ" গাহিতে গাহিতে, হসিতাননা রাজপুত ললনাগণ, মদগর্ব্বিতা করিণীর মত, গুরুগম্ভীর ছন্দে পদবিক্ষেপ করিতে করিতে মন্দিরপথে চলিয়াছেন। তাঁহাদের মৃদুগমনসঞ্জাত ভূষণসিঞ্জন প্রতিধ্বনি, মলয়বাহিত হইয়া, গুলাববাগের প্রস্ফুটিত গুলাবগাত্রাবলম্বী ভ্রমরের অস্ফুট প্রেমময় গুঞ্জনকে ডুবাইয়া দিতেছে।

ফাগুয়ার আনন্দে সবাই বিভোর। নবচূতমুকুল-বাস বিমোহিত-চিত্তে, এই নববসন্তে, মদবিহ্বলা রমণীগণ চন্দনাগুরুলিপ্ত মাল্যপূর্ণ, রজত-পাত্র হস্তে, একে একে শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

অম্বর সহরের সন্নিকটস্থ পার্ব্বত্যপথ, নিশার যামবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ নীরব হইয়া পড়িতেছিল। কেননা—রজনী তখন মধ্যযামে।

এই সমস্ত রাজপুত মহিলারা, মন্দির মধ্যে গিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দকে গুলাবজলের পিচকারীতে স্নান করাইয়া, আবির কুঙ্কুম মাখাইল। তাঁহার নিকষকান্তিদেহ মালাচন্দনে বিভূষিত করিল। যাহার যে মানস ছিল, তাহার মনের সেই কথা অস্ফুটস্বরে ব্যক্ত করিয়া যুগলমূর্ত্তিকে প্রণাম করিল। তারপর পুরোহিতের নিকট প্রসাদী আবির ও কিছু ক্ষীরান্ন লইয়া মৃদুস্বরে হোলি গাহিতে গাহিতে তাহারা গৃহাভিমুখে চলিল। অর্দ্ধঘটিকার পর জ্যোৎস্নালোকিত শুভ্র রাজপথ সম্পূর্ণরূপে জনশূন্য হইল।

নির্জ্জন রাজপথে আর কোন পুরুষ পথিক নাই। সুদূরবর্ত্তী হ্রদের বক্ষোপরি, ধীরে উদ্বেলিত লহরলীলায় মৃদুনর্ত্তন মধ্যে, চাঁদের প্রতিবিম্ব ধীরে কাঁপিতেছে, দুলিতেছে, হেলিতেছে, হাসিতেছে। এক

একবার সে কম্পন স্থির হইতেছে। পর্ব্বতোপত্যকাস্থিত দুই চারিটা কুঞ্জসার, নির্জ্জন পথপার্শ্ববর্ত্তী হ্রদবক্ষে, চন্দ্রের সেই সমুজ্জ্বল প্রতিবিম্ব দেখিবার জন্যই, যেন তীরদেশে আসিয়া মুহূর্ত্তমাত্র সচকিতে দাঁড়াইয়া, আবার পাহাড়ের বুকে লুকাইতেছে।

এই নির্জ্জন নিশীথে, হ্রদের পূর্ব্বধারের সংকীর্ণপথে এক বীরপুরুষ একাকী বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার প্রত্যেক ধীরগম্ভীর পদবিক্ষেপভঙ্গী, তাঁহার অন্তর্নিহিত দারুণ চিন্তা প্রকটিত করিতেছে।

সহসা সেই নির্জ্জন স্থানে এক রমণীমূর্ত্তি দেখা দিল। তাহার মুখ অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত। সেই রমণী এই বীরপুরুষের সমীপবর্ত্তী হইয়া, মৃদুস্বরে ডাকিল—"দুর্জ্জয় সিংহ!"

এই সম্বোধনে দুর্জ্জয় সিংহ পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। নিরাশাব্যঞ্জক স্বরে কেবলমাত্র বলিলেন—"পূর্ণিমা!" সে আর বলিতে পারিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে সে অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিল—"এই ফাল্গুনী পূর্ণিমার চির-দিনের মত বিদায় লইতে আসিয়াছি! পূর্ণিমা! আমায় বিদায় দাও।"

পূর্ণিমা—দুর্জ্জয়সিংহের রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া উঠিল। দুর্জ্জয়ের নিকটস্থ হইয়া তাহার বক্ষলগ্ন হইল। ধীর স্বরে বলিল—"তোমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ কেন দুর্জ্জয়? ওকি! তুমি কাঁদিতেছ কেন দুর্জ্জয়?"

পূর্ণিমা, সেই প্রোজ্জ্বল চন্দ্রালোকে, দুর্জ্জয়সিংহের গণ্ডদেশবাহী অশ্রু-ধারা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। এই অশ্রুরেখা তাঁহার প্রাণকে বড়ই চঞ্চল করিয়া তুলিল। যে দুর্জ্জয়সিংহ, তাহার প্রাণের প্রাণ—তাহার অস্থি-মজ্জা ও শোণিতমধ্যে যে দুর্জ্জয়ের সুখস্বচ্ছন্দতা সে নিহিত করিয়াছে, সেই দুর্জ্জয়ের চক্ষে জল।

পূর্ণিমা দুর্জ্জয়সিংহের পদতলে বসিয়া, অশ্রুধারাপ্লাবিত নেত্রে, গদগদ
র বলিল—"দুর্জ্জয়! প্রাণাধিক! একদিকে এই সমগ্রব্রহ্মাণ্ড, আমার
দুঃখ, জীবনের অস্তিত্ব,—আর একদিকে তুমি! তোমার চোখে জল
ন দুর্জ্জয়সিংহ! তুমি আমাকে বিরাগ নেত্রে দেখিলেও, জাননা কি
মি দুর্জ্জয়! যে তুমি আমার সর্ব্বস্ব। এই হাস্যময়ী ধরা এখনি প্রলয়ের
খ বিলুপ্ত হউক, ভগবানের সৃষ্টি লোপ হইয়া যাক্, অনন্তবিশ্ব ওলট্-
লট হইয়া যাক্, আকাশ ভূমিতলে খসিয়া পড়ুক—আমার তাতে কোন
তিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু বল দুর্জ্জয়! তোমার চোখে জল কেন?"

দুর্জ্জয়সিংহ আবেগপূর্ণ স্বরে বলিল—"পূর্ণিমা! এতদিন তোমায়
নিতে পারি নাই—তোমার ভালবাসার গভীরতা বুঝিতে পারি নাই।
াবান তোমায় কি নারী-দুর্লভ উপাদানে গঠিত করিয়াছেন, তাহাও
ঝি নাই। বুঝিয়াছি—কেবল দম্ভ, অভিমান আর অকৃতজ্ঞতা। পবিত্র
নাবিল, স্বার্থগন্ধশূন্য ভালবাসার বিনিময়ে, কঠোর হৃদয়জাত নিষ্ঠুরতাই
ামাকে দিয়াছি। কিন্তু পূর্ণিমা বোধ হয় আজ আমাদের শেষ সাক্ষাৎ!"

পূর্ণিমা, দৃপ্তা সিংহীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিল—"কেন আজ একথা
লতেছ দুর্জ্জয়? কার সাধ্য, যে আমার আরাধ্য দেবতাকে—আমার
মুখ হইতে অপসারিত করে?"

দুর্জ্জয়সিংহ বিমর্ষমুখে বলিলেন—"হয়তো জাননা তুমি পূর্ণিমা! আমি
ারাজ মানসিংহের আদেশে, এই অম্বর হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছি!
আদেশ এই, তিনদিনের পর যদি কেহ আমায় এই অম্বরে দেখিতে
য়, তাহাহইলে আমায় কারারুদ্ধ করিবে।"

পূর্ণিমা বলিল—"সব জানি! সব শুনিয়াছি! তোমার পূর্ণিমা আবার

না জানে কি ? ভয় কি তোমার এ নির্ব্বাসনে ! পূর্ণিমাকে যদি তুমি দাসী বলিয়া চরণে স্থান দাও, তাহা হইলে সে তোমার সঙ্গে নরকে যাইতেও কুণ্ঠিত হইবে না। ভগবানের সুবিশাল সৃষ্টিমধ্যে, ধরিত্রীর এই শান্তিময় বক্ষে, এই অভিশপ্ত অম্বররাজ্য ছাড়া, কি আর থাকিবার স্থান নাই ?

"আছে—কিন্তু কোনমতেই আমি এই জন্মভূমি অম্বর ত্যাগ করিব না ! ইহাতে আমার অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক।"

পূর্ণিমা একথায় বড়ই বিচলিত হইল। সে কত কি ভাবিল। একবার সেই শশিকরোজ্জ্বল নীলাকাশের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিল। আর একবার সুদূরে অবস্থিত, প্রান্তরান্তে বিলীয়মান, জ্যোৎস্নালোকিত পাহাড়ের দিকে চাহিল। শেষে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"দুর্জ্জয়সিংহ ! তোমার এ নির্ব্বন্ধ ত্যাগ কর। চল আমরা দু'জনে না হয় দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যাই। সেখানে মোগলের এতটা প্রভাব নাই। সুদূর বাঙ্গালা দেশে এখনও পাঠানেরা বিরাজিত। চল ! এমন কোন স্থানে যাই, যেখানে এই নিষ্ঠুর, অকৃতজ্ঞ মানসিংহের কোন শাসনক্ষমতা নাই।"

দুর্জ্জয়সিংহ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"উন্মাদিনি ! প্রাণের আবেগভরে যাহা বলিতেছ—তাহা কি সম্ভব ! কোথায় যাইবে সবলে ? মহারাজ মানসিংহের বাহুবলে সমগ্র ভারত বিকম্পিত, তিনি দিল্লীশ্বরের কুটুম্ব—প্রধান সেনাপতি ! কোথায় যাইয়া নিস্তার পাইবে পূর্ণিমা ?"

পূর্ণিমা বিষণ্ণমুখে বলিল—"তাই ত দুর্জ্জয় ! তাহা হইলে কি হইবে দুর্জ্জয় ! তুমি যে এই হতভাগিনী রাজপুতকন্যার ধর্ম্মকর্ম্ম, অভীষ্ট ইষ্ট, পাপপুণ্য—সব ! তোমাকে লইয়াই যে আমার এ জীবনের অস্তিত্ব ! তোমার ঐ সুন্দর মূর্ত্তি আজীবন ধ্যান করাই যে আমার ইষ্টমন্ত্র ! আমি

তোমার বিবাহিত পত্নী ! ভিত্তিহীন বংশকলঙ্কে বিচলিত হইয়া, তুমি আমায় ত্যাগ করিয়াছ বটে, কিন্তু তুমি আমায় ত্যাগ করিলেও আমি হিন্দুরমণী ! রাজপুত ললনা ! ধর্ম্ম ও নারায়ণ সাক্ষী করিয়া আমি তোমায় স্বামীরূপে গ্রহণ করিয়াছি, তুমি পত্নীরূপে চরণে আশ্রয় দিয়াছ। ইষ্টদেব ! নিষ্ঠুরের মত আর আমাকে চরণে ঠেলিও না। আমায় সঙ্গে নাও—আমি দাসী হইয়া তোমার চরণ সেবা করিব। যে তোমার অনিষ্ট করিতে আসিবে, ক্ষুধিতা বাঘিনীর ন্যায় তাহার রুধির পান করিব! আর তুমি যদি মানসিংহের নিষ্ঠুর বিধানে কারানিক্ষিপ্ত হও, সেই কারাগারে আমি তোমার চিরসঙ্গিনী হইয়া থাকিব।"

দুর্জ্জয়সিংহ সেই চন্দ্রালোকবিধৌত নিশিতে, পূর্ণিমার প্রেমভরা মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, সে সুন্দর মূর্ত্তি যেন আরও সুন্দর হইয়াছে। পূর্ণিমার মলিন মুখে, কি যেন একটা অপূর্ব্বপরিদৃষ্ট জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই আয়ত ইন্দীবর লোচনদ্বয় হইতে, যেন এক নেত্রজ্বালাময়ী উজ্জ্বল প্রভা বাহির হইতেছে ! পূর্ণিমা যে অত সুন্দরী, অত মোহময়ী, অত দেবীত্বমণ্ডিত পবিত্র মূর্ত্তি, তাহা দুর্জ্জয়সিংহ আর কখনও দেখে নাই।

দুর্জ্জয়সিংহ, তাহার নিরাশাপীড়িত জীবনে, যেন একটু আশার আলোক দেখিতে পাইল। যে পূর্ণিমাকে সে জ্ঞাতিদের ঈর্ষাপ্রসূত বংশ-কলঙ্ক রটনায় ত্যাগ করিয়াছে, তাহার সহিত সকল সম্পর্ক লোপ করিয়াছে, সেই পূর্ণিমা এত মহিমাময়ী ! এ পূর্ণিমায় যে ষোলকলা চন্দ্রেরজ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে পূর্ণিমা এত পবিত্র, এত সুন্দর, এতটা সমর্পিতপ্রাণা, এতটা অনুতাপিতা, সে তাহাকে ত্যাগ করিয়া মহাভ্রমে পড়িয়াছে। দুর্জ্জয়সিংহ দেখিল, প্রেম, স্নেহ, করুণা আর সেই সতীত্বের

উজ্জ্বল জ্যোতি লইয়া তাহার পূর্ণিমা যেন পূর্ণভাবে জ্যোতির্ময় হইয়াছে।

তবুও নিষ্ঠুর দুর্জ্জয়সিংহ, নিষ্ঠুরতায় বুক বাঁধিয়া বলিল—"আর কে. পূর্ণিমা! জন্মের মত বিদায় দাও। তোমায় এতদিন চিনিতে পারি নাই আজ পারিয়াছি। কিন্তু এত বিলম্বে তোমাকে চিনিতে পারিলাম, যখন এক সাংঘাতিক ঘটনাচক্রে পড়িয়া, তোমাকে জন্মের মত ত্যাগ করিতে হইবে। একদিন না একদিন, মহারাজ মানসিংহ তাঁহার ভ্রম বুঝিবেন তাহাহইলে আবার এই হতভাগ্য দুর্জ্জয়কে তাঁহার মনে পড়িবে সেই সময়ে আমি তাঁহাকে দেখা দিব। এখন কিছু দিনের জন্য, অর্থাৎ মহারাজের ক্রোধ শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত, এ অম্বরে আমার আর স্থান নাই। পূর্ণিমা! পূর্ণিমা! আমার প্রাণ যে ফাটিয়া যাইতেছে। তাই তোমার কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

পূর্ণিমা তখন সেই স্বল্পমেঘাবৃত, চন্দ্রকরোজ্জ্বল, ধূসরবর্ণ অম্বরসহরের দূরস্থিত সৌধাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, দৃঢ়তাব্যঞ্জকস্বরে বলিল—"যাও স্বামি! আজ আমি সাহসে বুক বাঁধিয়া তোমায় বিদায় দিতেছি যে যুবরাজ খসরু হইতে আজ আমার সর্ব্বনাশ সূচনা হইল, তাহার—সর্ব্বনাশ না করিয়া আমিও আর অম্বরে ফিরিব না। আমি পাষাণী হইয়া তোমায় বিদায় দিতেছি। মানসিংহের সর্ব্বনাশ হইবে, খসরুর সর্ব্বনাশ হইবে—তবে আমি আবার এই জন্মভূমি অম্বরের বুকে ফিরিব। তখন যদি তোমার সন্ধান পাই, তোমায় জীবিত দেখিতে পাই—তাহা হইলে আমার বিড়ম্বিত জীবনের অতৃপ্ত আশা পূর্ণ হইবে। তাহা না হইলে এই শেষ দেখা। ঐ গগনবিহারী চন্দ্রদেব সাক্ষী, পাষাণবক্ষ বিরাটকায়

পর্ব্বত সাক্ষী, এই নির্ম্মলা যামিনী সাক্ষী—মানসিংহ ও খসরুর সর্ব্বনাশ না করিয়া, আমি গৃহে ফিরিব না।”

দুর্জ্জয়সিংহ নির্ব্বাক ও চিন্তামগ্ন! সে—নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া, নিজের বিপদ ভুলিয়া—কেবল পূর্ণিমার কথাই ভাবিতে লাগিল। তারপর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইলে, স্নেহময় স্বরে ডাকিল—“পূর্ণিমা! পূর্ণিমা!”

হায় কোথায় পূর্ণিমা! ছায়ামূর্ত্তির মত সে মায়াবিনী কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। দুর্জ্জয়সিংহ কঠোর কণ্ঠে সেই পার্ব্বত্য-উপত্যকা প্রতিধ্বনিত করিয়া ডাকিল—“পূর্ণিমা! পূর্ণিমা! ফিরিয়া এস। তুমি যাহা বলিবে তাহাতেই আমি স্বীকৃত।”

সে গম্ভীরকণ্ঠের প্রতিধ্বনি সুদূর পর্ব্বতগাত্রে প্রতিহত হইয়া, বিমল চন্দ্রালোকিত বিরাট ব্যোমপথে মিলাইয়া গেল। হায়! তবুও পূর্ণিমা ফিরিল না। দুর্জ্জয়সিংহের হৃদয়ে অমাবস্যার অন্ধকার দেখা দিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

“মা—আমাকে বিদায় দাও!”

“ছি! ও কথা বলিতে নাই! কেন তোমার চিত্তকে অকারণে ব্যথিত করিতেছ বৎস! মহারাজ মানসিংহ, তোমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছেন।”

"আমি ত মার্জ্জনা চাহি নাই মা। না চাহিতে মার্জ্জনা পাইয়াছি, সেই জন্যই ত আমার বেশী লজ্জা হইতেছে। প্রথম প্রহর অতীত হইতে না হইতেই, আমি এ অম্বর ত্যাগ করিব।"

"কোথায় যাইবে খসরু? আগরায়?"

"না—"

"তবে কোথায়?"

"যেখানে এই দুই চক্ষু যাইবে। কোথাও দাঁড়াইবার পথ যে আমার নাই মা? পিতার চক্ষের বিষ হইয়াছি। আগরায় গিয়া সে বিদ্রূপ-ভ্রুকুটীময় নেত্রের, অগ্নিস্ফুরণ সহ্য করিতে পারিব না।"

"চল—আমিও তোমার সঙ্গে আগরায় যাই। আমার এই স্নেহময় বক্ষ, দুর্ভেদ্য দুর্গের মত, তোমাকে সকলের ক্রোধ হইতে বাঁচাইয়া রাখিবে। তোমার জন্য আমি শত সহস্র বজ্রের আঘাত উপেক্ষা করিব। অতি ক্ষুদ্রশক্তি পক্ষিণীও, নিজের শাবককে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। আর আমি এতটা ক্ষমতার অধীশ্বরী হইয়া, তোমায় রক্ষা করিতে পারিব না?"

"কেন মা! তুমি আমার জন্য তোমার সব সুখ নষ্ট করিবে?"

"কিসের সুখ বাবা? কাহাকে লইয়া আমার সুখ। তুমিই ত আমার সর্ব্বস্ব! আমার সুখ তুমি, দুঃখ তুমি। আশা তুমি, আনন্দ তুমি। এই জীবনে আমি না পাইয়াছি কি? অম্বরেশ্বরের কন্যা আমি, মোগল-বাদশাহের পুত্রবধূ আমি। একদিন সমগ্র হিন্দুস্থান আমার এই পদতলে লুটাইবে বলিয়া, আমার পিতা সম্রাটপুত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু সে সুখস্বপ্ন বোধ হয় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়।"

"মা! ওসব কথা আলোচনায় ত কোন ফল নাই। আলোচনায়

কেবল যাতনাই বাড়িবে। তুমি শান্ত হও। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহাতো আর ফেরে না। যাহা হইবে, তাহাতেও কেহ বাধা দিতে পারিবে না। প্রভাত হইলে, আমি—মহারাজের নিকট লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিব না। এখনও প্রভাতের স্বল্প বিলম্ব আছে। কল্য নিশায়, গুহামধ্যে যাহা দেখাইয়াছি, তাহা ভাবিয়া সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারি নাই। আর এই অন্দরে তোমার বিমল স্নেহধারায় প্লাবিত হইয়া থাকিলেও যে চিত্তের শান্তি ফিরিয়া পাইব, তাহারও সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। আমায় প্রসন্ন মনে বিদায় দাও মা।"

যোধাবাই—কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। তৎপরে স্নেহব্যঞ্জকস্বরে, বলিলেন—"এখন কি করিতে চাও খসরু? আমার অনুরোধ—প্রবৃত্তি চালিত হইয়া সন্দেহবশে আর যথেচ্ছাচার করিও না। সন্তান তুমি। শত অপরাধ করিলেও তুমি পিতার মার্জ্জনা পাইবার অধিকারী। তিনি মনে মনে তোমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন। তুমি বিনীতভাবে তাঁহার সঙ্গে ব্যবহার করিলে—কখনই তিনি তোমায় উপেক্ষা করিবেন না। চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই।"

"আবার তুমি পিতার নিকট যাইবে?"

"হাঁ—"

"কেন?"

"তোমার জন্য।"

"তুমি না রাজপুতকন্যা। যে প্রতিজ্ঞা করিয়া এখানে আসিয়াছ, তাহা কি এখনি ভুলিলে?"

"যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা ক্রোধ আর অভিমানের ফল।

আর তোমার প্রতি উপেক্ষা ও অনাদর করার জন্যই, স্বামীর উপর সেই ক্রোধ ও অভিমান আসিয়াছিল।"

"এখন সে অভিমান কি গিয়াছে মা?"

"গিয়াছে।"

"এত শীঘ্র সব কথা ভুলিলে? পিতার সে নিষ্ঠুর বাণী—'অ... তোমরা আমার সুমুখে আসিও না'—এত শীঘ্র ভুলিলে জননী?"

"তিনি স্বামী—আমি পত্নী। তিনি রাজা—আমি তার প্রজা। স্বামী... নিকট উপেক্ষিত হইলেও, সমগ্র হিন্দুস্থান যাঁহার নামে কম্পিত, আ... সেই আকবর শাহের পুত্রবধূ। আমি আমার স্বামীর উপর রাগ করি... য়াছি। শ্বশুরের উপর নহে। রাগ আর অভিমান ত ধূঁয়ার ম... দীর্ঘকাল অদর্শনের বাতাসে সবই উড়িয়া যায়।"

"পিতা কি তোমায় যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন?"

"অনুরোধ নহে—আদেশ করিয়াছেন।"

"তাঁর আদেশ কই?"

"এই দেখ!"

এই বলিয়া যোধাবাই তাঁহার বক্ষবসন মধ্য হইতে, একখানি ... বাহির করিয়া খসরুর হাতে দিলেন। খসরু হস্তাক্ষর দেখিয়া বুঝিলে... তাহা শাহজাদা সেলিমের হস্তাক্ষর।

খসরু কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া বলিলেন—"মা! আমিও আম... সংকল্প পরিবর্ত্তন করিয়াছি। স্থির করিয়াছি, আমিও তোমার সঙ্গে যাই... যদিও নিজের দোষে পিতার বিরাগভাজন হইয়াছি, তাহার শাস্তি... আবার পিতার স্নেহময় হৃদয়ে স্থান পাইব। না পাই—ভাগ্য যদি ...

রূপ হয় তাহাহইলে আর এক স্নেহপ্রবণ-হৃদয়, হিন্দুস্থানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ যিনি, খোদার নিম্নে যিনি শক্তিশালী, তাঁহার বিশালহৃদয়কন্দরে তোমার জন্য সযত্নে রক্ষিত যে অফুরন্ত ভালবাসা আছে—তাহা আমাকে পিতার বিরাগপূর্ণনেত্র হইতে রক্ষা করিবে। চল মা! আমিই তোমার রক্ষক হইয়া যাই।"

পুত্রের প্রাণে শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া, যোধাবাই প্রশান্ত-ভাবে বলিলেন, "তোমায় এসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই করিতে হইবে না। যে বান্দী এই পত্র আনিয়াছে, সে বলিয়াছে, আমায় লইয়া যাইবার জন্য সুলতান একশত শরীর-রক্ষী মোগলসৈন্য পাঠাইয়াছেন। তাহারা এই আম্বেরের সেনানিবাসেই আছে।"

মাতাপুত্রে এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা হইল। সে কথায় দুই-জনেরই ভবিষ্যতের কার্য্যপ্রণালী বিজড়িত। পরে তাহা প্রকাশ পাইবে।

খসরু লজ্জাবশতঃ সেইদিন প্রভাতে, মানসিংহের সহিত দেখা করি-লেন না। মানসিংহ কিন্তু সকল কথাই বুঝিলেন।

খসরুকে যাহা কিছু বলিবার ছিল, তাহা তিনি পূর্ব্বরাত্রেই বলিয়াছেন। এখন খসরুর মাতা যোধাবাইকে তাঁহার বড়ই প্রয়োজন। এজন্য তিনি তাঁহার কক্ষদ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া, স্নেহময় স্বরে ডাকিলেন—"যোধা!"

মানসিংহের কণ্ঠস্বর শুনিয়া, যোধাবাই তখনই কক্ষদ্বারপ্রান্তে আসিয়া, অগ্রজদেবকে কক্ষমধ্যে লইয়া গেলেন। স্নেহমাখা স্বরে, মানসিংহ ভগ্নিকে বলিলেন, "খসরু কোথায়? আমার সহিত সকালে সে দেখা করিল না কেন?"

যোধাবাই একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"গতরাত্রে

সে যাহা করিয়াছে, তার জন্য সে বড়ই অনুতপ্ত। সেকি দেখা করিবার মুখ রাখিয়াছে—দাদা? অম্বরে আর তার স্থান নাই। তাহাকে আমি সঙ্গে লইয়া যাইব।"

মানসিংহ নানা প্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়া, খসরুকে তাঁহার কাছে রাখিয়া যাইবার জন্য যোধাকে বুঝাইলেন। কিন্তু কর্ম্মফলচালিত বাদশাহ পুত্রবধু, তাঁহার সহোদরের কোন যুক্তিকেই প্রবল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সুতরাং মানসিংহের সমস্ত যুক্তিতর্কই, ব্যর্থ হইল।

ভারতবিজয়ী মানসিংহ, ভগ্নির এই অবাধ্যতা দেখিয়া, মনে মনে বড়ই ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার মুখে একটা বিরক্তিরভাব দেখা দিল। মানসিংহ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"যোধা! ভগ্নি! দেখিতেছি ভগবানের সৃষ্ট এই নরনারী কর্ম্মের দাস। কর্ম্মফলই তাহাদের সুপথে বা বিপথে চালিত করে। আত্মম্ভরী মানুষ, পুরুষকারের দোহাই দিয়া এই কর্ম্মস্রোতে বাধা দিতে যায় বটে, কিন্তু বিষম একটা ধাক্কা খাইয়া পরিশেষে হঠিয়া আসে। তোমার স্বামী শাহজাদা সুলতান সেলিম, এই কর্ম্মফলেই তোমার উপর, আর তোমার গর্ভজাত সন্তানের উপর বিরক্ত। কারণ—তোমরা দুইজনই সম্রাটের প্রিয়। তোমাদের উপর সুলতানের এ অবিশ্বাস, এ বিদ্বেষ, কর্ম্মফলসঞ্জাত। আর এই কর্ম্মবীজ—মহা প্রতিভাবান সম্রাট আকবর সাহের স্বহস্তরোপিত। আমিও কর্ম্ম-স্রোতের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া, এই সংকট ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছি। এই কর্ম্মস্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইব তা জানিনা। এই হিন্দুস্থানে অসংখ্য রাজশক্তির উচ্ছেদ করিয়াছি, কিন্তু এই কর্ম্মফলকে উচ্ছেদ করিবার শক্তি আমার নাই। শাহজাদা খসরু অতি চঞ্চলচিত্ত, অতি মাত্রায়

তোষামোদের বশীভূত। তাহার বুদ্ধি আছে, প্রজ্ঞা নাই, সাহস আছে, কিন্তু সে সাহসকে প্রকৃত পথে চালিত করিবার ক্ষমতা নাই। শক্তি আছে, তাহার সদ্ব্যবহার নাই—তাহা নিয়োজিত করিবার চাতুরী নাই। আত্ম-গরিমা যথেষ্ট, কিন্তু গর্ব্বের উপাদান নাই ? জানিনা, অত্যধিক প্রশ্রয়প্রাপ্ত, তোমার গর্ভজাত সন্তান এই খসরুর অদৃষ্টে, ভবিষ্যতে কি ঘটিবে ?”

রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত, এক ক্ষুদ্র স্তম্ভগাত্রে হেলান দিয়া, যোধাবাই সহোদরের সব কথাই শুনিলেন। কথাগুলি, তাঁহার প্রাণে বড়ই জোরে আঘাত করিল। তাঁহার ইন্দীবরনেত্রে অশ্রুধারা দেখা দিল।

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষুমার্জ্জনা করিয়া যোধাবাই বলিলেন—“যদি কর্ম্মই প্রবল হয়, কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ হয়, মানুষ যখন তাহার প্রবল শক্তিতে বাধা দিতে একান্ত অসমর্থ, পুরুষকারের পূর্ণবিকাশ, ভারতবিজয়ী মহারাজ মান-সিংহও যখন সে কর্ম্মস্রোতে বাধা দিতে অক্ষম, অসীম প্রতাপশালী সম্রাট আকবরও যখন সেই কর্ম্মসূত্রের ক্রীতদাস, তখন সামান্যা নারী হইয়া আমি কি করিব মহারাজ ? আমার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশে, এই অলক্ষ্য কর্ম্মশক্তির অধীন হইয়া আমি মোগলসম্রাটের পুত্রবধূ হইয়াছি। জানিনা—ইহা রাজা ভগবানদাসের কি মহারাজ মানসিংহের কর্ম্মফল। হিন্দুরগৃহে আজন্মপালিত হইয়া এইটুকু শিখিয়াছি, স্বামীসেবা মহাধর্ম্ম। পুত্রের লালনপালন মহা কর্ত্তব্য। আমার জীবনাধিক এই খসরু যাতে বিপথ চালিত না হয়—অনাগত বিপদের মুখে অগ্রসর না হয়, তাহাই আমার এখন প্রধান লক্ষ্য,—প্রধান কর্ত্তব্য। মহারাজ ! আমায় সে কর্ত্তব্য পালন করিতে দিন।”

যোধাবাইএর কথাগুলি বড়ই অনুশোচনাময়। এই মর্ম্মস্পর্শী বাণীর

শক্তি, পাষাণহৃদয় মানসিংহের অন্তরতম প্রদেশে, বড়ই জোরে আঘাত করিল। মানসিংহ দেখিলেন—যোধাবাইএর নলিননেত্রদ্বয় ছল ছল করিতেছে। মেঘ উঠিয়াছে—ঝড় আসিতেছে। আর বৃষ্টিও খুব নিকটে।

তিনি তখন প্রবুদ্ধস্বরে বলিলেন—"বহিন্! মনে দুঃখ করিও না। সত্যই আমার পাপে আজ তোমার এ কষ্ট। সুলতান সকল বিষয়ে বড়ই সন্দিগ্ধচিত্ত। কেন না—আকবরশাহ তাঁহার পৌত্র খসরুকে অত্যধিক স্নেহ করেন। সকল পিতামহই ত এরূপ করিয়া থাকেন। আমার উপর বাদসাহের অসীম অনুগ্রহ। খসরুর শ্বশুর খাঁ সাহেবও সম্প্রতি সম্রাটের অনুগ্রহে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। এই সব কারণেই সেলিম সর্ব্বদাই সন্দেহ করেন—আমরা এই প্রজ্ঞাশূন্য খসরুকে হস্তগত করিব। তাঁহার সিংহাসন লাভের পথে বিঘ্ন ঘটাইব। এটা কিন্তু সুলতানের মহা ভ্রম! এই ভ্রমে পড়িয়াই—তিনি তোমার উপর বিরক্ত, খসরুর উপর সন্দিগ্ধ, আমার ও খাঁ সাহেবের উপর বিষদৃষ্টি। আমার মতে—খসরুকে দিনকতক তাহার পিতার নিকট হইতে দূরে রাখাই শ্রেয়ঃ। আর তুমি তাঁহার কাছে যাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছ কেন—তাহাও ত বুঝিতে পারিতেছি না।"

যোধাবাই কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিলেন—"আমার স্বামী যখন আমাকে লইয়া যাইবার জন্য, সেনা পাঠাইয়াছেন—শিবিকা পাঠাইয়াছেন, আর আমার জন্য ইলাহাবাদে অপেক্ষা করিতেছেন—তখন আমি এই সংকট সময়ে কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। পুত্রের উদ্ধত স্বভাবের জন্য, স্বামী একে আমার উপর বিরূপ, তাহার উপর তাঁহার

প্রেরিত লোক ফিরাইয়া দিয়া তাঁহাকে অপমান করিলে, মোগলরাজ প্রাসাদে আমার প্রবেশপথ জন্মের মত রুদ্ধ হইবে।”

মানসিংহ। এত যদি ভয়—তবে রাগ করিয়া অম্বরে আসিলে কেন—বহিন্।

যোধাবাই। রাজপুত-কন্যার স্বভাবসিদ্ধ তেজে। ক্রোধের বশে। একদিন ভ্রমে পড়িয়া একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছি। তা বলিয়া কি বার বার সেইরূপ অবিবেচনার কাজ করিতে হইবে?

মানসিংহ। তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার স্বামীর নিকট যাইতে পার। কিন্তু এর মধ্যে একটা—মস্ত “কিন্তু” আছে?

যোধাবাই। কিসের কিন্তু—মহারাজ?

মানসিংহ। তোমায় তাহা বুঝাইয়া বলিতেছি। আকবর শাহ এখন ফতেপুর শিক্রিতে। শীঘ্রই তিনি আগরায় যাইবেন। তাঁহার শরীর বড়ই অসুস্থ। খস্রু না হয় দিনকতক তাঁহার নিকট থাকুক। তুমি এখন সরাসর ইলাহাবাদে চলিয়া যাও। সম্রাটও কিছুদিন পরে, শিক্রী হইতে আগরায় ফিরিবেন। ভাবিয়া দেখিলাম—খস্রুর এ সময়ে আমার কাছে থাকাও যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা নয়। সম্রাট, আমাকে আদেশ করিয়াছেন—এই সপ্তাহ মধ্যে ফতেপুর শিক্রিতে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে। বোধহয়, আমাকেও তাঁহার সঙ্গে রাজধানীতে যাইতে হইবে। তারপর—অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা। শাস্ত্রকার বলেন—“ক্ষেত্রেকর্ম্মবিধীয়তে।” যেমন দেখিব, বুঝিব, সেইরূপ ব্যবস্থা করিব।”

যোধাবাই, তাঁহার সহোদরের এই কথা গুলি মনে মনে আলোচনা

করিয়া, সন্দিগ্ধস্বরে প্রশ্ন করিলেন—"খসরু—শিক্রিতে তাহার পিতামহের নিকট থাকিলে, তাহার পিতা মনে করিবেন কি ?"

মানসিংহ। বাদশাহ যতদিন বর্ত্তমান, ততদিন খসরুর পিতার কোন কিছু মনে করায় আসে যায় না। পিতার বিরাগ, অনাদর, উপেক্ষা, নিত্য সহ্য করা অপেক্ষা, পিতামহের স্নেহময় আশ্রয় তোমার খসরুর ভবিষ্যৎ স্বার্থের পক্ষে বড়ই প্রয়োজনীয়।

যোধাবাই একবার মর্ম্মভেদী দৃষ্টিতে মানসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া আবার মুখ নত করিলেন। তাঁহার প্রাণের মধ্য হইতে কে যেন বলিল—"যোধা! সাবধান হইয়া কাজ করিও। অম্বরকুমারি! খসরু এখন তোমার পক্ষে মহা সমস্যা। তাহার অদৃষ্টাকাশে কালমেঘ উঠিয়াছে, শীঘ্র ঝঞ্ঝা উঠিবে। আর সে ঝঞ্ঝার ঘূর্ণাবর্ত্তে, তোমার আশা ভরসা সবই ভাসিয়া যাইবে।"

মানসিংহ, মুহূর্ত্তমধ্যে সহোদরার মনোভাব পড়িয়া লইলেন। তাহার এ কঠোর দৃষ্টিপাতের অর্থ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"যোধা! প্রাণেরভগ্নি! তুমিও আমায় অবিশ্বাস করিতেছ! হায় রে! বিপথচালিত অন্ধ মাতৃস্নেহ!"

যোধা, সহোদরের এ তীব্র তিরস্কারে একটু লজ্জিতা হইলেন। তাঁহার রক্তকুসুমলাঞ্ছিত আরক্তগণ্ডে, একটা গভীর রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিল। তখনই মনের ভাব সামলাইয়া লইয়া, যোধাবাই বলিলেন—"তোমার আমার মধ্যে যখন খসরুর ব্যাপার লইয়া মত বিভিন্নতা ঘটিতেছে, তখন খসরুকে ডাকিয়া একবার এ কথাটা জিজ্ঞাসা করিলে হয় না? সে তো এখন আর বালকটী নয়! তাঁহার নিজের সংকল্প কি, তাহা কৌশলে জানিয়া লইলে ভাল হয় না কি ?"

মানসিংহ একটু উপেক্ষাপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"তাহার মত অপরিণত বুদ্ধি যুবকের, স্বাধীন মতামতে বড় কিছুই আসিয়া যায় না। এই তর্কাতর্কি ব্যাপারে বৃথা সময় নষ্ট হইতেছে। যদি তুমি এলাহাবাদে সুলতান সন্দর্শনে না যাও, তাহা হইলে আমি সেনাদের ফিরাইয়া দিতেছি। সুলতান সেলিমকেও এই সঙ্গে এক পত্র লিখিয়া দিই, যে তুমি এখন বড়ই অসুস্থ। মাস কয়েক পরে যাইবে।"

যোধাবাই একটা ব্যাকুলতার সহিত বলিলেন—"না,—না, তা করিয়া কাজ নাই। ইহাতে হিতে বিপরীত ঘটিবে। তিনি ঘটনাটা অন্যরূপে বুঝিয়া ফেলিবেন। দাদা! খসরু এখন আমার সঙ্গেই যাক্। যে সব অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটিতেছে—তাহা দেখিয়া খসরুকে অম্বরে রাখা আর যুক্তি সঙ্গত নয়।"

মানসিংহ ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি বিদ্রূপময় হাস্যের সহিত বলিলেন—"কেন যোধা! তুমি কি ভাবিতেছ, পূর্ব্বরাত্রে খসরু যাহা করিয়াছে, সেজন্য আমি তাহার উপর বিরক্ত বা প্রতিশোধপরায়ণ?"

যোধা এ কথায় একটু মর্ম্মবেদনা পাইয়া, দর্পের সহিত গ্রীবাভঙ্গি করিয়া বলিল—"মনে করিও না দাদা—বীরচূড়ামণি মানসিংহের সহোদরা এতটা অপদার্থ হইতে পারে! সে তাহার সহোদরের প্রাণের মহত্ত্ব, খসরুর প্রতি তাঁহার অনাবিল স্নেহ, খসরুর মঙ্গলের জন্য প্রাণপাত চেষ্টা সব কথাই জানে। তবে মায়ের প্রাণ বড়ই দুর্ব্বল! বড়ই চঞ্চল! সর্ব্বদাই ভাবী অনিষ্টাশঙ্কায় কাতর। এই খসরু বই ত আর আমার দ্বিতীয় নয়নের মণি নাই। তুমি আর কখনও অমন নিষ্ঠুর কথা বলিও না।"

মানসিংহ, যোধাবাইএর এই মৃদু তিরস্কারে একটু অপ্রতিভ হইয়া

বলিলেন,—"না,—না,—যোধা! আমি কেবল তোমার মনোভাব বুঝিবার জন্যই, ও কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছি। যদি এজন্য তোমার মনে কোন কষ্ট দিয়া থাকি, তজ্জন্য আমি বড়ই অনুতপ্ত। তোমার প্রস্তাবেই আমি সম্মত। সুলতান সেলিমের শরীররক্ষী সেনারা, এখনও উৎসুকচিত্তে আমার আদেশ অপেক্ষা করিতেছে। এই সেনা ছাড়া আমার নিজের অনুগত ও শিক্ষিত একশত রাজপুত যোদ্ধা, খসরুর ও তোমার শরীররক্ষী-রূপে দিতেছি। তাহারা সম্পূর্ণরূপে খসরুর আজ্ঞাধীন হইয়া থাকিবে। আর খসরুর স্বার্থ রক্ষার জন্য, আমিও খুব শীঘ্র ফতেপুর শিক্রিতে সম্রাটের নিকট যাইতেছি। খসরু বড় উদ্ধত, বড় অসহিষ্ণু। তাহার উপর সর্ব্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। ভগবান একলিঙ্গ তোমার মঙ্গল করুন।"

এ সম্বন্ধে আর কোন তর্কবিতর্ক সঙ্গত নয় ভাবিয়া যোধাবাই বলিলেন, "তাহাহইলে তোমার রাজপুত সেনাদের প্রস্তুত হইতে বল। আমি সকল বিষয়েই তোমার পরামর্শের অধীন হইয়া চলিব। রাজধানীতে গিয়া যদি কোন নূতন বিপদের সম্ভাবনা দেখি, সওয়ার-ডাকে তোমায় সংবাদ দিব।"

বলাবাহুল্য—পরদিনের উজ্জ্বল প্রভাতে, বালার্ককিরণ—অম্বরের চতুঃপার্শ্বব্যাপী গিরিশিখর স্বর্ণময় জ্যোতিতে প্লাবিত করিবার পূর্ব্বে, মখমলমণ্ডিত শিবিকারোহণে যোধাবাই স্বামী সন্দর্শনে গমন করিলেন। আর এই রাজপুত ও মোগল বাহিনীর পরিচালকরূপে খসরু অশ্বারোহণে মাতৃশিবিকার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভাগ্য ও ভবিতব্য বিতাড়িত হইয়া, যোধাবাই ও খসরু ইলাহাবাদের পথ ধরিলেন। শাহজাদা সুলতান সেলিম, তখন কোন বিশেষ রাজকার্য্য উপলক্ষে, ইলাহাবাদেই অবস্থান করিতেছিলেন। কোন গভীর উদ্দেশ্য চালিত হইয়া, তিনি পত্নী ও পুত্রকে অম্বরপ্রসাদ হইতে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে আদেশ করেন। আর সেই আদেশ পালনের জন্যই মাতা ও পুত্রের প্রথমতঃ আজমীর গমন। তারপর আজমীরে সপ্তাহকাল বিশ্রামের পর তাঁহারা সকলেই ইলাহাবাদে যাত্রা করিবেন।

কিন্তু শিবিকারোহণের পূর্ব্বে যোধাবাই খসরুকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার সহিত এখন তোমার আজমীরে গিয়া কাজ নাই। তোমার পিতা তোমাকে সরাসর তাঁহার নিকট যাইতে বলিয়া দিয়াছেন। তুমি তাঁহারই আদেশ পালন কর। বিশ্বাসী রাজপুত সেনানায়ক কৃপালসিংহই না হয় আমার রক্ষক হইয়া যাইবে।

মাতা ও পুত্র দুইজনেই এক সময়ে অম্বররাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু কিয়দ্দূর আসিয়া খসরু অন্য পথ ধরিলেন। তাঁহার সঙ্গে রহিল, কেবলমাত্র পঞ্চাশৎ বলিষ্ঠ রাজপুত সেনা। বাকী সেনা মানসিংহের বিশ্বস্ত সেনাপতি কৃপালসিংহের নায়কতায়, শাহজাদী বেগম যোধাবাইয়ের শরীররক্ষী রূপে শিবিকাবেষ্টন করিয়া চলিল।

শাহজাদা খসরু

কতক পথ অতিবাহিত করিবার পর, খসরুর দলবল এক পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করিল। এই পাহাড়শ্রেণী আরাবল্লীর শাখা-প্রশাখা মাত্র। অম্বর হইতে এই পাহাড়ের দূরত্ব সাত ক্রোশ।

মধ্যাহ্নের রৌদ্রতেজ বড়ই প্রখর হইয়া উঠিতেছিল। খসরু তাঁহার অধীনস্থ সেনানায়ক হিম্মৎসিংহকে বলিলেন—"হিম্মৎ! আধঘণ্টাকাল তোমরা এই নির্জ্জন স্থানে বিশ্রাম কর। ইতিমধ্যে আমি পাহাড়ের উপত্যকাটী একবার ঘুরিয়া আসি।" হিম্মৎসিংহ এ প্রস্তাবে কোন আপত্তি করিতে সাহস করিল না।

শাহজাদা তখন পথশ্রমে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। তিনি নিজে এবং তাঁহার ভারবাহী বলীয়ান অশ্বও স্বেদজলে পরিপ্লাবিত। দারুণ নিদাঘতাপে তাঁহার সুন্দর মুখমণ্ডল আরও রক্তরাগময় হইয়া উঠিয়াছে। অশ্ব-গ্রীবাসহ-বলগার ক্রমাগত সংঘর্ষণে, বেলাভূমিস্থিত শুভ্র ফেনরাশির মত অশ্বগ্রীবায় ফেনবিকাশ হইয়াছে।

অশ্বটীকে এক বৃক্ষগাত্রে বাঁধিয়া রাখিয়া খসরু ছায়াসম্পদময় এক শ্যামতরুতলে দূর্ব্বারচিত আসনে উপবেশন করিলেন। গিরিতরঙ্গিনীর শীকরময় স্নিগ্ধসমীরস্পর্শে, তাঁহার ললাটের স্বেদবিন্দু ক্রমশঃ লয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

সহসা দূরদূরান্তের বনান্তরাল হইতে, অমৃতপ্রবাহময় সঙ্গীতধ্বনি শাহজাদার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সেই মধুনিঃস্যন্দি সঙ্গীতের উম্মাদনাময় তানতরঙ্গে, খসরুর শ্রান্ত প্রাণের ক্লান্তি দূর হইয়া গেল।

কে গায় অই? কি সুন্দর কণ্ঠস্বর তার, যে এই গান গাহিতেছে। স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি, এ সঙ্গীত কোনও রমণী কণ্ঠের। সুগায়িকার

কণ্ঠনিঃসৃত সুন্দর সঙ্গীত তো রংমহলে অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু এর মত এমন সুকণ্ঠে ত তাহারা গাহিতে পারে না।

খসরু ভাবিলেন—এ নির্জ্জন গহন মধ্যে গান গাহে কে? শুনিয়াছি বনের মধ্যে বনদেবীরা নির্জ্জনে বিচরণ করেন। এ সঙ্গীতধ্বনি কি এই নির্জ্জন কাননবাসিনী কোন অপ্সরীর প্রাণের কাতর অভিব্যক্তি! কি সুন্দর কণ্ঠস্বর! কি মধুর রাগতরঙ্গময়-বাসন্তী ভ্রমরগুঞ্জন! কি সুন্দর প্রাণময়ী মূর্চ্ছনা! কি মধুর ভাবময়ী প্রেমাভিব্যক্তি! কে এ সঙ্গীত গাহিতেছে? সে কি আমাকে দেখা দিবেনা, আমার কাছে আসিবে না?

এই সঙ্গীতধ্বনির প্রতিধ্বনির অনুসরণে, মন্ত্রাকর্ষিত ভূজঙ্গের ন্যায় খসরু উপত্যকামধ্যস্থ জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। সেই উপত্যকার সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিয়া, শ্রবণেন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া শুনিলেন, কে গাহিতেছে—

বাজে বাজে ঐ বাঁশী, যমুনা কিনারে,
কাঁহা কাঁহা মেরি, পিয়া পেয়ারে।

খসরু বুঝিলেন, এ কোন বিরহিণীর করুণামাখা কাতর আহ্বান-বাণী। বিরহব্যথিতচিত্তে কোন উন্মাদিনী গভীর কান্তারের মধ্যে কাতর হৃদয়ে তাহার কান্তকে অনুসন্ধান করিতেছে।

এ প্রেমতৃষাময় মর্ম্মস্পর্শী আহ্বানবাণী, খসরুর প্রাণের দুয়ারে সবলে আঘাত করিল। মলয়চালিত প্রসূনবাসের মত, তাঁহার মর্ম্মসন্ধিতে প্রবেশ করিল। তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ এক নাতিক্ষুদ্র পাষাণস্তূপের উপর স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গীতের দ্বিতীয় স্তর তাঁহার কাণে পশিল। তাহাও

সমভাবে মর্ম্মবেদনাময়। তেমনি কাতরতাপূর্ণ। তেমনি ঝঙ্কারময়। তেমনি চিত্তমোহকর। সেই উন্মাদিনী অদৃশ্য বনান্তরাল হইতে গাহিল—

বসন্তপঞ্চমে—হিন্দোলরাগে .
কুকারত কোয়েলা, প্রেম অনুরাগে
কাঁহা কাঁহা মেরি পিয়া পিয়ারে!

খসরু তন্ময়চিত্তে এই মোহময় সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন। মৃদুসমীর চালিত বৃক্ষের শাখা আশেপাশে দুলিতেছিল। তাহাতে একটা মর্ম্মরধ্বনি জাগিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু খসরু এ সঙ্গীতের পরাংশ শ্রবণে এতই ব্যাকুলচিত্ত যে সেই বৃক্ষপত্রের সন্ সন্ ধ্বনিতেও তিনি যেন বিরক্তি বোধ করিতে লাগিলেন। কেননা, সেই সুররাগতানতরঙ্গমাখা সঙ্গীতের কথা গুলি, বিটপীপত্রের মৃদু সঞ্চালনশব্দে, বড়ই গুলাইয়া যাইতেছিল।

খসরু আবার শুনিলেন, সে গাহিতেছে—

সুখশয়নরচনা, বিফল স্বজনি!
শুখাল মালতীমালা, পোহাল রজনী
কাঁহা-কাঁহা মেরে কান্ত গুণমণি
কাহে না আওল, নিশা অভিসারে।

বড়ই মর্ম্মব্যথাময় এ বিরহ সঙ্গীত। খসরুর হৃদয়মধ্যে এই কথাগুলি তীক্ষ্ণ বিশিখের মত তীব্র আঘাত করিল। কিন্তু এই মর্ম্মঘাতী করুণ বিরহক্রন্দন যাহার প্রাণের অন্তরতম স্তর হইতে বাহির হইতেছে, কোথায় সে? যাহার কণ্ঠস্বর এত সুন্দর, যাহার অন্তর্ভাবের উচ্ছাস ও অভিব্যক্তি এত আবেগময়, যাহার মর্ম্মান্তরালে লুক্কায়িত প্রেমগাথা এত মধুর কলনাদময়, না জানি—সে দেখিতে কেমন? সহসা সেই অবিরাম সঙ্গীত

স্রোতের বিরাম ঘটিল। আর খসরু যেন, সেই বিরামের সঙ্গে তাঁহার সর্ব্বস্ব হারাইলেন।

এই নির্জ্জন উপত্যকায়, শব্দসমাগমশূন্য ক্ষুদ্র পার্ব্বত্যকান্তারে, তাঁহার চিত্তের মধ্যে কৃষ্ণতারকাময় দুইটী উজ্জ্বল চক্ষু জাগিয়া উঠিল। বান্ধুলি-লাঞ্ছিত, আরক্ত ওষ্ঠযুগাবলম্বী, ঘৃণাবিদ্রূপমণ্ডিত কঠোর হাস্যোচ্ছাস, যেন তাঁহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। আগুলফ্‌লম্বিত, অবেণীসম্বন্ধ, কৃষ্ণকেশরাশিসমন্বিত, অপূর্ব্বরূপজ্যোতিমণ্ডিত, এক গর্ব্বিতা রমণীমূর্ত্তি তাঁহার চোখের সম্মুখে যেন সজীবভাবে ফুটিয়া উঠিল। খসরু জীবনে অনেক সুন্দরী দেখিয়াছেন, কিন্তু এই অলঙ্কারশূন্যা, সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তিতে তিনি যেন দিব্যলোকবাসিনী অপ্সরীর সৌন্দর্য্যছায়া দেখিলেন। এ ছায়ামূর্ত্তি যে পুর্ণিমার। খসরু সেই ঘটনাপূর্ণ রাত্রে, গুহাপ্রাঙ্গণে যে বিদ্যুৎ ঝলকময়ী, স্ফুরিতাধরা, পূর্ণিমার তেজমাখা রূপজ্যোতি দেখিয়াছিলেন, জানিনা কোন মায়াবলে এই পাষাণময় উপত্যকায়, তাঁহার চোখের সম্মুখে তখন সেই অপূর্ব্বরূপলাবণ্যময়ী মূর্ত্তিখানি পুনরায় জাগিয়া উঠিল।

খসরু সেই নির্জ্জন উপত্যকাবক্ষে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন "কে—কে তুমি? যার কণ্ঠস্বরে এত অমৃতমাখানো, না জানি সে কত সুন্দরী? কোথায় আছ তুমি, একবার আমায় দেখা দাও। তুমি দেবী হও, মানবী হও, পিশাচিনী হও, মায়াবিনী হও, একবার আমার সম্মুখে এস। এই দুনিয়ার মালিক আকবর-বাদশার পৌত্র আমি। আমি তোমায় আদেশ করিতেছি, এখনি আমার সম্মুখে এস।"

এবারেও খসরুর তৃষিত প্রাণের আশা মিটিল না। যাহাকে তিনি

এতটা কাতরভাবে ডাকিতেছিলেন, সে আসিল না বটে—কিন্তু তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতধ্বনি আবার তাঁহার কর্ণকুহরে পৌছিল।

এবার সে গাহিতেছে—

"চাঁদিনী যামিনী, অতি কাতরা কামিনী
মলয় বিষময়, বাড়িল খালি জ্বালা,
বিষধরদংশন, সম অনুমান, ফুল্লমালতীমালা।
আও ত্বরা পিয়া, মেরে কান্ত শ্যামলিয়া,
আওবি আর কব্? মরণ কি পরে?

সহসা যেন মায়ামন্ত্রবলে এই সঙ্গীতধ্বনির বিরাম ঘটিল। ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির মধ্যে বিবাদ মিটিয়া গেল। সুররাগমুর্চ্ছনা, গমকগিট্‌কারী সব গেল—রহিল প্রাণের নিভৃত কন্দরে এক মোহভরা প্রতিধ্বনি।

সেই নির্জ্জন উপত্যকা বিকম্পিত করিয়া, শাহজাদা আবার ডাকি-লেন—"কে তুমি! কোথায় লুকাইয়া আছ তুমি? একবার আমার সম্মুখে এস। একবার দেখা দাও। আমি প্রাণের প্রীতি দিয়া তোমায় আবাহন করিব। এই উপত্যকাবক্ষ হইতে, সযত্নে বনকুসুম সংগ্রহ করিয়া, তাহার মালা গাঁথিয়া তোমাকে পরাইয়া দিব। যার কণ্ঠস্বর অত সুন্দর, না জানি তার লাবণ্য কত মাধুর্য্যময়! এস বনদেবি! এস ছলনাময়ি, এস দর্পিতে! এস চিত্তরঞ্জিনি!"

হায়! তবুও ত কেহ এ কাতর আহ্বানের উত্তর দিল না। খসরু সংকোচরহিত প্রাণে আবেগপূর্ণস্বরে পুনরায় বলিলেন—"জানিনা! রমণীর প্রাণ এত পাষাণ কেন? এত সমবেদনা বিহীন কেন? দেখিতেছি এই পাষাণ রাজ্যের সীমাবাসিনী হইয়া তুমিও পাষাণী হইয়াছ! 'তাহা না হইলে আমার এ কাতর আহ্বানের কোন উত্তর দিতেছ না কেন?"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নিরাশপ্রাণে, ত্যক্তহৃদয়ে, চঞ্চলমনে, উপত্যকা হইতে ফিরিবার সংকল্প করিয়া, খস্‌রু যেমন দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে বিদ্যুল্লতাতুল্যা এক পরমা সুন্দরী রমণী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল—"যুবরাজ! রমণীকে অতটা নিন্দা করা আপনার উচিত নয়। ভাগ্যে এই নির্জ্জন পাহাড়ে, এ নিন্দা শুনিবার লোক কেউ নাই, তাই রক্ষা! তাহা না হইলে আপনার নামে বড়ই একটা কলঙ্ক থাকিয়া যাইত।"

খসরু সে মূর্ত্তি দেখিয়া চিনিলেন। সে মূর্ত্তি—পূর্ণিমার।

পূর্ণিমার অঙ্গাবরণে গৈরিকবাস। সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুর রেখা। অপাঙ্গে বিদ্যুৎশিখাময়ী সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ। আর মুখে একটা লজ্জা সংকোচময় দর্পিত ভাব!

আর তাহার আগুলফ্‌লম্বিত সুকৃষ্ণ সংসর্পিত চিকুররাজি এলায়িত। সুগঠিত শুভ্রোজ্জ্বল ললাটদেশে অগুরুবাসিত পীতচন্দন চিহ্ন। গণ্ডদেশে স্বাভাবিক আরক্তরাগ। গণ্ডের সে রক্তরাগ দেখিয়া বোধ হইতেছিল—যেন তপনকরলাঞ্ছিত শারদীয় স্থলপদ্মের নয়নরঞ্জন রক্তিমাভা, সে সুন্দর গণ্ডে পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

খসরু, নির্নিমেষনেত্রে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া পূর্ণিমার মুখের দিকে চাহিয়া

থাকিয়া, মনে মনে বলিলেন—দৈন্যদারিদ্রের প্রখর জ্বালাময় তাপক্লিষ্ট এ অতুলনীয় রূপরাশির তুলনা, রঙ্গমহলে খুঁজিলেও ত মিলে না।

তুলনায় সমালোচনা করিতে গিয়া, খসরুর মনে এই সময়ে আর এক রূপসীর রূপের উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব পড়িল। কিন্তু এই পূর্ণিমার রূপসম্পদের কাছে তাহাতো কিছুই নয়। এই রূপসী আর কেহই নন, খসরুর ধর্ম্মপত্নী পিয়ারিবানু বেগম। আকবরশাহ অনেক পদস্থ ওমরাহের শুদ্ধান্তঃপুর খুঁজিয়া, এই রূপসীশ্রেষ্ঠা পিয়ারিকে বাছিয়া লইয়া, পৌত্রবধু করিয়াছিলেন। সম্রাটের বিশ্বাস ছিল, আর রঙ্গমহলের রূপসী নারীমণ্ডলীও বলিতেন, এই পিয়ারার মত সুন্দরী মোগলের রঙ্গমহলে দ্বিতীয় কেহ নাই। আর খসরুও এই পিয়ারার রূপমুগ্ধ। তৎপ্রতি একান্ত সমর্পিত প্রাণ। পিয়ারা এতদিন রাজরাজেশ্বরী রূপে খসরুর হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল, কিন্তু পূর্ণিমা আসিয়া যেন তাহার উজ্জ্বল ছায়া মুছিয়া দিয়া, নিজেই খসরুর হৃদয়াধিকার করিয়া ফেলিয়াছে।

খসরু—হৃদয়ের নিভৃতকন্দর অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, তাঁহার হৃদয় হইতে পিয়ারার সেই বিশ্ববিমোহিনী রূপপ্রভা কোথায় সরিয়া গিয়াছে। আর এই সর্ব্বনাশিনী পূর্ণিমার রূপরাশি, তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত কন্দর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে।

সেই সময়ে শ্যামচ্ছায়া মণ্ডিত নিভৃত বিটপীশাখে লুকাইয়া, একটা পাপিয়া সহসা মর্ম্মস্পর্শী চীৎকার করিয়া উঠিল। খসরু সে স্বরে যেন পূর্ণিমার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। সহসা বনান্তরাল হইতে সদ্য প্রস্ফুটিত বনকুসুমের সুগন্ধ আসিয়া খসরুর নাসারন্ধ্র স্পর্শ করিল। তিনি অনুভব করিলেন, তাহা যেন পূর্ণিমার নিশ্বাসের সুবাস। নির্জ্জন

উপত্যকার বুকের উপর তখনই একটা শীতলস্পর্শ মলয়প্রবাহ বহিয়া গেল। খসরু ভাবিলেন—পূর্ণিমার স্পর্শ বোধ হয় ইহা অপেক্ষাও সুস্নিগ্ধ ও আরামপ্রদ।

খসরু তাঁহার চারিদিক যেন পূর্ণিমাময় দেখিতে পাইলেন। চক্ষু মুদিয়া দেখিলেন—অন্তরে –পূর্ণিমা। চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন—বাহিরেও সেই পূর্ণিমা। বামে, দক্ষিণে, উর্দ্ধে, নিম্নে, যে দিকেই চান—যেন সকল দিকেই এই জ্যোতির্ম্ময়ী পূর্ণিমা চারিদিক আলো করিয়া ফুটিয়া আছে। শুভ্রতুলারাশিবৎ ইতঃস্ততঃ ভ্রাম্যমান মেঘমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সেখানে মেঘান্তরালে চন্দ্ররূপে লুকাইয়া, সে যেন তাহার উজ্জল জ্যোতিতে গগন-নীলিমাকে উজ্জলিত করিতেছে।

কি তন্ময়তা! কি প্রাণেপ্রাণে মিশানো, মর্ম্মেমর্ম্মে জড়ানো, হৃদয়ের পরতেপরতে আঁকা, রূপের উজ্জল ছায়া। কি এক অজানিত যাদু শক্তির অধীন হইয়া খসরু পূর্ণিমার রূপে তন্ময় হইয়া উঠিলেন।

দুষ্টা পূর্ণিমা, শাহজাদার এ বিহ্বল অবস্থা লক্ষ্য করিল। সেই পক্ক বিম্বলাঞ্ছিত ওষ্ঠাধরে মৃদুহাস্য রেখা তুলিয়া, সে জিজ্ঞাসা করিল—"এক দৃষ্টে কি দেখিতেছেন শাহজাদা?"

নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির মত বিহ্বলভাবে খসরু বলিলেন—"কি দেখিতেছি? দেখিতেছি তোমার ঐ বিশ্ব বিমোহন সৌন্দর্য্য। দেখিতেছি, তোমার অই উজ্জল চক্ষুর কৃষ্ণবর্ণ তারকা দুটি। দেখিতেছি, তোমার অই বিম্বফললাঞ্ছিত সুললিত অধরোষ্ঠের স্বাভাবিক রক্তরাগ। পূর্ণিমা! পূর্ণিমা! কেন তুমি এ অনিন্দ্য রূপরাশি লইয়া সে দিন আমায় সেই গুহাপ্রাঙ্গণে দেখা দিয়াছিলে? আমি ত তোমার পূর্ব্বস্মৃতি মুছিয়া ফেলি-

বার চেষ্টা করিতেছিলাম। আবার আজ দেখা দিয়া, কেন আমার সুপ্ত স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলিলে? নির্জ্জন কানন ভূমি হইতে অপ্সরকণ্ঠের সঙ্গীত ঝঙ্কারে, কেন আমার এ উন্মাদ চিত্তে মদিরার নেশা আনিয়া দিলে? ভারত গৌরব, আকবরশাহের পৌত্রকে কেন তুমি তৃণের অধম করিয়া তুলিলে?"

যুবরাজের এইসব কথা শুনিয়া পূর্ণিমা, উন্মাদিনীর মত খল্‌খল করিয়া হাসিয়া উঠিল। খসরু এ বিকৃত হাস্যে চমকিয়া উঠিলেন। মনে মনে ভাবিলেন—"এই পূর্ণিমা কি মায়াবিনী—না উন্মাদিনী? আমার মনের কথা শুনিয়া সে এত হাসে কেন?"

এজন্য খসরু রুষ্টভাবে বলিলেন—"তুমি হাসিতেছ কেন পূর্ণিমা?"

পূর্ণিমা বলিল—"জনাবালি! আপনার অবস্থা দেখিয়া আমার হাসি পাইতেছে। সামান্য এক ভিখারিণী রমণীর জন্য, দিল্লীশ্বরের পৌত্রের এ উন্মত্ততা, এ ব্যাকুলতা, প্রকৃতপক্ষে একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার নয় কি জনাবালি?"

খসরু একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন—"পাষাণি! আমি তোমার মর্ম্মভেদী বিদ্রূপ শুনিবার জন্য তোমায় কাছে আসিতে বলি নাই। তোমার সঙ্গীতকাকলী আমার চিত্তাধিকার করিয়াছে, তোমার রূপ আমার হৃদয়াধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। পূর্ণিমা! পাষাণী! আমার প্রতি প্রসন্না হও।"

পূর্ণিমা গম্ভীর মুখে বলিল—"আপনি কি চান যুবরাজ?"

খসরু। আমি তোমাকে চাই।

পূর্ণিমা। এরই মধ্যে কি ভুলিয়া গেলেন শাহজাদা! আমি

দুর্জ্জয়সিংহের পরিণীতা পত্নী। বাদশাহ-পৌত্রের খেয়াল মিটাবার জন্য, আমি মুসলমানী হইব, দ্বিচারিণী হইব, বিলাসের দাসী হইব?

খসরু। তাহা হইলে স্বামী ত্যাগ করিয়া এ যোগিনীবেশে কোথায় চলিয়াছ তুমি পূর্ণিমা?

পূর্ণিমা। আপনারই সন্ধানে।

খসরু। আমারই সন্ধানে?

পূর্ণিমা। ঠিক তাই। আমি আপনার সহিত রহস্য করিতেছি না।

খসরু। বিরহব্যথার এ করুণ বিলাপ কাহার জন্য পূর্ণিমা?

পূর্ণিমা। আপনারই জন্য!

খসরু। তাহা হইলে তুমি কি আমায় ভালবাস?

পূর্ণিমা। শত্রুকে কেউ কি কখন ভালবাসে?

খসরু। আমি তোমার শত্রু হইলাম কিরূপে?

পূর্ণিমা। জানেন না কি যুবরাজ! আপনার জন্যই আমার স্বামী দুর্জ্জয়সিংহ, জন্মভূমি অম্বর হইতে নির্ব্বাসিত—হয়তো এতক্ষণে কারাগারে আবদ্ধ। আপনার দেহে অস্ত্রাঘাত করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া, মহারাজ মানসিংহ তাঁহাকে এই কঠোর দণ্ড দিয়াছেন।

খসরু। আমি এজন্য বড়ই দুঃখিত। কিন্তু দুর্জ্জয়ের অপরাধের বিচার কর্ত্তা আমি নই—মহারাজ মানসিংহ। তাহা হইলেও আমার দ্বারা যদি তোমার কোন উপকার হওয়া সম্ভব হয়, তাহা আমি করিতে প্রস্তুত

পূর্ণিমা। মানসিংহের অতি প্রিয় ও সন্তান তুল্য আপনি। আকবর

বাদশার আদরের পৌত্র আপনি। আপনি মনে করিলে, অসম্ভবও সম্ভব করিতে পারেন। আপনি আমার স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিন।

খসরু। মানসিংহের বিনা হুকুমে! তাঁহাকে না জানাইয়া?

পূর্ণিমা। তাঁহাকে জানাইলে তিনি মুক্তি দিবেন না। মানসিংহ একবার যে আদেশ প্রচার করেন, তাহা ফিরাইবার সাধ্য এ দুনিয়ায় কাহারও নাই। মানসিংহ আমার স্বামীকে নির্ব্বাসিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। এই মাত্র শুনিয়া আসিলাম, তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়াছেন। আপনি তাঁহাকে বলিলে হয়ত তিনি আপনার অনুরোধ রাখিতে পারেন।

খসরু। মানসিংহকে অনুরোধ না করিয়া কি দুর্জ্জয়সিংহের মুক্তি-লাভের উপায়ন্তর নাই?

পূর্ণিমা। আর এক উপায় আছে। আপনার অঙ্গুলীতে আপনার নামাঙ্কিত যে অঙ্গুরীয় আছে, তাহা না হয় আমায় দিন। শুনিয়া আসিয়াছি, আমার স্বামী অম্বর হইতে তিন ক্রোশ দূরে রতনগড় দূর্গে আবদ্ধ আছেন। এখান হইতে রতনগড় এক ক্রোশ। ঐ অঙ্গুরীয়টী পাইলে হয়তো আপনার সহায়তা ব্যতীত আমার স্বামীকে আমি উদ্ধার করিতে পারি।

খসরু। এখন তোমার মনের উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি। কিন্তু আমি যে এই নির্জ্জন উপত্যকায় আসিয়াছি, তাহা তুমি জানিলে কিরূপে?

পূর্ণিমা। আপনি যখন অম্বর হইতে যাত্রা করেন, তার আগেই আমি বাটীর বাহির হই। এই পাহাড়ের কোল দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, তাহাই আজমীর যাইবার সহজ পথ। আপনার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার

জন্যই আমি এই পাহাড়ে উঠি। তারপর যখন দেখিলাম—আপনি বিশ্রামার্থে নির্জ্জন স্থান খুঁজিতেছেন, দলভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, তখন আমি উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া আপনার অনুসরণ করিয়াছি।

খসরু। গান গাহিতেছিলে কেন?

পূর্ণিমা। আপনার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য! পাছে আপনি শীঘ্র পাহাড় হইতে নামিয়া যান।

খসরু। তুমি অতি বুদ্ধিমতী। খোদা তোমাকে যেমন অতি প্রচুর রূপসম্পদ দিয়াছেন—তেমনি তোমায় বুদ্ধিও যথেষ্ট দিয়াছেন। কিন্তু তোমার জন্য আমি এতটা করিব, তুমি আমার জন্য কিছুই করিবে না পূর্ণিমা?

পূর্ণিমা। আমার প্রাণ দিলেও যদি আপনার উপকার হয়—তাহাতেও আমি প্রস্তুত। আপনাকে চিরদিনই আমি আমার স্বামীর উদ্ধারকর্ত্তা, জীবনদাতা বলিয়া মনে রাখিব। কৃতজ্ঞহৃদয়ে আপনার মঙ্গল কামনা করিব।

খসরু, মনে মনে কি ভাবিলেন। আবার পূর্ণিমার মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, সেই রূপময়ী সূর্য্যকিরণে আরও ঝলমল করিতেছে। দেখিলেন, সেই সৌরকররঞ্জিত পাষাণময় উপত্যকা বক্ষে, রক্তকমললাঞ্ছিত চরণযুগল রাখিয়া, এক ভুবনমোহিনী অপ্সরীমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাহার ওষ্ঠাধর মৃদু কম্পিত, অপাঙ্গে বিদ্যুৎশিখা।

খসরু আত্মবিস্মৃত হইলেন। বলিলেন—"সুন্দরি! দানের বিনিময়ে প্রতিদান আছে। একটী সামান্য প্রতিদানের ভিখারি আমি।"

পূর্ণিমা এবার গোলে পড়িল। খসরুর মুখের উত্তেজিত ভাব দেখিয়াই

সে তাহার মনের কথা বুঝিয়া লইল। বিদ্রূপের সহিত বলিল—"এত দিন পরে বুঝিলাম, পণ না লইয়া দিল্লীশ্বরের পৌত্র পরোপকার করেন না।—কি প্রতিদান চান্ আপনি শাহজাদা ?"

"একবার তোমার ঐ পেলবকরযুগল চুম্বন করিতে দাও। আমার প্রাণের আশা মিটাইতে দাও।" এই কথা বলিয়া খসরু সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইলেন।

খসরুর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, পূর্ণিমা বিদ্যুৎবেগে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

খসরু, আবেগময় কণ্ঠে, উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"পূর্ণিমা ! পাষাণী ! আমার আশা পূর্ণ কর।"

দৃপ্তসিংহীর ন্যায় এক অগ্নিময় কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পূর্ণিমা বলিল—"কিসের আশা যুবরাজ ?"

খসরু, আবেগপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"পূর্ণিমা ! এ উপত্যকা অতি নির্জ্জন। একাবারে জনসমাগম শূন্য ! কেহই এখানে নাই। যাহারা আছে তাহারা আমার অধীনস্থ সেনামাত্র। একবার আমার এ সন্তাপিত বক্ষে এস ! ভবিষ্যতে দিল্লীর মসনদ আমার ! এ সোণার হিন্দুস্থান আমার। আমি তোমায় হিন্দুস্থানের রাজরাজেশ্বরী করিব। সমগ্র হিন্দুস্থান, তোমার অই রক্তকমললাঞ্ছিত চরণতলে লুটাইবে। তোমার ঐ সূর্য্যাতপপীড়িত আরক্তগণ্ডে আমায় একটী চুম্বন করিতে দাও।"

পূর্ণিমা এইবার তাহার বিপদ বুঝিল। আর এটুকুও বুঝিল, সে বিষধর সর্পের সহিত ক্রীড়া করিতে আসিয়াছে। কিন্তু রাজপুত কন্যা সে ! আত্মরক্ষার উপায় না করিয়া অবশ্য সে গৃহের বাহির হয় নাই।

এজন্ত দর্পিত ভাবে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ!"

খসরু সরিয়া দাঁড়াইয়া কৌতুহলপূর্ণমুখে বলিলেন, "কিসের ছি পূর্ণিমা?"

পূর্ণিমা। আপনি না ভারতসম্রাট আকবরশাহের পৌত্র। এ বিশাল হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ মালেক? শাহজাদী পিয়ারউন্নিসার অনুরক্ত স্বামী? এত নীচ আপনার প্রাণ! যার প্রাণে এত হীনতা, সে কি কখনও ভারতের সম্রাট্ হইতে পারে? ছার এই রূপ যৌবন! ক'দিনের জন্য এ সৌন্দর্য্য! বসন্ত কি চিরদিন থাকে শাহজাদা? আমার এই রূপ যে দিন বাসি গুলাবের পাপড়ির মত ঝরিয়া পড়িবে—তখন আপনার এ রূপজমোহ থাকিবে কি শাহজাদা? কিন্তু এই পাপের কলঙ্ক, অত্যাচারের কলঙ্ক—ঘৃণিত বাসনাসিদ্ধির সংকল্প, সতীর অবমাননার দারুণ মর্ম্মজ্বালা জীবনে কখনও কি মুছিবে যুবরাজ!"

খসরু চিরদিনই চঞ্চলমতি—সর্ব্বদাই একটা উন্মাদ খেয়ালের অধীন। সম্রাট আকবরশাহই তাঁহাকে অত্যধিক প্রশ্রয় দানে, তাহার মগজ বিগড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই স্বেচ্ছাচারিতা বা খেয়ালের বশে—খসরু পিতার সহিত এক এক সময় এমন ব্যবহার করিতেন, যাহাতে সুলতান সেলিমের মনে খসরু সম্বন্ধে একটা ঘৃণার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। সুলতান সর্ব্বদাই ভাবিতেন, আমার পিতা প্রশ্রয়দানে, আমার সিংহাসনের অধিকারীকে জাহান্নমে দিতেছেন। পিতার কঠোর শাসন সহায়তায় এই পুত্রকে শাসন করিতে গেলে—তাঁহার পিতা ভারত সম্রাট আকবরশাহ ও খসরুর মাতা যোধাবাই তাহার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইতেন। এইজন্য সুলতান সেলিম, সকলেরই উপর মনে মনে বিরক্ত।
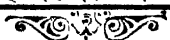
কেবল তাহা নহে, খসরুর প্রতি পিতামহের এই অত্যধিক স্নেহ—সুলতান সেলিমের মনে সময়ে সময়ে একটা উৎকট সন্দেহ জাগাইয়া তুলিত। তিনি ভাবিতেন, যে এর মধ্যে একটা চক্রান্ত আছে, গভীর উদ্দেশ্য আছে, যাহাতে তাঁহার বিরাটস্বার্থ নষ্ট হইতে পারে। যাহাতে তাঁহার মসনদ লাভপথ কণ্টকিত হইতে পারে।

কিন্তু এরূপ হইলেও, খসরুর প্রাণ একেবারে মহত্ব বর্জ্জিত ছিল না। সে প্রাণে সহজাত প্রবৃত্তিচালিত একটা উদারতা, একটা আত্মসংযম, একটা বিবেকের শক্তি, এত প্রচ্ছন্নভাবে লুকায়িত ছিল, যে তাহাকে জাগাইয়া তুলিতে অনেকটা কষ্ট স্বীকার করিতে হইত।

খসরু চরিত্রের এই গূঢ়রহস্য না জানিলেও, ভগবৎপ্রেরিত উপস্থিত বুদ্ধিবশে, আত্মসম্ভ্রম রক্ষার জন্য, পূর্ণিমা খসরুকে পূর্ব্বোক্ত ভাবেই অনুযোগ করিয়াছিল। আর তাহার ফলও ফলিল।

কেননা—খসরু ক্ষণেক চিন্তার পর অনুতপ্ত স্বরে বলিলেন—"সত্যই আমি একটা ভ্রমে পড়িয়া, মহা অনর্থ ঘটাইতে যাইতেছিলাম। পূর্ণিমা! তুমি আমায় ক্ষমা কর। এক মুহূর্ত্তের চাপল্যে, উত্তেজনায়, আত্মসংযম শক্তির শিথিলতায় যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা তুমি ভুলিয়া যাও। আমায় প্রাণ খুলিয়া মার্জ্জনা কর। এই মার্জ্জনার বিনিময়ে আমি তোমাকে দুর্জ্জয়সিংহের উদ্ধারের জন্য, আমার স্বনামমোহরাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয় দিতেছি। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, তোমার কাজ শেষ হইয়া গেলে, এই অঙ্গুরীয় আমায় প্রত্যর্পণ করিবে?"

পূর্ণিমা দেখিল—ঔষধ ধরিয়াছে। রোগী ঔষধের গুণেই বিকারের প্রলাপ ছাড়িয়া সহজ কথা বলিতেছে। খসরুর প্রাণে তখন সত্যসত্যই

আভিজাত্য গৌরবমহত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটু আগে যে ব্যক্তি শয়তান ছিল, সে এখন দেবতা হইয়াছে।

তখন পূর্ণিমা ধীরস্বরে নম্রভাবে বলিল,—"জনাবালির এ প্রস্তাবে আমি স্বীকৃত হইলাম। আমি আবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তবে সম্ভবতঃ আপনার প্রাসাদে নয়। হয়তো আমাদের সাক্ষাতের পূর্ব্বে, আপনি আমার নামাঙ্কিত এক খানি পত্র পাইবেন। সেই পত্রের উপদেশানুযায়ী কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিলেই, আপনি আমার সাক্ষাৎ পাইবেন।"

খসরু তখনই নিজের অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরীয় খুলিয়া, পূর্ণিমার হাতে দিয়া বলিলেন,—"সাবধান! মহারাজ মানসিংহ যেন ঘুণাক্ষরে জানিতে না পারেন—যে দুর্জ্জয়সিংহকে তিনি দণ্ডিত করিয়াছেন, আমি তাহার উদ্ধারকর্ত্তা। যদি ঘটনাবশে বা অদৃষ্টদোষে তুমি ধরা পড়, যদি মহারাজ মানসিংহ তোমায় জিজ্ঞাসা করেন, শাহজাদার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী তুমি কোথায় পাইলে—তখন তুমি কি উত্তর দিবে পূর্ণিমা?

পূর্ণিমা সহাস্যমুখে বলিল,—"বলিব শাহজাদার কক্ষ হইতে এ অঙ্গুরীয় আমি চুরী করিয়াছি। স্বামীর উদ্ধারের জন্য রাজপুতরমণী না পারে কি?"

খসরু বড়ই দুর্ব্বলচিত্ত। তিনি বুঝিলেন—পূর্ণিমা এ ব্যাপারে ধরা পড়িলেও তাঁহার কোন দায়িত্বের সম্ভাবনা নাই। তিনি আশাপ্রফুল্ল চিত্তে পূর্ণিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কবে দেখা হইবে পূর্ণিমা?"

পূর্ণিমা সহাস্যমুখে বলিল—"যেদিন আমার অদৃষ্ট আবার প্রসন্ন হইবে।"

"আমার সহিত সাক্ষাতার্থে তুমি তাহা হইলে আগরা পর্য্যন্ত যাইবে?"

"যাইব বই কি শাহজাদা! প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা রাজপুতের পক্ষে মহাপাপ! আর এ জগতে নারীর পক্ষে অসম্ভব বলিয়া কিছু নাই।" পূর্ণিমা আর দাঁড়াইল না। সে নিমিষের মধ্যে পুনরায় সেই কানন মধ্যে মিশাইয়া গেল।

খসরু একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন—"হায় পূর্ণিমা! আজ আমি যদি তোমার মত কোন কৌশলময়ী রমণীকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পাইতাম, তাহাহইলে প্রেমশৃঙ্খলে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতাম। দেখি আবার তোমার দেখা পাই কি না? জানি আমি—রাজপুত কখনও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি করে না। তোমাকে আবার আমার কাছে আসিতেই হইবে। তখন আমি তোমায় আয়ত্ত্ব করিব।"

এই সময়ে খসরুর সমভিব্যাহারী রাজপুত সেনানায়ক হিম্মতসিংহ আসিয়া বলিল—"জনাব! বড়ই বিলম্ব হইতেছে! এখনও অনেক দূর যাইতে হইবে। আমরা আপনাকে দেখিতে না পাইয়া, চারিদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। হুকুম ফরমাইস করুন খোদাবন্দ!"

সেই রাজপুত-প্রহরীকে সহসা সম্মুখীন হইতে দেখিয়া, খসরু মনে মনে যেন একটু অপ্রতিভ হইলেন। তাঁহার মনে একটা সন্দেহ জন্মিল, হয়তো হিম্মতসিংহ সবই অন্তরাল হইতে শুনিয়াছে। সুতরাং কোন কিছু না বলিয়া তিনি তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। আর একটী মর্ম্মভেদী নিশ্বাসেই তাঁহার সংকল্পিত কার্য্যের নিস্ফলতা প্রকটিত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

শাহাজাদা খসরু, ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, পূর্ণিমার অতুলনীয় রূপপ্রভা, তাঁহার হৃদয়ে কতটা আধিপত্য বিকাশ করিয়াছিল। কিন্তু তাহা না হইলেও তিনি এইটুকু বুঝিলেন,—যদি ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে, তিনি এই রূপসী পূর্ণিমাকে তাঁহার জীবনসঙ্গিনী রূপে লাভ করিতে পারেন, তাহাহইলে তাঁহার সেই ব্যথাযন্ত্রণাময় জীবনের সাধ যেন অনেকটা পূর্ণ হয়। অবসন্ন প্রাণে যেন একটা চির প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠে।

কিন্তু—এই দুনিয়ার একটা প্রধান অভিশাপ এই, যে যাহা চায়, সতৃষ্ণহৃদয়ে কামনা করে, সে তাহার প্রার্থিত ও ইপ্সিত জিনিসটী পায় না। তাহা হইলেও দর্পিত খসরু পূর্ণিমাকে বিদায় দিয়াই মনে মনে ভাবিলেন,—"দুনিয়ার বাদশা আকবরশাহের পৌত্র আমি। সমস্ত হিন্দুস্থান আমায় সম্রাটরূপে বরণ করিবার জন্য উৎসুক। আমার শক্তিমান পিতা, মেহেরউন্নিসাকে শের আফ্‌গানের বুক হইতে ছিনিয়া লইবার জন্য একটা বিরাট চেষ্টা করিতেছেন। তাঁর সে চেষ্টা যদি সফল হওয়া সম্ভব হয়, তাহাহইলে আমার পক্ষে এই পূর্ণিমালাভের চেষ্টা ফলবতী না হইবে কেন? শের আফ্‌গানের শক্তির তুলনায়, ছার এই দুর্জ্জয় সিংহ। আমার অতৃপ্ত আশা পূর্ণ করিতে হইলে যদি এই

দুর্জ্জয়সিংহের নাম ধরণীবক্ষ হইতে মুছিয়া ফেলিতে হয়, তাহতেও আমি প্রস্তুত।”

এই ভাবে চিন্তা করিতে করিতে, খসরু তাঁহার সেনাদল সঙ্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, পাঁচজন মোগল অশ্বারোহী তাঁহার দিকে দ্রুতবেগে অশ্ব ছুটাইয়া আসিতেছে।

খসরু তখনই অশ্ববল্‌গা সংযত করিলেন। তাঁহার মনে একটা ভয়ানক দুর্নিমিত্ত কল্পনাময় আশঙ্কার ভাব দেখা দিল। ফতেপুর শিক্রিতে আসার পর হইতে, সম্রাটের তবিবৎ বড় ভাল যাইতেছিল না। খসরু মনে মনে ভাবিলেন,—সেনারা যখন শিক্রির দিক হইতে আসিতেছে, তখন নিশ্চয়ই আমার জন্য কোন অশুভ সংবাদ আনিয়াছে।

এই মোগল সেনাদের মধ্যে প্রধান যে, তাহার নাম লতিফ খাঁ। লতিফ খাঁ সম্রাটের খাস্ আরদালী। খসরুকে দেখিবামাত্রই লতিফ খাঁ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া পড়িয়া, সসম্ভ্রমে শাহজাদাকে একটা কুর্ণীস করিল।

শাহাজাদা খসরু, সোৎসুকে প্রশ্ন করিলেন,—“সংবাদ কি লতিফ? জাঁহাপনার কুশল ত?”

লতিফ খাঁ, তাহার উষ্ণীষবস্ত্রমধ্য হইতে একখানি লোহিতবর্ণের পত্র বাহির করিয়া, যুবরাজ খসরুর হাতে দিল। খসরু কম্পিতহৃদয়ে সেই পত্রখানি পাঠ শেষ করিয়া বুঝিলেন—সম্রাট পীড়িত হইয়াছেন। খসরুকে দেখিতে বড়ই উৎসুক। এজন্য তখনই তাঁহাকে ফতেপুর শিক্রির রাজপ্রাসাদে যাইতে হইবে।

খসরু ঘোর অদৃষ্টবাদী। তিনি তখনই বুঝিলেন, তাঁহার জীবনের

সমস্ত ঘটনাচক্র করামলকবৎ তাঁহার নিজের আয়ত্বাধীন নহে। তিনি মাতৃআজ্ঞা শিরে ধরিয়া, ইলাহাবাদে পিতার সহিত সাক্ষাতার্থে যাইতেছিলেন। মধ্য হইতে অদৃষ্ট আর এক নূতন ঘটনাচক্র সৃষ্টি করিয়া, তাঁহার সে সংকল্প বিফল করিয়া দিল।

লতিফর্খাঁর মুখে সম্রাটের কঠিন পীড়ার কথা শুনিবামাত্রই, খসরুর প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। যুবরাজ তাঁহার পিতামহের বড়ই আদরের ছিলেন। এতঠা আদর, এতটা স্নেহ, এতটা প্রশ্রয়, প্রতিপদে অপরাধের এতটা ক্ষমা, তাঁহার পিতা সুলতান সেলিম, তাঁহার প্রথম যৌবনে এই আকবরশাহের নিকট পাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ! খসরুকে একদণ্ড তিনি চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। আর খসরুও তাহাব পিতামহকে ছাড়িয়া, দীর্ঘকাল দূরে থাকিতে পারিতেন না।

খসরু, বিষণ্ণমুখে তাঁহার সেনাপতি হিম্মতসিংহকে সকল কথা খুলিয়া বলিয়া, আদেশ করিলেন,—"হিম্মত! সম্রাটের পীড়া বড় কঠিন। পূর্ব্বের সকল বন্দোবস্ত নাকচ করিয়া, আগে তাঁহার নিকটই যাইতে হইবে। আজমীরে যাইবার কোন প্রয়োজনই নাই। ইলাহাবাদ ত দূরের কথা। হিম্মতসিংহ তুমি দলবল লইয়া আমার পশ্চাৎবর্ত্তী হও।"

ফতেপুরশিক্রি সেথান হইতে মাত্র পাঁচক্রোশ। খসরু ও তাঁহার দলবল যথা সময়ে ফতেপুর শিক্রিতে পৌছিলেন। পৌছিয়াই মহলের প্রধান প্রহরীকে খসরুর প্রথম প্রশ্ন—"শাহান্‌শাহ কেমন আছেন?"

প্রহরী অস্ত্র নোয়াইয়া, খসরুকে কুর্ণীস করিয়া বলিল,—"শাহজাদা! সম্রাটের অবস্থা কাল রাত্রে বড়ই খারাপ গিয়াছিল। আজ প্রভাত হইতে তিনি ভাল আছেন।"

খসরু এ সংবাদে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন,—"সম্রাট এখন কোথায়?"

প্রহরী। তাঁহার খাসমহলে।

খসরু। সেখানে আর কে কে আছে।

প্রহরী। মহারাজ বীরবল আর সম্রাটের অন্তরঙ্গমিত্র আবলফজল।

খসরু কালবিলম্ব না করিয়া, তখনই খাসমহলে সম্রাটের কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—এক স্বর্ণখচিত পালঙ্কের উপর ভারত-সম্রাট আকবরশাহ অর্দ্ধশায়িত ভাবে, মহারাজা বীরবলের সহিত গল্প করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুটী যেন কক্ষের প্রবেশ দ্বারের দিকে সংন্যস্ত।

খসরু, দ্রুতপদে সম্রাটের শয্যা পার্শ্বে গিয়া, অবনতজানু হইয়া, এক কুর্ণীস করিয়া, উচ্ছাস রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল—"দাদা!"

আকবরশাহ সত্যই এই খসরুর আশাপথ চাহিয়াছিলেন। খসরুর আগমন প্রতীক্ষা করিরাই তিনি দ্বারের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিতেছিলেন। সহসা খসরুকে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, আর তাহার চক্ষে অশ্রুধারা দেখিতে পাইয়া, সম্রাটের হৃদয় বড়ই বিচলিত হইল।

সম্রাট খসরুকে বুকে টানিয়া লইয়া, তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন। স্নেহময়স্বরে বলিলেন,—"তুমি আসিয়াছ খসরু! কাল আমার যে অবস্থা গিয়াছে,—তাহার সমতা যদি না ঘটিত, তাহাহইলে হয়তো তোমায় সেকেন্দ্রায় গিয়া আমার কবরের উপর অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইত।"

কথাটা খসরুর প্রাণে বড়ই আঘাত করিল। সে কাতরভাবে

বলিল,—"এমন নিষ্ঠুর কথা বলিবেন না জাঁহাপনা! আপনি ভিন্ন-এ হতভাগ্যের মুখের দিকে চাহিবার আর কে আছে?"

সম্রাট এ সম্বন্ধে আর কোন কিছু না বলিয়া, প্রশ্ন করিলেন,—"তুমি কি সবাসর অম্বর হইতে আসিতেছ?"

খসরু। হাঁ জনাবালি!

আকবর। তোমার মাতা তোমার সঙ্গে আসিলেন না কেন?

খসরু। তিনি ইলাহাবাদে আমার পিতার নিকট গিয়াছেন।

আকবর। ইলাহাবাদে? কেন? কে তাহাকে সেখানে যাইতে পরামর্শ দিল?

খসরু। তিনি স্বেচ্ছায় গিয়াছেন!

আকবর। তোমার মাতা আমার পীড়ার কথা শোনেন নাই?

খসরু। না—তাহা হইলে হয়তো সেখানে যাইতেন না। পিতার একটা জরুর আদেশ পাইয়াই, তিনি ইলাহাবাদে তাহার কাছে গিয়াছেন।

আকবর। এখন বুঝিয়াছি। এই ব্যাপারটা, আমার পুত্র সুলতান সেলিমের অসংখ্য খেয়ালের একটা ক্ষুদ্র প্রবাহমাত্র। এক এক সময়ে এই খেয়ালের শক্তি এতটা বাড়িয়া উঠে, যে তাহাতে আমার আদেশ উপদেশ পর্যান্ত ব্যর্থ হইয়া যায়। যাক্—তোমার মাতুল—মহারাজ মানসিংহ এখন কোথায়?

খসরু। তিনি অম্বরেই আছেন। শীঘ্রই এখানে আসিবেন।

আকবরশাহ ভ্রূকুটীভঙ্গী করিলেন। খসরু তাহা দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু তাহা তীক্ষ্ণদৃষ্টি আবলফজলের দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। আবলফজল মনে মনে প্রমাদ গণিলেন।
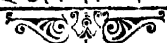
শারদাকাশের অবস্থার মত, সম্রাটের মুখভাব তখনই পরিবর্ত্তিত হইল। যে কালো মেঘখানা দেখা গিয়াছিল, তাহা তখনই সরিয়া গেল। তিনি খসরুকে বলিলেন, "এখানে না আসিয়া, সর্ব্বাগ্রে তোমার রঙ্গমহলে যাওয়াই উচিত ছিল। সেখানে একজন তোমার আশাপ্রতীক্ষায় দিন গুণিতেছে, আর কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে। যাও—আগে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া আইস।"

খসরু, বাদশাহের এই রহস্যে বড়ই লজ্জিত হইলেন। কিন্তু ভারতেশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করে, এমন শক্তি কার? খসরু, অগত্যা সেই রাজ কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে খসরুর মনের অবস্থা হেমন্তকালের সুনীল আকাশের মত সম্পূর্ণরূপে মেঘশূন্য। এই প্রসন্নতাপূর্ণ অবস্থায়, তাঁহার মন হইতে মানসিংহ, দুর্জ্জয়সিংহ এবং অতীতের সকল ব্যাপারই যেন মায়াবলে সরিয়া গেল। মাতার তিরস্কার, পূর্ণিমার রূপের মোহ, কোথায় চলিয়া গেল।

খসরুর স্নেহপ্রবণ পিতামহ, সম্রাট আকবর, পৌত্রের জন্য ফতেপুরশিক্রির প্রাসাদ মধ্যে একটা স্বতন্ত্র মহল করিয়া দিয়াছিলেন। এ মহলের নাম ছিল, "পিয়ারে-মহল।" খসরুর সহধর্ম্মিণী পিয়ারেবানু বেগমের নামানুসারেই এই মহলের নামকরণ হইয়াছিল।

পিয়ারে বেগম পরমাসুন্দরী। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আকবরশাহ আগরার অসংখ্য সুন্দরীর মধ্য হইতে, এই পিয়ারেবানুকে নির্ব্বাচিত করিয়া, খসরুর কণ্ঠলগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। পিয়ারে তাঁহার বড় আদরের পৌত্রবধূ। বৃদ্ধ সম্রাট, পিয়ারের এই অপরূপ রূপলাবণ্য দেখিয়া, অনেক সময়ে মনে মনে ভাবিতেন, খসরুর মতন উড়ন্ত চিড়িয়াকে,

পিয়ারা যে হীরার জিঞ্জির পরাইয়া দিয়াছে, তাহা সে কখনই ছিন্ন করিতে পারিবে না। কখনই পলাতক হইবে না।

খসরুর অদৃষ্টের সহিত সমসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায়, শাহজাদী বেগম পিয়ারেবান্নু সম্রাটের বিশেষ স্নেহের পাত্রী হইয়াছিল। সম্রাট, খসরুকে যেমন সর্ব্বদাই চোখে চোখে রাখিতে ভাল বাসিতেন, যেখানে যাইতেন সঙ্গে লইতেন, খসরুর অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী পিয়ারির সম্বন্ধেও সেইরূপ ব্যবস্থা করিতেন। এইজন্যই পিয়ারেবান্নু ফতেপুর-শিক্রির রাজপ্রাসাদেও একটী স্বতন্ত্র মহলের অধীশ্বরী হইয়াছিল—আর আকবরশাহ ফতেপুরে ছিলেন বলিয়া, সেও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল।

এই রূপসীশ্রেষ্ঠা, পিয়ারীকে শাহজাদা খসরু প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতেন। পিয়ারার কৃষ্ণতারকাময় সুরমারেখাবঞ্জিত উজ্জ্বল আঁখি দুটি, সর্ব্বদাই এই চঞ্চলচিত্ত খসরুকে চুম্বকাকর্ষিত অয়সের মত তাহার সম্মুখে আবদ্ধ করিয়া রাখিত। কখনও পিয়ারা, কখনও পেয়ারেবান্নু, আর কখনও বা পেয়ারে বেগম বলিয়া সম্বোধন করিয়াও খসরুর প্রাণের আশা মিটিত না।

রূপের মত রূপ দিয়া, বিধাতা এই পিয়ারাকে এ দুনিয়ায় পাঠাইয়াছিলেন। এ রূপ চঞ্চল বিদ্যুৎশিখার মত সমুজ্জ্বল, পৌর্ণমাসীর চন্দ্র-কিরণের মত স্নিগ্ধ ও অমৃতবর্ষী। সে চকিত চঞ্চল দৃষ্টিতে যেন একটা গভীর প্রেম, প্রখর আসক্তি, একান্ত আত্মসমর্পণের ছায়া। তাহার কথায় প্রেমের পঞ্চম কাকলী, তাহার ভাষায় প্রেমের ছন্দ, তাহার কুসুম পেলব স্পর্শে সম্মোহিনী শক্তি, তাহার অদর্শনে—বিরাটশূন্যতা।

পতঙ্গ যেমন উজ্জ্বল দীপালোক দেখিলে, একদৃষ্টিতে তাহার দিকে

চাহিয়া থাকে, তারপর অধীরচিত্তে তাহাতে ঝম্প প্রদান করে, খসরুও সেইরূপ এই পিয়ারা বেগমের প্রদীপ্ত রূপজ্যোতিতে, পতঙ্গবৎ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদৃষ্টে, বহুক্ষণ ধরিয়া পিয়ারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেও তাহার কোন ক্লান্তি জন্মিত না। দর্শনের আশাও মিটিত না। তাহার প্রেমভাষাময় নলিননেত্র দুটী, অব্যক্ত, অস্ফুট, নীরব ভাষায় কি বলিতেছে, খসরু এক এক সময়ে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পারিতেন না। সর্ব্বদা সরসহাস্যপ্রফুল্ল পূর্ণবিম্বাধরের মৃদুকম্পন, হৃদয়-মধ্যস্থ কোন্ নিগূঢ় ভাবপ্রভাবে ধীরে কাঁপিতেছে—তাহা বুঝিতে না পারিয়া, খসরু অনেক সময়ে ভীষণ সমস্যার মধ্যে পড়িতেন।

আর এই রূপসীশ্রেষ্ঠা যাদুকরী পিয়ারা, যখন তাহার আরক্ত ওষ্ঠাধরে একটা কৌতুহলপূর্ণ হাসি চাপিয়া রাখিয়া, অপাঙ্গে একটা ছোট খাট বিদ্যুৎ হানিয়া, খসরুকে প্রশ্ন করিত—"একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছ—তুমি শাহজাদা ?"

খসরু তখন প্রেমবিমুগ্ধকণ্ঠে অপ্রতিভের মত বলিয়া ফেলিতেন,—"কি দেখিতেছি ? যাহা চিরজন্ম দেখিলেও এ আঁখির তৃপ্তি হয় না, তাহাই দেখিতেছি পিয়ারি ! যাহা আমার মত হতভাগ্যের মরুময় পিপাসিত জীবনের স্নিগ্ধ বারিপ্রবাহের কলনাদময় উচ্ছ্বাস, তাহাই দেখিতেছি। এই জ্বালাময় মর্ত্ত্যে যাহা চিরশান্তি, চিরআরাম, খোদার শ্রেষ্ঠ উপহার, বেহেস্তের রত্নখণ্ডিত চিরোজ্জ্বল কক্ষেও যাহা অতি দুর্লভদর্শন—তাহাই দেখিতেছি ! এত ভালবাসা, এত প্রেম, এত স্নেহ, এত করুণা, এত আত্মসমর্পণ, প্রেমপ্রস্রবণের চির অফুরন্ত এত সুপ্রচুর অমৃতধারা, আর কোথায় পাইব আমি পিয়ারেবানু ?"

খসরুর এই গভীর অনুরাগময় প্রেমাভিব্যক্তি শুনিয়া, সুন্দরী পিয়ারা অনেক সময়ে লজ্জায় মরিয়া যাইত। এ সব কথা শুনিলে, তাহার স্বভাবারক্তিম বদনমণ্ডল আরও লোহিত হইয়া উঠিত। সে লজ্জায় সেই স্থান হইতে চলিয়া গিয়া মনে মনে বলিত—"তোমার এ ভালবাসার প্রতিদান কি আমি এ জন্মে দিতে পারিব? ছার রূপসী আমি! বাঁদীর বাঁদীরূপে, তোমার চরণে আশ্রয় পাইবার যোগ্যা আমি নই। একটা সামান্য বাঁদীর জন্য, তোমার এতটা কাতরতা কেন জীবিতেশ্বর?"

সত্যসত্যই খসরু এই রূপসম্পদশালিনী পিয়ারা বেগমকে তাহার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ভাল বাসিয়াছিল। খসরু অনেক সময় নির্জ্জনে বসিয়া মনে মনে ভাবিত, এই পিয়ারাবানু সত্যসত্যই রূপে গুণে অতুলনীয়া। সে আমার হৃৎকোষের শোণিত, নেত্রের জ্যোতিঃ, প্রাণের প্রাণ, কলিজার কলিজা। এ জগতে ত আমার আপনার বলিবার কেহ নাই। কর্ম্মফলে আমি সকলেরই বিষনেত্রে পড়িয়াছি। আমার সকল দোষ, গুণ, চরিত্রের দুর্ব্বলতা, পাপপুণ্য, সবই ত এই পেয়ারাবানু জানে, তবুও ত সে আমাকে ঘৃণা করে না।

আর পিয়ারাবানু? সে এ দুনিয়ায় আর কাহাকেও জানে না, জানে—কেবল সেই, কন্দর্প-লাঞ্ছিত সুন্দর কান্তিময়, শাহজাদা খসরুকে। তাহার চোখে, খসরুর ন্যায় কান্তিময় পুরুষশ্রেষ্ঠ আর এ জগতে দ্বিতীয় নাই। খসরুর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের তুলনায়, কোকিলের পঞ্চম কাকলীও পরাজিত হয়। খসরুর ভাষাময় আঁখিদুটী পিয়ারার মুখের উপর পড়িলে, সেই আঁখির নীরব ভাষা যেন বলিয়া দেয়—"পিয়ারি! তুমি আমার সর্ব্বস্ব। এ বিশাল দুনিয়ায় কেবল—আমি আর তুমি। আমাদের এ
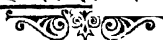
জীবনে চির পূর্ণিমা। আমাদের এ জীবনে নিত্যই নব বসন্তবিকাশ। আমাদের এ সুখময় জীবনপ্রবাহে, কেবল অনন্ত প্রেমসঙ্গীতের মৃদুতানতরঙ্গ।

পিয়ারার মতে, খসরুর প্রাণে খোদা যে ভালবাসা, যে দেবোচিত মহত্ত্ব, যে বালকোচিত সারল্য দিয়াছেন—তেমন আর কাহাকেও এ দুনিয়ায় দেন নাই। পিয়ারা তাহার সর্ব্বস্ব বিকাইয়া, খসরুতে ষোল আনা আত্মসমর্পণ করিয়াছে—সে তাহাতে পূর্ণরূপে মিশিয়া গিয়াছে। খসরুর সুখেই তাহার সুখ—খসরুর দুঃখেই তাহার দুঃখ, তাহার হর্ষে সে হর্ষময়ী, তাহার বিষাদে সে বিষাদমলিনতাসমাচ্ছন্না। তাহার ন্যায় পতিপ্রাণা রমণীর পক্ষে, স্বামীর সুখের জন্য যতটা ত্যাগস্বীকার, যতটা আত্মসমর্পণ করা উচিত, তাহা সে পূর্ণভাবেই করিয়াছে—তবুও অনেক সময়ে তাহার মনে হয়, সে যেন কিছুই করে নাই।

মাসাধিক পূর্ব্বে—এই ফতেপুর শিক্রি হইতেই খসরু তাহার মাতার সহিত অম্বরে চলিয়া গিয়াছিল। শাহজাদা খসরুর অম্বরগমনের—পর হইতে, পিয়ারা বেগম মূর্ত্তিমতী বিষাদপ্রতিমারূপে, রঙ্গমহলের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। কত দীর্ঘ রজনী সে উন্মাদিনীর মত মুক্ত বাতায়নপথে আশাপ্রতীক্ষায় চাহিয়া চাহিয়া নিরাশ হইয়া, নেত্রজলে উপাধান আর্দ্র করিয়াছে। কতদিন স্বহস্তে চয়িত ও সযত্নে গ্রথিত, বেলামালতী চম্পক-চামেলি হার, খসরুর গলায় পরাইতে না পারিয়া, তাহা ক্রোধভরে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। আবার কোন দিন বা নিস্ফল আশাপ্রতীক্ষার আবেগময়ী উন্মত্ততাবশে, মধুগন্ধী নাগকেশর মালা, খসরুর তসবীরের উপর দোলাইয়া, আপন মনে উন্মাদিনীর মত বলিয়াছে—"অবাস্তবে এত সৌন্দর্য্য! অবাস্তবের পূজায় এত আনন্দ? না জানি আজ যদি শাহজাদা

তোমার কণ্ঠে এই সযত্নে গ্রথিত নাগকেশরমালা দোলাইতে পারিতাম, তাহাহইলে আমার মালা গাঁথা সার্থক হইত।"

আবার কোন এক চন্দ্রালোকিত নীরবনিথর রজনীতে, সে মর্ম্মভেদী আকুল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছে—"আর যে আমি তোমার বিরহ সহ্য কবিতে পারি না—আর যে তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছ। দাসীবাঁদীর সেবায় আর আমার তৃপ্তি নাই, রাজভোগে আমার অরুচি ধরিয়াছে—মোগলের স্বর্ণখচিত রঙ্গমহলেব গুলাববাসময় নিশ্বাস, আমার দেহে বিষপ্রবাহবৎ লাগিতেছে। ভারতসম্রাট আকবরশাহের আদর, সোহাগ, যাহা আমার চিত্তকে সপ্তমস্বর্গে তুলিয়া দিত, এখন তাহাও যে আর ভাল লাগে না। যে সব চিড়িয়া—সখ্ করিয়া আমি পুষিয়াছিলাম, স্বর্ণ-পিঞ্জরে পুরিয়া যাহাদের আমি অতি প্রিয়জ্ঞানে মুখচুম্বন করিতাম, সে সব চিড়িয়া আমি উড়াইয়া দিয়াছি। আমার সাধের বীণ্, সুরভরা সুরবাহার শ্বেতমর্ম্মর খচিত হর্ম্ম্যতলে অযত্নে লুটাইতেছে। এখন কেবল ভাবিতেছি—কাঁদিতেছি, হা হুতাশ করিতেছি, চোখের জলে নিশাকালে উপাধান আর্দ্র করিতেছি। মর্ম্মভেদী আকুলশ্বাসে বায়ুস্তরের ভার বৃদ্ধি করিতেছি! এত পাষাণ তুমি, এত নিষ্ঠুর তুমি—যে তুমি আমায় ভুলিয়া আছ! এস দয়িত! এস কান্ত! এস ইপ্সিত! এস প্রিয়! এস প্রাণারাম! এস প্রাণাধিক! তোমার পিয়ারাকে একবার বুকে তুলিয়া লও। সে যে অনেক দিন তোমার কোমল আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হয় নাই। কত যুগযুগান্তর ধরিয়া তোমার মধুর কণ্ঠস্বর শোনে নাই।"

দশম পরিচ্ছেদ।

এ হেন প্রেমময়ী ও বিরহকাতরা পিয়ারাবানু বেগমের কক্ষদ্বারপ্রান্তে, আবেগপূর্ণ হৃদয়ে উপস্থিত হইবামাত্রই, খসরুর কর্ণে অমৃতময় সঙ্গীত-ঝঙ্কার আসিয়া পৌঁছিল। খসরু মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেই দ্বারপ্রান্তে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।

পিয়ারা গাহিতেছিল—

* রোনে কে সিবা মেরে, তো কুছ্ বশ্ নহ।
দেখ্‌নে কে সিবা তেরে তরফ্ কুছ্ উম্মেদ নহী।
দিল্‌কে জখ্‌মে তুম্ কব্ ন সকে মরহম্
খুঁকে কতারেঁ বৈসাহী রহী।
যেয়ানে আজাদীকে আয়াথা তেরে পাশ
তুমহি দেখতে রহো ক্যা তেরে কুছ্ বশ্ নহী।

হস্তিদন্তনির্ম্মিত, স্বর্ণখচিত এক ক্ষুদ্র সারেঙ্গের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া, পিয়ারাবানু বেগম, হর্ম্ম্যতলস্থ এক বহুমূল্য গালিচার উপর বসিয়া, উপরোক্ত মর্ম্মস্পর্শী গান গাহিতেছিল। পিয়ারাবানু সঙ্গীতে সুনিপুণা।

* রোদন ছাড়া আমার কিছুই বশে নাই। শুধু তোমার দিকে চাহিয়া থাকা ছাড়া আমার কোন আশা নাই। তুমি আমার হৃদয়কন্দরের ক্ষত সমূহ আরাম করিতে পারিলে না? শোণিতধারা সেই ভাবেই বহিয়া যাইতেছে। মুক্তি ও শান্তির আশায় আমি তোমার নিকটে আসিয়াছিলাম। হায়! কেবল তুমি আমার মুখের দিকে চাহিয়াই রহিলে? তোমার কি কিছুই বশে নাই? (পারসীর অনুবাদ)

তাহার কণ্ঠস্বর অতি সুন্দর। সে যখন সারেঙ্গ বা বীণের সহিত গান গাহিত, তখন সেই কণ্ঠস্বর, সারেঙ্গের সুরতরঙ্গের সহিত এমনভাবে মিশিয়া যাইত, যে তাহা শুনিলে বোধ হইত, সারেঙ্গ যেন মায়াবলে আপনা আপনিই তানতরঙ্গ তুলিয়াছে। সম্রাট আকবরশাহ পিয়ারার গান শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। তিনিই তাহাকে এই বহুমূল্য সারেঙ্গ ও আর একটী বীণ্ উপহার দিয়াছিলেন। দরবেশী, দোঁহা, গজল, খেয়াল, ধ্রুপদাদি আলাপে সন্তুষ্ট করিয়া, চতুরা পিয়ারা দুনিয়ার বাদশাহের নিকট হইতে, কোন সময়ে বা বহুমূল্য মতির মালা, কখনও বা একছড়া হীরার হার, আর কখনও বা অসংখ্য আসরফী পুরস্কাররূপে পাইত।

খসরু দ্বারপ্রান্তে আত্মগোপন করিয়া, এই মর্ম্মস্পর্শী বিরহ সঙ্গীতের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত শুনিলেন। তিনি এ গানটী ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তাঁহার পিয়ারার মুখে শোনেন নাই। তখন ত পিয়ারার প্রাণে বিরহ ছিল না, তখন যে এই পিয়ারীলতিকা চিরমিলনের মধুরমলয়ে ধীরে আন্দোলিত হইতেছিল। কিন্তু এখন বিরহবিকাশে তাহার জীবনের সে সুখের বসন্ত চলিয়া গিয়াছে। আজ জীবনে দারুণ বর্ষা আসিয়াছে—কাজেই সে এই বিরহ সঙ্গীত গাহিতেছে।

বহুদিন তিনি পিয়ারার গান শোনেন নাই। এমন সুন্দর গান কি আর কেহ গাহিতে পারে? পূর্ণিমাও গান গাহিয়াছিল বটে—কিন্তু পূর্ণিমার গানের সহিত তখন তুলনায় সমালোচনার উপাদান ছিল না বলিয়া, তাহা অতি মিষ্ট লাগিয়াছিল। দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া খসরু মনে মনে বলিলেন—"আমার এই পিয়ারাবানুর কাছে পূর্ণিমা! পিয়ারা-বানুর বাঁদী হইবার যোগ্য সে নয়। হায় চঞ্চলমতি পুরুষ!"

গান শেষ করিয়া—সারেঙ্গটাকে ঘৃণার সহিত দূরে সরাইয়া দিয়া, পিয়ারা এক মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"এত নিষ্ঠুর তুমি! এত কাতরভাবে তোমায় ডাকিতেছি, তবু তুমি দেখা দিলে না।"

খসরু দ্বার ঠেলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"এই যে আমি আসিয়াছি পিয়ারা!"

একি স্বপ্ন? স্বপ্ন কি কখন এতটা সফল হয়! পিয়ারা দেখিল, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শাহজাদা—খসরু। তখনই সে সকল ব্যথা ভুলিয়া, স্বামীর কণ্ঠলগ্না হইয়া বলিল—"তোমায় মুখ এত মলিন কেন শাহজাদা?"

খসরু পিয়ারাকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিয়া, তাহাকে এক মখমলমণ্ডিত সোফায় বসাইয়া বলিলেন—"বোধ হয় অত্যধিক পথ-শ্রমের জন্য। অম্বর হইতে এতটা পথ অশ্বপৃষ্ঠে একদমে আসিয়াছি!"

পিয়ারা তখনই একখানি দিরদরদখচিত ময়ূরচন্দ্রকগ্রথিত ব্যজনী আনিয়া, খসরুকে ব্যজন করিতে লাগিল। তারপর সোৎসুকে বলিল, "জাঁহাপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ কি? কাল তাঁর পীড়াটা বড়ই বাড়িয়াছিল! তুমি কাছে নাই, এজন্য আমি বড়ই ভয় পাইয়াছিলাম। খোদা আমার সহায়! আমারই পরিচর্য্যার গুণে তিনি সারিয়া উঠিয়াছেন! যাও—আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়া এস।"

খসরু সহাস্যমুখে পিয়ারার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন,—"তাহা কি বাকি রাখিয়াছি, পিয়ারা! তিনিই ত তোমার সঙ্গে আগে দেখা করিবার জন্য আমায় আদেশ করিলেন। তাই এ বান্দা, তোমার দুয়ারের আড়ালে এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।"

পিয়ারা সহাস্যমুখে বলিল—"তাইতো আমার বিরহের গানটা তাহা হইলে সব শুনিয়া ফেলিয়াছ! কি লজ্জা! তা ওটা গান বই আর কিছুই নয়। কথা গুলা—ওমারখায়েমের। আমার মনের কথা ভাবিয়া যেন ভ্রমে পড়িও না।"

খসরু। না না, ভ্রমে পড়িব কেন? এ বান্দাকে যে ভাবে গানটীকে বুঝিয়া লইতে আদেশ করিবে, সে তাহাই করিবে।

পিয়ারা খসরুর মুখ দেখিয়া দুঃখকষ্ট সব ভুলিয়া গেল। শাহজাদার পরিচর্য্যা, তখন তাহার প্রথম কর্ত্তব্য। তাহাতো এখনো করা হয় নাই। পিয়ারা কৃত্রিম কোপের সহিত বলিল, "জনাবালি! যদি সত্যসত্যই আপনি আমার বান্দা হন—তাহাহইলে এখনি আমার সঙ্গে গোশলখানায় চলুন। আমি আজ স্বহস্তে আমার বান্দাকে স্নান করাইব। আর একটী অনুগত বান্দা আমার আছেন, তিনি বড় যে সে লোক নন। তিনি এই দুনিয়ার বাদশা জালালউদ্দিন মহম্মদ আকবর। সে বান্দাকে আমি এই চোক্ ঠারিয়া যে ইঙ্গিত করি, তিনি তখনই তাহা বুঝিতে পারেন। তাহাকেও আজকাল স্বহস্তে স্নান করাইয়া তৃপ্তি পাই। এস—বান্দা আমার সঙ্গে!"

বস্ত্র পরিবর্ত্তনের পর, সুবাসিত গুলাববারিপূর্ণ মর্ম্মরচৌবাচ্ছায়, স্বর্ণ ভৃঙ্গারে, স্নিগ্ধ তুষারশীতল সলিলধারা ঢালিয়া, সুন্দরী পিয়ারা স্বামীকে স্নান করাইয়া—পুনরায় তাহাকে রাজোচিত পরিচ্ছদে ভূষিত করিল। তারপর ভোজনাগারে লইয়া গিয়া, সুরসাল ফলে, সুমিষ্ট বিলাসভোগ্য আহার্য্যে শাহজাদার ক্ষুন্নিবৃত্তি করাইল। উৎকৃষ্ট সরবতে তাঁহার মেজাজ ঠাণ্ডা করিয়া দিল। পিয়ারার কোন কাজেই খসরু বাধা দিতে অভ্যস্ত নহেন। কাজেই সহজে গোল মিটিয়া গেল।

আহারান্তে পিয়ারা, আবার খসরুকে সঙ্গে লইয়া তাহার কক্ষে আসিল। সযত্নে, সমাদরে তাঁহাকে পার্শ্বে বসাইয়া, সাগ্রহে আবেগভরে স্বামীর কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল—"অম্বর হইতে তুমি একা আসিলে, কিন্তু শাহজাদী বেগমমাতা আসিলেন না কেন?"

খসরু একটু চিন্তিত ভাবে বলিলেন—"আমার পিতার আদেশে তিনি ইলাহাবাদে গিয়াছেন!"

পিয়ারা। সম্রাটের পীড়ার সংবাদ কি তিনি পান নাই?

খসরু। না—সম্রাটের প্রেরিত সেনাদের সহিত আমার পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হয়। তখন আমি মাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্য পথে আসিয়া পড়িয়াছিলাম।

পিয়ারা। জানিনা—খোদার মনে কি আছে! আমার শ্বশুর কি তোমাকে এখানে আসিতে আদেশ করিয়াছেন?

খসরু। না—তিনি আমাকেও ইলাহাবাদে যাইতে বলিয়াছিলেন। আমি পথিমধ্যে সম্রাটের পীড়ার সংবাদ পাইয়া এখানে চলিয়া আসিয়াছি।

পিয়ারা। সামান্যা নারী আমি। ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমার। তোমার এসব কাজের উপর কথা কহিবার শক্তি সামর্থ্য আমার নাই। তবুও আমি এইটুকু বুঝিতেছি, ইলাহাবাদে পিতার নিকট যাওয়াই তোমার উচিত ছিল!

খসরু। কেন এ কথা বলিতেছ পিয়ারি?

পিয়ারা। আকবরশাহের মার্জ্জনাশীল হৃদয়কে আমি শক্তির অধীন করিতে পারি। কিন্তু আমার শ্বশুরের কঠিন হৃদয়ের উপর আমার

সে অধিকার, সে প্রভাব নাই। তিনি বড়ই অভিমানী। বড়ই ক্রোধ-পরায়ণ। আমাদের দুইজনের উপরই তিনি আমাদের ভাগ্যগুণে বিরূপ। এই সামান্য ব্যাপারেই, হয়তো আগুন ধরিয়া উঠিবে। সামান্য একটা স্ফুলিঙ্গ হইতে সময়ে সময়ে যে মহাপ্রলয় ঘটে, একথা ভুলিয়া গেলে কি শাহজাদা? উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তোমার সম্মুখে। সুতরাং অতীতকে এত শীঘ্র বিস্মৃত হওয়া ঠিক হয় নাই।

পিয়ারা যাহা বলিতেছে—তাহাই ঠিক। সামান্য চিন্তার পর, খসরু এই কথাটা বুঝিলেন। পরক্ষণে তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"পিয়ারি! তুমি যাহা বলিয়াছ তাহাই ঠিক। কিন্তু ভবিতব্য যে কর্ম্মফল সৃষ্টি করিতেছে—অদৃষ্ট অন্তরালে থাকিয়া আমার ভাগ্যের উপর যে শক্তি প্রকটিত করিতেছে, তাহাতে বাধা দিবার কোন ক্ষমতা তো আমার নাই! যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহাত ফিরাইবার উপায় নাই।"

পিয়ারা খসরুর কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলিল—"যাহা বলিতেছ তুমি স্বামী! সে কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু অদৃষ্ট ত চিরকাল মানবের সহিত বৈরিতা করে না। যে অদৃষ্ট এখন বিরূপ, তাহাত চিরদিন বিরূপ থাকিবে না। অদৃষ্ট প্রসন্ন হইলে, তাহার হাতের পুরাণো লেখাগুলা সে আপনিই মুছিয়া দিবে। আমাদের চিন্তা, উৎকণ্ঠা, আগ্রহ অনুশোচনা, কিছুরই প্রয়োজন হইবে না।"

পিয়ারা সত্যসত্যই মায়াবিনী। এইমাত্র যাহার কথা শুনিয়া খসরু একবারে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, আবার সেই অন্য কথার ছলে তাহার অবসন্ন চিত্তকে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিয়া দিল।

খসরু, পিয়ারাকে আলিঙ্গনপীড়িত করিয়া বলিলেন—"পিয়ারি!

পিয়ারি! কে তুমি? কোন্ মায়ারাজ্যে তোমার বাস? কোথা হইতে আসিয়াছ তুমি এই মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র লইয়া, যাহাতে আমার অবসন্ন প্রাণ মুহূর্ত্তমধ্যে উদ্দীপনাময় হইয়া উঠিল। এ নিরাশাপীড়িতমর্ম্মে আশার উজ্জ্বল আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিল? বল—কে তুমি পিয়ারি! তোমায় দেখিলে কেন আমি সব জ্বালাযন্ত্রণা ভুলিয়া যাই!"

হসিতবদনা পিয়ারাবানু বেগম, খসরুর মুখের দিকে চাহিয়া এক বিদ্যুৎময় কটাক্ষ হানিয়া, তাহার পাদমূলে বসিয়া বলিল—"আমি এক মায়ারাজ্যের পরী। এ কথা কি তুমি জাননা শাহজাদা? পরীস্থানে আমার বাস। তোমাকে, আর তোমার পিতামহ আকবরশাহকে, ছলনা করিবার জন্য, আমি এখানে আসিয়াছি। কিন্তু আমার এ মোহিনী-মন্ত্রময়, যাদুবিদ্যার শিক্ষাগুরু কে তা জান কি? যদি জানিতে চাও আমি বলিব! এত মায়ামমতা, এতটা স্বামীভক্তির প্রবলোচ্ছাস, এই মোহময় কটাক্ষের অব্যর্থসন্ধান, সবই আমি তোমার পিতামহী ভারতসাম্রাজ্ঞী আকবরশাহের খাসবেগমের নিকট শিখিয়াছি। আর এ কথাও ভুলিও না—এ ব্যাপারের পুরস্কার তিরস্কার, সবই তাঁহার প্রাপ্য।"

ঠিক এই সময়ে, গম্ভীরকণ্ঠে কে যেন সেই দ্বারান্তরাল হইতে বলিল, "বটে! বটে! এত স্পর্দ্ধা তোমার, যে আকবরশাহের পাটরাণীর নামে কলঙ্কারোপ?"

এ কণ্ঠস্বর উভয়েরই পরিচিত। মুহূর্ত্তমধ্যে খসরু ও পিয়ারা দ্বার প্রান্তে আসিয়া অবনতজানু হইয়া, সেই বিরাট পুরুষের চরণতলে বসিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিল।

এই আগন্তুক আর কেহই নহেন, স্বয়ং সম্রাট আকবরশাহ। সম্রাট পিয়ারাকে সহাস্যমুখে বলিলেন—"তোমাব এ নিন্দাবাদ অপরাধেব শাস্তি, আমি তোমায় এখনি দিতেছি। থাক—তুমি একাকিনী অর্দ্ধদণ্ডের মত এই কক্ষে। আর এস তুমি খসরু! আমার খাস মহলে। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কাজের কথা আছে। দিন রাত এই যাদুকরী পিয়ারার অঞ্চলাবদ্ধ হইয়া থাকিলে, ঐ মায়াবিনী তোমায় কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে দিবে না।"

পিয়ারা বেগম এ তিরস্কারে লজ্জায় মরিয়া গেল। তবে তাহার বুকটী দমিয়া গেল না। কেননা—এব পূর্ব্বে এরূপ ঘটনা অনেক ঘটিয়া গিয়াছে। সম্রাট অনেকবার এই প্রেমমুগ্ধ দম্পতীর প্রাণের কথা আড়ি পাতিয়া শুনিয়া, যথেষ্ট আনন্দ ভোগ করিয়াছেন। এটা হইতেছে স্নেহের অপরাধ!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

খসরুকে ত্যাগ করিয়া, এইবার একবার আমাদিগকে পূর্ণিমার অনুসরণ কবিতে হইবে।

মানসিংহ, খসরু ঘটিত ব্যাপারে দুর্জ্জয়সিংহের উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। সত্যই খসরুব উপর তাঁহার পুত্রাধিক স্নেহ ছিল। তাঁহার মতে এই খসরুই হিন্দুস্থানের সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত।

এই জন্যই তিনি তাঁহার চিরবিশ্বাসী পার্শ্বচর দুর্জ্জয়কে, খসরুর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করার অপরাধে নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাহার বিশ্বাস, ভাগ্যে তিনি উপযুক্ত সময়ে সেই গুহা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাই রক্ষা। তাহা না হইলে হয়তঃ দুর্জ্জয়সিংহ আকস্মিক উত্তেজনাবশে এমন একটা ভয়ানক কাজ করিয়া ফেলিত—যাহার জন্য তাঁহাকে ভারত-সম্রাট আকবরশাহের কোপমুখে পড়িতে হইত।

দুর্জ্জয়সিংহ, মানসিংহের অনুগ্রহভাজন ছিল বলিয়া, তাহার অনেক শত্রু জুটিয়াছিল। এই শত্রুদের প্রধান ছিল, মানসিংহের শরীর-রক্ষী সেনাদলের নায়ক লজপৎ সিংহ। এই পূর্ণিমার সহিত সিংহেরই প্রথম বিবাহ প্রস্তাব হয়। কিন্তু বংশগৌরবে দুর্জ্জয়ের অপেক্ষা হীন বলিয়া, পূর্ণিমার পিতা, দুর্জ্জয়সিংহকেই কন্যা সম্প্রদান করেন। ইহার পর হইতেই লজপৎ দুর্জ্জয়সিংহের ও পূর্ণিমার পিতার প্রধান শত্রু হইয়া উঠে।

দুর্জ্জন ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা শক্তি যতই বাধা পায়, ততই সে মরিয়া হইয়া উঠে। মানসিংহ দুর্জ্জয়সিংহের পৃষ্ঠপোষক, এজন্য লজপৎ, দুর্জ্জয়ের কিছু করিতে না পারিয়া, পূর্ণিমার সর্ব্বনাশসাধনে সচেষ্ট হইল।

ঘটনা বশে এই সময়ে পূর্ণিমার পিতার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। লজপৎসিংহ, এই সুযোগ পাইয়া বড়ই প্রতিযোগিতা করিতে লাগিল। পূর্ণিমা মাতৃহীনা। তাহার জন্মস্থান আগরায়। কিন্তু পিতৃভূমি অম্বরে, তাহার পিতা মোগলসৈন্যের সরবরাহকার ছিলেন, এজন্য আগরায় অধিকাংশ সময়ই থাকিতে হইত।

লজপৎ সিংহ—পূর্ণিমার পিতার মৃত্যুর পর ঘটনাজাল সৃষ্টি করিয়া,

পূর্ণিমার মাতার নামে কলঙ্ক রটনা করাইল। কথাটা ক্রমে দুর্জ্জয়সিংহের কাণে গিয়া পৌঁছিল। আত্মাভিমানী, বংশগৌরবে অতি দর্পিত দুর্জ্জয়সিংহ, এই ছলনাজাল মধ্যে পড়িয়া, পূর্ণিমাকে ত্যাগ করিল।

তাহার পর, লজ্জপৎসিংহ পূর্ণিমাকে কৌশলে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা যে না করিয়াছিল, তাহা নয়। কিন্তু সাধ্বী পূর্ণিমার সতীত্বগৌরব-দীপ্ত পবিত্র মুখমণ্ডল, আর তাঁহার নয়নের কোণে বজ্রাগ্নিশিখা দেখিয়া, লজ্জপৎ তাহার নিকট অগ্রসর হইতে আর সাহস হয় নাই।

মানসিংহ, দুর্জ্জয়সিংহকে কোন এক গোপনীয় অপরাধের জন্য, অম্বর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন—কথাটা লজ্জপৎ শুনিল। আর সে এ কথাও শুনিল, যে তিন দিন পরে দুর্জ্জয়কে এই অম্বরসহরের মধ্যে দেখিতে পাইলে, মহারাজের আদেশে তাহাকে কারারুদ্ধ করা হইবে।

এই ঘটনার এক সপ্তাহ মধ্যে, অম্বরে পূর্ব্বোক্ত ফাগুয়ার অনুষ্ঠান হয়। সকলেই জানিত, দুর্জ্জয়সিংহ অম্বর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু একজন সে কথা বিশ্বাস করে নাই। সে এই রাজপুতকুলকলঙ্ক লজ্জপৎ সিংহ।

ফাগুয়ার দিন, কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে, লজ্জপৎ সেই গভীর রাত্রে পাহাড়ের ধার দিয়া আসিতেছিল। সহসা এক নিভৃত স্থানে দুইটী ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া, সে এক ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের পার্শ্বে আত্মগোপন করিয়া, সেই নিশীথ আগন্তুকদ্বয়ের সকল কথাই শুনিল। এই আগন্তুকদ্বয় আর কেহই নহে—পূর্ণিমা ও দুর্জ্জয়সিংহ। তাহাদের মধ্যে কি কি কথোপকথন সেই রাত্রে হইয়াছিল, তাহা পাঠকের অপরিজ্ঞাত নহে।

বলাবাহুল্য, পূর্ণিমা চলিয়া যাইবার পর, প্রেতের মত দুর্জ্জয়ের অনুসরণ

করিয়া, লজপৎ তাহার গুপ্ত আবাসস্থানটী দেখিয়া আসিয়া, তখনই মহারাজ মানসিংহকে সংবাদ দিল।

দুর্জ্জয়সিংহ ইচ্ছা করিয়া তাহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছে ও আত্ম গোপন করিয়া অম্বরেই বাস করিতেছে,—লজপৎসিংহের কথার ছলনায় এইরূপ একটা বিশ্বাসের অধীন হইয়া, মানসিংহ তখনই কয়েকজন সিপাহী পাঠাইয়া, সেই রাত্রেই দুর্জ্জয়কে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। অম্বর সহর হইতে দুই ক্রোশ দূরে, রতনগড়ে মানসিংহের আর একটী ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। পরদিন প্রভাতে দুর্জ্জয়কে তিনি এই রতনগড়ে বন্দীরূপে পাঠাইয়া দিলেন।

পূর্ণিমা সেইদিনের প্রভাতেই এই সংবাদটা শুনিল। কিন্তু সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, যে মানসিংহ চিরদিনই দুর্জ্জয়সিংহকে অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার প্রতি তিনি এতটা নিগ্রহ-পরায়ণ হইলেন কেন?

পূর্ণিমা মনে মনে ভাবিয়া দেখিল,—এই দুর্জ্জয়সিংহকে মানসিংহের কোপমুখ হইতে যদি কেহ রক্ষা করিতে সক্ষম থাকেন, ত তিনি শাহজাদা খসরু। এজন্য পূর্ণিমা—খসরুর অন্বেষণে ও তাঁহার কৃপাভিক্ষার জন্য অম্বরপ্রাসাদের দিকেই যাইতেছিল। কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর সে দেখিল, পঞ্চাশৎ সওয়ার সঙ্গে শাহজাদা খসরু আজমীরের পথে চলিয়াছেন। দুর্জ্জয়সিংহের পরিত্যক্তা পত্নী হইলেও, সে অম্বরপ্রাসাদের অনেককেই চিনিত।

পূর্ণিমা অগত্যা পাষাণস্তূপের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া, খসরু-পরিচালিত সেনাদলের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। সে যখন দেখিল, খসরু তাঁহার সেনাদলকে উপত্যকামধ্যে বিশ্রাম করিতে আদেশ

করিয়া, পাহাড়ের এক নির্জ্জনপ্রদেশে প্রস্থান করিলেন, তখন সে অন্য দিক দিয়া, সেই পাহাড়ের জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিল।

কি উপায়ে, সে খসরুর মনোযোগ আকর্ষণ করে, খসরুর সহিত, তাহার কি কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, কি উপায়ে সে খসরুর নিকট হইতে তাঁহার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটী সংগ্রহ করে, পাঠকপাঠিকা তাহারও পরিচয় পাইয়াছেন।

লজপৎসিংহের চেষ্টাতেই, দুর্জ্জয়সিংহ যে কারারুদ্ধ হইয়াছে, ইহাই পূর্ণিমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু কি উপায়ে, এই শয়তান লজপৎ, দুর্জ্জয়সিংহের গুপ্ত অবস্থান স্থানের সন্ধান পাইল, তাহা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

খসরুর নিকট হইতে এই অঙ্গুরীয়কটী লাভ করায় পূর্ণিমা ভাবিয়াছিল, সে অতি সহজেই দুর্জ্জয়সিংহকে কারামুক্ত করিতে পারিবে। কিন্তু তাহার সে আশা সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছিল। কেন—তাহা বলিতেছি।

যে উপত্যকামধ্যে খসরুর সহিত পূর্ণিমার সাক্ষাৎ হয়, সেখান হইতে রতনগড়ের দূরত্ব এক ক্রোশের কিছু উপর। পূর্ণিমা মুহূর্ত্তমাত্র সময়ক্ষেপ না করিয়া, এক ঘণ্টার মধ্যেই, রতনগড়ে পৌছিল। তখন অপরাহ্ন কাল।

পূর্ণিমা—দুর্গদ্বারে পৌছিয়াই, প্রধান প্রহরীকে সেই অঙ্গুরীয় দেখাইল। প্রহরী—সেই অভিজ্ঞান দৃষ্টে সসম্ভ্রমে দ্বার ছাড়িয়া দিল। পূর্ণিমাকে সে কোন প্রশ্নই করিল না।

কিন্তু পূর্ণিমা জানে না, কারাকক্ষ কোন্ দিকে। এই রতনগড় মানসিংহের অধিকারভুক্ত—আর এটি তাঁর সেনানিবাস। কারাকক্ষের

সন্ধান লইবার জন্য, সে এক বয়োবৃদ্ধ সৈনিককে—পুনরায় সেই অঙ্গুরীয় দেখাইয়া বলিল—"দুর্জ্জয়সিংহ কোথায় অবরুদ্ধ আছেন বলিতে পারেন কি ?"

এই ব্যক্তিই কারারক্ষক। ইহাঁর নাম, ক্ষেমসিংহ। ক্ষেমসিংহ গৈরিকবাস পরিহিতা, সেই অতুলনীয়া সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া, একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—"কে তুমি মা ? কোথা হইতে আসিতেছ তুমি ?"

পূর্ণিমা—সপ্রতিভভাবে উত্তর করিল—"আমি মহারাজ মানসিংহের দাসী। এই দুর্জ্জয়সিংহ আমার একজন নিকট আত্মীয়। আমি অম্বর হইতে আসিতেছি। মহারাজই আমায় পাঠাইয়াছেন।"

ক্ষেমসিংহ—সন্ধিগ্ধভাবে বলিল —"কেন কি প্রয়োজনে ?"

"দুর্জ্জয়সিংহকে মহারাজের এক গোপনীয় আদেশ জানাইতে।"

"ভাল—তুমি আমার সঙ্গে এস। আমি তোমায় দুর্জ্জয়সিংহের কারাকক্ষ দেখাইয়া দিতেছি।"

এই কথা বলিয়া ক্ষেমসিংহ, দুর্জ্জয়ের কক্ষদ্বারে পূর্ণিমাকে পৌছিয়া দিয়া, কারাকক্ষের প্রহরীকে চুপি চুপি কি বলিয়া, দাড়ি চোমরাইতে চোমরাইতে অন্য দিকে চলিয়া গেল।

প্রহরী দ্বার খুলিয়া দিলে—পূর্ণিমা সেই কারাকক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল—এক ক্ষুদ্র শয্যার উপর দুর্জ্জয়সিংহ পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে।

পূর্ণিমা, স্নেহময়স্বরে ডাকিল—"দুর্জ্জয় ! প্রাণাধিক !"

এ যে পূর্ণিমার কণ্ঠস্বর ! দুর্জ্জয় তখনই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"পূর্ণিমা ! পূর্ণিমা ! তুমি এখানে কি করিয়া আসিলে ?"

পূর্ণিমা, দুর্জ্জয়ের গা টিপিয়া বলিল—"আস্তে কথা কও। কারাপ্রহরী দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। আমি তোমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি।"

দুর্জ্জয়। কি করিয়া উদ্ধার করিবে?

পূর্ণিমা। এই দেখ! এই কথা বলিয়া, সে তাহার বক্ষবসন মধ্য হইতে, একটী অঙ্গুরীয়ক বাহির করিয়া দুর্জ্জয়কে দেখাইল।

দুর্জ্জয় দেখিল—সেটী শাহজাদা খসরুর নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়। সে সোৎসুকে বলিল—"এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলে তুমি?"

পূর্ণিমা। শাহজাদা আমায় দিয়াছেন!

দুর্জ্জয়। কেন?

পূর্ণিমা। তোমায় মুক্তি দিবার জন্য!

দুর্জ্জয়। মানসিংহের স্বাক্ষরিত মুক্তির পরোয়ানা কই?

পূর্ণিমা। এই অঙ্গুরীয়ই তোমার মুক্তির পরোয়ানা।

দুর্জ্জয়সিংহ, বাল্যকাল হইতে শাহজাদা খসরুকে দেখিয়াছে। সে তাহার রীতিপ্রকৃতি, মতিগতি খুব ভালরূপই জানিত। এজন্য সে বলিল, "পূর্ণিমা! তুমি সত্য গোপন করিতেছ কেন? খসরু একথা জানেন, আমায় মুক্তি দিলে তাঁহার সম্পূর্ণ বিপদ ঘটিতে পারে। আমি মুক্তি পাইলেই তাঁহার পিতা সুলতান সেলিমকে যে একটা খুব জবর সংবাদ বেচিতে পারি, ইহাও তিনি বুঝেন। খসরু তাহার পিতাকে হত্যা করিবার সংকল্প চিত্তমধ্যে পোষণ করিয়াছিল, এ সংবাদটি সেলিমের চক্ষে অতি বহুমূল্য। এই একটীমাত্র সংবাদের জোরেই আমি আবার সেলিমের প্রিয়পাত্র হইতে পারি। আমি যে পূর্ণমাত্রায় প্রতিশোধপরায়ণ, শাহজাদা তাহা ভালরূপেই জানেন। এরূপ স্থলে, আমায় মুক্তি দিবার জন্য কোনরূপ

চেষ্টাই তাঁহার দ্বারা হওয়া সম্ভবপর নহে। যতক্ষণ তুমি না বলিবে, কি উপায়ে, এই অঙ্গুরীয় সংগ্রহ করিয়াছ—ততক্ষণ আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত নই।"

পূর্ণিমা বড়ই গোলে পড়িল। সুচতুর দুর্জ্জয়সিংহকে প্রবঞ্চিত করা বড় সহজ কাজ নয় বুঝিয়া, সে এই অঙ্গুরীয় সংগ্রহ সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপার দুর্জ্জয়সিংহকে খুলিয়া বলিল। স্থিরভাবে সমস্ত কথা শুনিয়া, দুর্জ্জয়সিংহ কম্পিতস্বরে বলিল—"কেন এ ছার জীবনের জন্য এই দীন ভিক্ষা! কেন, এ ঘৃণ্য—অনুগ্রহ প্রার্থনা? যে খসরু তরবারি ভাঙ্গিয়া দিয়া, আমার রাজপুতের গৌরবে আঘাত করিয়াছেন, যে মানসিংহ আমাকে চিরানুরক্ত, চিরবিশ্বাসী ভৃত্য জানিয়াও, ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছেন—তাঁহাদের কাহারই অনুগ্রহলাভ করিতে এই দর্পিত দুর্জ্জয় ইচ্ছা করে না। কেন—কেন পূর্ণিমা! তুমি আমার জন্য এ হীনতা স্বীকার করিলে?"

দুর্জ্জয়সিংহের এই সব কথায়, পূর্ণিমা বড়ই মর্ম্মবেদনা পাইল। বলিল, "কেন করিলাম, তাহার কারণ কি তোমায় বুঝাইয়া বলিতে হইবে দুর্জ্জয়? তুমি যে এই অভাগিনী—পূর্ণিমার সর্ব্বস্ব! আমার শ্রেষ্ঠ ইষ্ট, অভীষ্ট, ইহকাল, পরকাল, পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম সবই যে তুমি দুর্জ্জয়! বৃথা বিলম্ব করিও না! সময় বহিয়া যাইতেছে! তোমার বস্ত্রাদি আমায় পরিতে দাও, আমার এই গৈরিকবাস তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি। সন্ধ্যার অন্ধকার—এই দুর্গের চারিদিক ছাইয়াছে। কেহই তোমায় চিনিতে পারিবে না। শাহজাদা খসরুর নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয় দেখাইয়া, তুমি স্বচ্ছন্দে দুর্গের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারিবে?"

দুর্জ্জয়সিংহ কম্পিতস্বরে বলিল—"তাহাহইলে তোমার কি দশা হইবে পূর্ণিমা?"

পূর্ণিমা। অবশ্য আজ রাত্রে এ ব্যাপার লইয়া কোন গোলমালই হইবে না। কাল প্রভাতে ধরা পড়ি, তখন তাহার উপায়ও করিতে পারিব। ক্ষত্রিয়রাজ, হিন্দু মানসিংহ, কখনই স্ত্রী-হত্যা করিতে সাহসী হইবেন না!

দুর্জ্জয়সিংহ মুহূর্ত্তকাল স্থিরচিত্তে কি ভাবিয়া বলিল—"পূর্ণিমা! তুমি মহাভ্রমে পড়িয়াছ! কি উপাদানে বিধাতা যে এই দুর্জ্জয়সিংহের কঠোর হৃদয়কে গড়িয়াছেন, তাহার পূর্ণ পরিচয় তুমি আজও পাও নাই। যে শাহজাদা খসরু আমার প্রধান শত্রু, তাহার প্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক সহায়তায়, রমণীর বেশ পরিধানে, এ তুচ্ছ প্রাণরক্ষার জন্য পলাইতে, এই রাজপুত দুর্জ্জয়সিংহ আজও অভ্যস্ত হয় নাই।"

তৎপরে একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, দুর্জ্জয়সিংহ বলিল, "পূর্ণিমা! তোমার এ চেষ্টা বিফল হইয়াছে। ভগবান একলিঙ্গের নামে শপথ করিয়া আমি বলিতেছি, এইরূপ হীন উপায়ে, আমি কিছুতেই মুক্তিপ্রার্থী নই। যাও—যাও পূর্ণিমা! এখান হইতে চলিয়া! যদি ভালবাসার মর্ম্মস্থানে পৌঁছিয়া থাক, তাহাহইলে অধীরা হইও না। ভগবানের অভিশাপে, আমার নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে, বা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে, আমরা এখানে মিলিত হইতে পারিলাম না বটে, কিন্তু পরলোক আছে—সেখানে কেহই আমাদের চির মিলনে বাধা দিতে পারিবে না। আগেও বলিয়াছি এখনও তোমায় এই কথা বলিতেছি। রাজপুত—তার জীবনের মূল্য অতি সামান্য বলিয়া ভাবে। ইহজীবনে যখন তোমায় পাইলাম না, পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন মরণই আমার

প্রার্থনা। এ গৌরবময় মৃত্যু জীবনের মতই স্পৃহনীয়। তবুও লোকে বলিবে হাঁ—দর্পিত দুর্জ্জয়সিংহ প্রকৃত ক্ষত্রিয় সন্তান! নারীর সাহায্যে, আর ত্বমনের অনুগ্রহে, সে মুক্তিলাভ না করিয়া, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছে।"

এই সব কথা বলিবার সময় দুর্জ্জয়সিংহের নেত্রদ্বয় দিয়া অগ্নিস্ফুরণ হইতেছিল। আর তাহার স্বরও দৃঢ়তাব্যঞ্জক!

দুর্জ্জয়সিংহের দর্পিত প্রকৃতি, ও নির্ব্বন্ধের কথা পূর্ণিমা যে না জানিত, তাহা নয়! সে দুর্জ্জয়সিংহের বাক্যকথনভঙ্গী হইতেই বুঝিল, তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছে।

অশ্রুপূর্ণনেত্রে, মলিনমুখে, দুর্জ্জয়ের পদপ্রান্তে বসিয়া, পূর্ণিমা বলিল. "যদি তাই হয়, আমার অকাল-বৈধব্যই যদি বিধাতার ইপ্সিত হয়, তাহাহইলে আমি ভগবানের এ দণ্ড,—রাজপুতনারার মতই মুখ বুজিয়া সহ্য করিব। কিন্তু স্থির জানিও—দুর্জ্জয়সিংহ! আমিও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-ময়ী রাজপুত রমণী। আমাদের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি অতি ভয়ানক। আমিও ভগবান একলিঙ্গের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, যাহাদের জন্য আমার এই অকাল বৈধব্য সুচিত হইবে—তাহাদের সমূহ সর্ব্বনাশ না দেখিয়া, আমি মরণকে আশ্রয় করিব না।"

পূর্ণিমা আর কিছু না বলিয়া, উন্মাদিনীর মত দ্রুতবেগে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। হায়! হতভাগিনী পূর্ণিমা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মানুষে ভাল হইবে মনে করিয়া এ সংসারে যাহা কিছু করিতে যায়, অনেক সময়ে তাহার ফল মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ণিমা, দুর্জ্জয়সিংহের উদ্ধারকামনা করিয়া, দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার ফল মন্দ হইয়া দাঁড়াইল। যদি এইখানেই এ ব্যাপারের যবনিকাপতন হইয়া যাইত, তাহাহইলে বুঝিতাম, পূর্ণিমার অদৃষ্ট অতি সুপ্রসন্ন। কিন্তু তাহা হইল না।

পূর্ণিমা প্রাঙ্গণ পার হইয়া লৌহময় দুর্গদ্বারের নিকটে আসিবামাত্রই, পক্ককেশ ক্ষেমসিংহ, তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"মা! মহারাজ মানসিংহ তোমাকে স্মরণ করিয়াছেন। তিনি উপরের এক নিভৃত কক্ষে, তোমারই অপেক্ষায় বসিয়া আছেন।"

মানসিংহের নাম শুনিয়া, অভাগিনী পূর্ণিমা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মুখ শবের মত মলিন হইয়া গেল। পূর্ণিমা কম্পিতস্বরে ক্ষেমসিংহকে বলিল—"আমার মত এক সামান্যা রমণীর নিকট তাঁহার কি প্রয়োজন?"

ক্ষেমসিংহ অপেক্ষাকৃত প্রসন্নভাবে বলিল,—"তাহা ত ঠিক বলিতে পারিতেছি না মা! আমরা তাঁর আদেশবাহী ভৃত্য মাত্র। এস! তুমি আমার সঙ্গে।"

ক্ষেমসিংহ পূর্ণিমাকে সঙ্গে করিয়া, কয়েকটী সোপানশ্রেণী অতিক্রম করতঃ, এক আলোকোজ্জ্বল কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষের সজ্জা অম্বরপ্রাসাদের মত না হইলেও, কোন সম্ভ্রান্ত লোকের বৈঠকখানার সম্মানরক্ষার উপযুক্ত।

পূর্ণিমা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল,—এক বীরপুরুষ সমান্তরাল ভাবে তাঁহার প্রশস্ত বক্ষের উপর দুটী হাত রাখিয়া, চিন্তিতমুখে সেই ক্ষুদ্র কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতেছেন।

এই বীরপুরুষকে দেখিবামাত্রই, পূর্ণিমা তখনই তাহাকে চিনিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সে দেখিল,—স্বয়ং মানসিংহ তাহার সম্মুখে।

পূর্ণিমা তখনই নতজানু হইয়া মহারাজকে প্রণাম করিয়া, অস্ফুটস্বরে বলিল—"মা ভবানী মহারাজের মঙ্গল করুন।"

মানসিংহ, একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পূর্ণিমার মুখের দিকে চাহিলেন। তৎপরে ধীরস্বরে বলিলেন—"পূর্ণিমা! তুমি দুর্জ্জয়সিংহকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলে? মিথ্যা বলিও না।"

পূর্ণিমা বলিল—"হাঁ মহারাজ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা হোক্।"

মানসিংহ সহাস্যমুখে বলিলেন—"এ সম্বন্ধে তোমার ত বিশেষ কোন অপরাধ হয় নাই পূর্ণিমা! পতিপ্রাণা হিন্দুরমণী তুমি। সতীসাধ্বী তুমি। স্বামীর উদ্ধারের জন্য তোমার এ চেষ্টা, অবশ্য আমার চক্ষে অপরাধ নহে। কিন্তু সোজা পথে না গিয়া, তুমি যে একটু বাঁকাপথে গিয়াছ—ইহাতে আমি একটু রুষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার নিকট আসিয়া যদি এই দুর্জ্জয়সিংহের মুক্তি প্রার্থনা করিতে, বোধ হয় আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অসম্মত হইতাম না! কিন্তু তুমি এ সম্বন্ধে যাহা কিছু

করিয়াছ, তাহা অতি সহজেই নিষ্ফল হইয়াছে। এ কথা তুমি স্থির জানিও, মানসিংহের রক্ষীরা বা ভৃত্যেরা, চারিটা চক্ষু লইয়া কাজ করে। এরূপ রীতিবিগর্হিত কার্য্য করিতে গিয়া তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, তাহাও আমি মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত। কিন্তু একটী মাত্র করারে!"

পূর্ণিমা যুক্তকরে বলিল—"কি করার মহারাজ?"

মানসিংহ। শাহজাদা খসরুর নামাঙ্কিত সেই অঙ্গুরীয়টী আমাকে দাও!

পূর্ণিমা। তাহাহইলে আমার স্বামী মুক্তিলাভ করিবেন?

মানসিংহ। না—এটা তোমার কৃতাপরাধের সামান্য শাস্তি।

পূর্ণিমা। শাহজাদার অঙ্গুরীয় যদি আপনাকে না দিই!

মানসিংহ। এই দুর্গে অনেক তাতারী-প্রহরী আছে। আমার আদেশে তাহারা এখনই তোমার গাত্রবস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া, সেই অঙ্গুরীয় কাড়িয়া লইবে। তুমিও কারানিক্ষিপ্ত হইবে। যে দুর্জ্জয়সিংহের কারাবাসের আদেশ আমি নিজমুখে দিয়াছি—যাহাকে কোন রাজনৈতিক কারণে কিছুকাল আটক রাখা আমার বিশেষ প্রয়োজন, তাহাকে যে আমার চক্ষে ধূলি দিয়া কৌশলে উদ্ধার করিতে যায়, তাহার অপরাধ অমার্জ্জনীয়। তাহার নিগ্রহ-লাঞ্ছনা অপরিহার্য্য!

পূর্ণিমা এবার রাগিল। তাহার নাসারন্ধ্র ক্রোধে স্ফীত হইল। সে দর্পিতভাবে বলিল—"কিন্তু রাজপুতকেশরী মহারাজ মানসিংহ তো মোগল নহেন। আমি রাজপুত রমণী। ধর্ম্ম-বোধে, কর্ত্তব্য-বোধে, আমি যাহা করিয়াছি, তাহাতে আমি ধর্ম্মের চক্ষে পাপী নই—ন্যায়ের দ্বারে অপরাধী নই। মহারাজ! আপনি আমায় যথেচ্ছা দণ্ডিত করিতে পারেন।

মানসিংহ দেখিলেন—ভগবান এই পূর্ণিমাকে অন্য উপাদানে গড়িয়াছেন। ভয়প্রদর্শনে, তাহার নিকট হইতে কাজ পাওয়া যাইবে না। এজন্য অম্বরেশ্বর মানসিংহ, অপেক্ষাকৃত প্রসন্নমুখে বলিলেন—"পূর্ণিমা! সত্য বল—শাহজাদার এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলে তুমি?"

পূর্ণিমার মনে এই সময়ে খসরুর নিকট সেই প্রতিশ্রুতির কথা জাগিয়া উঠিল। সে বলিল—"আমি ইহা শাহজাদা খসরুর কক্ষ হইতে চুরী করিয়াছি!"

উত্তেজিত স্বরে মানসিংহ বলিলেন—"অসম্ভব! পূর্ণিমা! তুমি আবার মিথ্যাকথা বলিতেছ। ভগবান তোমাকে যে উপাদানে গড়িয়াছেন, তাহাতে এরূপ হীন চৌর্য্যবৃত্তি, তোমাদ্বারা কখনই সম্ভবপর নয়। সত্য বল, কথাটা জানিতে আমার বড়ই ঔৎসুক্য হইয়াছে। মনে জানিও, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য চালিত হইয়া, আমি তোমায় এখানে আহ্বান করিয়াছি। যদি তোমার কার্য্যের বা ব্যবহারের দোষে, আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির বা স্বার্থের কোন ব্যাঘাত ঘটে, তাহাহইলে তোমার সমূহ বিপদ ঘটিবে। আর এ কথা জানিও, প্রয়োজন বুঝিলে, তোমার অকালবৈধব্য ঘটাইতেও এই মানসিংহ কুণ্ঠিত হইবে না!"

এইকথা শুনিয়া, পূর্ণিমা মর্ম্মেমর্ম্মে শিহরিয়া উঠিল। সে মানসিংহের ভীষণ প্রকৃতির কথা ভালরূপই জানিত। তাঁহার স্বার্থের মুখে বাধারূপে আসিয়া পড়িলে, কাহারও নিস্তার নাই। প্রমাণ—এই দুর্জ্জয়সিংহ! অগত্যা পূর্ণিমা, ভূমে বসিয়া যুক্তকরে, কাতর স্বরে, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল, "আমার সর্ব্বনাশ করিবেন না মহারাজ! দুর্জ্জয়সিংহের জীবন অপেক্ষা এ জগতে আর কিছুই আমার চক্ষে বহুমূল্য নহে। তাহার জীবন

ভিক্ষা দিন। সত্য বলিতেছি, আমি এ অঙ্গুরীয় শাহজাদার নিকট হইতেই পাইয়াছি। তিনি স্বেচ্ছায় ইহা আমাকে দিয়াছেন ”

এই কথা বলিয়া, পূর্ণিমা খসরুর সহিত কি উপায়ে সেই উপত্যকা মধ্যে সাক্ষাৎ করিয়াছিল, কেমন করিয়া সে সেই অঙ্গুরীয় সংগ্রহ করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সমস্ত কথাই মানসিংহকে খুলিয়া বলিল।

মানসিংহ সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া, একটু বিস্মিত হইলেন। আর এইটুকুও বুঝিলেন—নির্ব্বোধ খসরু পূর্ণিমার রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছে। ক্রীড়নক স্বরূপ এই পূর্ণিমাকে হাতে রাখিতে পারিলে, খসরুর উপর অন্যদিক দিয়া, আর একটা নূতন শক্তিবিকাশে তাহার বিশেষ সুবিধা হইবে। এই ভাবিয়া, মানসিংহ পূর্ণিমাকে বলিলেন—“শাহজাদা খসরুর অঙ্গুরীয় তোমায় ফিরাইয়া দিতে হইবে না। উহা তোমার নিকটেই রাখিয়া দাও! আর দুর্জ্জয়সিংহের জীবনের সম্বন্ধে তোমার কোন আশঙ্কাই নাই। আমি প্রতিশ্রুতি করিতেছি, আর দুই মাস পরে, আমি তোমার দুর্জ্জয়কে কারামুক্ত করিয়া দিব—তাহাকে পুনরায় পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিব। সেই সঙ্গে তোমাকেও অম্বর রাজপ্রাসাদে কন্যারূপে আশ্রয় দিব, তোমার ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিব। আর যে লক্ষপৎসিংহ, তোমার মাতৃকলঙ্ক রটনা করিয়াছে, তাহার মুখও জন্মের মত বন্ধ করিয়া দিব। কিন্তু আমি যেমন এতগুলি প্রতিশ্রুতি দিলাম, তোমাকেও সেইরূপ একটা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইবে। তোমার দ্বারা আমি একটা ছোট খাট কাজ করাইয়া লইতে চাই। সে কাজে তোমাকে কোনরূপ হীনতা স্বীকার করিতে হইবে না। যদি আমার এ কাজটী করিতে পার, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার

মত অতি দর্পিতা, অতি বুদ্ধিমতী, অতি সাহসী নারীতে তাহা নিশ্চয়ই পারিবে—তাহার পরিবর্ত্তে আমি তোমায় এক সহস্র আসরফী এনাম দিব। আমার সহিত এখনি তুমি অম্বরপ্রাসাদে চল। তোমার কর্ত্তব্য কি, তাহা তোমাকে সেখানে পৌছিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।”

পূর্ণিমা মানসিংহের এই সব কথায় মনে বড়ই একটা সাহস পাইল। নিজের নারীর ইজ্জত ও সম্মান বজায় রাখিয়া, তাহার জীবনসর্ব্বস্ব দুর্জ্জয়কে নিরাপদে রাখিয়া, সে সকল কাজই করিতে প্রস্তুত।

পূর্ণিমা বলিল—“মহারাজের প্রস্তাবে আমি খুব সম্মত। আর এ সম্বন্ধে আপনার নিকট প্রতিশ্রুতিও করিতেছি। কিন্তু একটা কথা জানিতে পারি কি—মহারাজ! কি উদ্দেশ্য চালিত হইয়া এ অভাগিনীকে আপনার কাজে নিযুক্ত করিতেছেন?”

মানসিংহ গম্ভীর মুখে বলিলেন—“পূর্ণিমা! দুর্জ্জয়সিংহের সুখ-স্বচ্ছন্দ, নিরাপদতা যেমন তোমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—শাহজাদা খসরুর সুখস্বচ্ছন্দ, চিত্তের শান্তি, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, তেমনি আমার জীবনের লক্ষ্য। তোমাকে সহায় করিয়া আমি এমন একটা ক্ষুদ্র কাজ করিব, যাহাতে আমার ভাগিনেয় এই খসরুর স্বার্থ, বিপথগামী হইবে না। তোমাকে খসরুর সম্মুখে যাইতে হইবে না, তাহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন কাজই করিতে হইবে না। তোমার কার্য্যক্ষেত্র বাদশাহের রঙ্গমহলের মধ্যে বা বেগমদের সঙ্গে। কিম্বা আমার বিভাগের মঠে। অন্য পরপুরুষের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অম্বরদুর্গের মধ্যে যে ক্ষুদ্র মহল আছে, সেই মহলে তুমি আমারই

তত্ত্বাবধারণে অম্বরে থাকিবে। এখন আমার প্রস্তাবে তুমি সম্মত আছ কি ?"

পূর্ণিমা বলিল—"আপনি যখন সকল বিষয়ে আমাকে অভয় দিতেছেন, তখন আপনার প্রস্তাবে অসম্মত হইবার কারণ ত কিছুই দেখিতেছি না মহারাজ !"

মানসিংহ প্রসন্নমুখে বলিলেন—"তাহাহইলে আর কালবিলম্ব না করিয়া, আমার সঙ্গে অম্বরপ্রাসাদে চল। আমি জানিতাম, তোমাকে আয়ত্ত করা আমার পক্ষে বেশী কষ্টকর হইবে না। এইজন্য ক্ষেমসিংহকে বলিয়া আমি পূর্ব্ব হইতেই একখানি পালকী আনাইয়া রাখিয়াছি।"

মহারাজ তখনই ক্ষেমসিংহকে তলব করিয়া আদেশ করিলেন—"দুর্জ্জয়-সিংহ কারাগারে থাকিয়া যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে চাও। আমি অশ্বপৃষ্ঠে অম্বরে যাইতেছি। এই বাঈকে এখনি তোমার আনীত পালকী করিয়া অম্বরপ্রাসাদে পাঠাইয়া দাও।"

মহারাজ মানসিংহ নিম্নতলে নামিয়া আসিয়া, অশ্বারোহণে অম্বরের পথ ধরিলেন। যথাসময়ে ক্ষেমসিংহের ব্যবস্থায়, পূর্ণিমাও রক্ষীপরিবেষ্টিতা হইয়া, শিবিকারোহণে অম্বরের পথে যাত্রা করিল।

এই পূর্ণিমা, বন্দী দুর্জ্জয়সিংহকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রবশে, সে নিজেই মানসিংহ-সৃজিত নূতন ঘটনার পাকচক্রে বন্দিনী হইয়া পড়িল। ইহাকেই বলে ভবিতব্য !

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ণিমাকে যথাযথ উপদেশ দিয়া, তৎপর দিনই মানসিংহ তাহাকে উপযুক্ত যানবাহন সমেত, ফতেপুর শিক্রির—সন্নিকটে, বিভাগ নামক এক ক্ষুদ্র গ্রাম মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। এই বিভাগে মহারাজ মানসিংহের প্রতিষ্ঠিত এক দেবালয় ও মঠ ছিল। মঠের সেবায়েত এক শৈবসন্ন্যাসী মহারাজ। অম্বর সরকারেরই তিনি আশ্রিত। ফতেপুরশিক্রির রাজ-প্রাসাদ হইতে, এই বিভাগ মঠের দূরত্ব মাত্র দুই রশি।

বিভাগ—একটী পাহাড়বেষ্টিত স্থান। মেঘস্পর্শী ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি, স্থানটীকে পরম রমণীয় ও প্রাণারাম করিয়া তুলিয়াছে। পাহাড়ের নিভৃত বক্ষোদ্ভূত কয়েকটা কলনাদিনী ক্ষুদ্র গিরিতরঙ্গিনী, স্নিগ্ধ ও সুমিষ্ট সলিলধারা বুকে লইয়া, তাহাদের মৃদুকলনাদে দিনরাতই এই শান্তরসাস্পদ স্থানে একটী মধুময় সঙ্গীতধ্বনি জাগাইয়া তুলিতেছে। পার্শ্বস্থ অরণ্যরাজি, বন্যবরাহ, কৃষ্ণসার, নীলগাই প্রভৃতি শিকারের জন্তুতে পূর্ণ। প্রান্তর মধ্যে দলেদলে হরিণ ছুটিয়া বেড়াইতেছে, করভগণ শিখিসঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটী করিতেছে। চারু চন্দ্রকলাবণ্যবিকাশে, বিশ্ব-শিল্পীর সৌন্দর্য্যসৃষ্টির পরাকাষ্ঠার পরিচয় দিয়া, নর্ত্তননীল শিখিকুল এদিকে ওদিকে দৌড়িয়া বেড়াইতেছে—আর আকাশে সুনীল বারিদ-বিকাশ দেখিলেই, তাহারা কেকারবে দিক্‌বলয় মুখরিত করিতেছে।

চারিদিকের দশ ক্রোশব্যাপী পাহাড় কাটিয়া, আর একটী পাহাড়ের বিস্তৃত উপত্যকার মধ্যেই, আকবর শাহ তাঁহার নূতন রাজধানী ফতেপুর-শিক্রির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আগরার রক্তপ্রস্তরময় দুর্গমধ্যস্থ রাজ-প্রাসাদের অনুকরণে, ফতেপুরশিক্রির নবনির্ম্মিত প্রাসাদটী, আগাগোড়াই নির্ম্মিত হইয়াছিল। দেওয়ানী-খাস, দেওয়ানী-আম, খাস-মহল, রঙ্গ-মহল, হিরণ-মিনার, পচিশীর প্রস্তরময়-ছক্, আঁখ-মিচৌলী, পাঁচ-মহলের হাওয়া খানা, মিনা-মসজেদ, খোঁ-বাগ প্রভৃতি হর্ম্ম্যরাজি, এই নবনির্ম্মিত রাজপ্রাসাদের মধ্যে। আর এই মহলের এক পার্শ্বে ছিল, আকবরের অন্তরঙ্গ মিত্র মহারাজ বীরবল ও আবলফজলের এবং মানসিংহের প্রাসাদতুল্য বাসভবন। আর অদূরে ছিল, বিতাগের পূর্ব্বোক্ত জঙ্গল। এই জঙ্গলে স্বয়ং ভারতেশ্বর আকবরশাহ এবং তাঁহার বংশধরেরা, শিকারের আমোদ উপভোগের জন্য আসিতেন। এই জঙ্গল মধ্যে শিকারের উপযোগী চিড়িয়া ও জানোয়ার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। শিকারব্যসনপরায়ণ পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহগণ, বাদসাহের অনুমতি ভিন্ন, বিতাগের এই জঙ্গলে শিকার করিতে আসিতে পারিতেন না।

কোনও এক গভীর উদ্দেশ্য চালিত হইয়া, মানসিংহ পূর্ণিমাকে বিতাগের দেবনিবাসে পাঠাইয়াছিলেন। সে উদ্দেশ্য পরে প্রকাশ পাইবে।

বিতাগে আসিবার কয়েকদিন পরে, রূপসী পূর্ণিমা, চারণীর বেশ ধারণ করিল। এই নববেশে তাহার রূপপ্রভা নারীসৌন্দর্য্যের আর একটী নূতন দৃশ্যের বিকাশ করিল। পূর্ণিমার পরিধানে চম্পকবর্ণ গৈরিকবসন, কপালে রক্তচন্দনরেখা, কণ্ঠে, মণিবন্ধে, বাহুপ্রকোষ্ঠে, রক্তচন্দনচর্চ্চিত অক্ষমালা, আর দক্ষিণ হস্তে সিন্দুরপ্রলেপময় ত্রিশূল। এই কল্পিত চারণী

মূর্ত্তি ধরিয়া, মানসিংহের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, পূর্ণিমা বিতাগের দেবমন্দির পার্শ্বস্থ জঙ্গল মধ্যে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল।

বিধিসৃষ্ট ঘটনাচক্রচালিত হইয়া ঠিক এই সময়ে, একদিন শাহজাদা খসরুর হরিণ শিকারের সখ জাগিয়া উঠিল। বিতাগের জঙ্গলে, শিকারের কথা শুনিয়া, পিয়ারাবানুও বাহানা ধরিল, সে শাহজাদার হরিণশিকার দেখিতে যাইবে। অন্তঃপুরচারিণী বেগমগণকে সঙ্গে লইয়া শিকারে গমনপ্রথা মোগল-সম্রাট ও তাঁহার বংশধরগণের পক্ষে অবশ্য নূতন ব্যবস্থা নয়। সুতরাং খসরু পিয়ারাবানুর এ প্রস্তাবে কোনরূপ আপত্তি করিতে পারিলেন না।

তবে এই শিকারাভিযানে বেশী লোকজন রহিল না। পুরুষের মধ্যে কেবলমাত্র যুবরাজ খসরু, আর তাঁহার শিকার কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য, চারিজন শিকারী। নারীগণের মধ্যে—শাহজাদী বেগম পিয়ারাবানু আর তাঁহার প্রধানা সঙ্গিনী আমিরা, আর দুই চারিজন তাতারী শরীররক্ষী।

বিতাগের মঠ ও ফতেপুরশিক্রির রাজপ্রাসাদের ঠিক মধ্যস্থলেই "হিরণ মিনার।" জনরব এই সম্রাটশ্রেষ্ঠ—আকবরশাহ তাঁহার প্রিয় শিকারী হস্তীটির মৃতদেহ এই স্থানে প্রোথিত করিয়া,করিরাজের স্মৃতিস্তম্ভরূপে সেই সমাধিস্থানের উপর এই মিনারটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। আবার অন্যমতে, এই স্থানে কৃষ্ণসার হরিণের প্রাচুর্য্য দেখিয়া,শিকারপ্রিয় আকবর এই হিরণ বা হরিণমিনার নির্ম্মাণ করেন। এই মিনারের উপরিভাগে, রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত একটী শিকারমঞ্চও নির্ম্মিত হয়। বাদশাহ, এই মঞ্চোপরি বসিয়া সুদূর জঙ্গল হইতে শিকারীগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত এবং নিকটস্থ উন্মুক্তক্ষেত্রে

সমাগত কৃষ্ণসারাদির উপর অব্যর্থ লক্ষ্যে গুলি চালাইতেন। এই মিনার এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া, অতীতের স্মৃতি সাধারণের মনে জাগাইয়া রাখিয়াছে।

খসরু যে সময়ে বিতাগ-জঙ্গলের অন্যদিকে শিকারে উন্মত্ত, সেই সময়ে পিয়ারাবানু তাহার প্রিয়সঙ্গিনী আমিরাকে লইয়া শিকারস্থান হইতে কিছু দূরবর্ত্তী এক নির্জ্জন গিরিনির্ঝরিণীকূলে, প্রশস্ত এক শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া গল্প করিতেছেন। সম্পূর্ণ নির্জ্জন বনপ্রদেশ। সেখানে আর কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই। সেই শ্রেণীবদ্ধ পাষাণস্তূপের পার্শ্বেই একটী ক্ষুদ্র গিরি নদী কলকল তানে বহিয়া যাইতেছে। এই অনতিগভীর নদীগর্ভ ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য শৈবালময় উপলখণ্ডে পূর্ণ। এজন্য অতি সহজেই সেই নদীর হাঁটুজল পার হইয়া, অপর পারে যাওয়া যায়। শিক্রিপ্রাসাদের পার্শ্ব দিয়াই এই গিরি নদী বহিয়া যাইতেছে। কঠোর রাজবিধান লঙ্ঘন ভয়ে, কেহই এই ক্ষুদ্র নদী উত্তীর্ণ হইয়া, অপর দিক হইতে এখানে আসিতে সাহস করে না। এমন কি বন-জঙ্গলবিহারী কাঠুরিয়াগণও নয়।

যৌবনের খেয়ালবশে পিয়ারাবানু বনমধ্য হইতে কতকগুলি বনকুসুম সংগ্রহ করিয়া, একটী ক্ষুদ্র সাজি পূর্ণ করিয়াছিল। মালা গাঁথিবার জন্য সে যেন প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে। কেননা—এই ক্ষুদ্র সাজির মধ্যে, মালা গাঁথিবার সমস্ত উপকরণই সংগৃহীত ছিল। যত্নে সংগৃহীত এই বনকুসুমরাশির অনেকগুলি বড়ই মধুগন্ধী। আবার কতকগুলির বর্ণগৌরব যথেষ্ট। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, যাহা থাকিলে ফুলের গৌরব, সবই সেই সযত্নে চয়িত ফুলগুলির মধ্যে ছিল।

পিয়ারা সেই ফুলগুলি, নদীপার্শ্বস্থিত এক ক্ষুদ্র পাষাণের বুকে
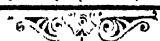
ছড়াইয়া ফেলিয়া সাজির মধ্য হইতে রঙ্গিন সুতা বাহির করিয়া, মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিল।

আমিরা বলিল—"বনফুলের মালা গাঁথিবার জন্য এত কষ্ট করিবার প্রয়োজন কি শাহজাদী বেগম? এ ছাইপাঁশ গন্ধহীন ফুলের মালার আদর করিবে কে বল দেখি?"

পিয়ারা সহাস্যে বলিল—"আমি আমার প্রাণের দেবতার জন্য মালা গাঁথিতেছি। দেবতারা কি ফুলের গন্ধ বিচার করিয়া ভক্তের প্রদত্ত মালা গ্রহণ করেন? আমার এই দেবতাটি এত করুণাময়, এত ঠাণ্ডা, যে তাহাকে যাহা কিছু উপহার দিই, তাই তিনি হাসি মুখে নেন্।"

আমিরা বলিল—"ঠাণ্ডা কেমন? মনিসার মজাটা একবার দেখ। তিনি হিরণমিনারে চড়িয়া নিরীহ হরিণের বুকে তীর চালাইতেছেন, আর তুমি এখানে বসিয়া তাঁর জন্য মালা গাঁথিতেছ। পুরুষগুলা নারীকে এমনি ভাবে অগ্রাহ্য করে, তবুও এই অপদার্থ নারীজাতির একটুও চেতনা হয় না।"

পিয়ারা অপাঙ্গ প্রসারিত করিয়া আমিরার দিকে চাহিয়া, কৃত্রিম কোপের সহিত বলিল—"বটে। ভারি ত সমজ্দার তুই! এই পুরুষ না হলে নারীর যে একদণ্ড চলিত না। পুরুষের মহত্ত্ব নারীর চেয়ে ঢের বেশী। যখন এই পুরুষ নারীর সুখের জন্য তাহার সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দেয়, নারীর রূপ তার ধ্যানের জিনিস করে, নারীকে মূর্ত্তিমতী দেবীর মত পূজা করে, তখন ত তুই পুরুষের গুণ দেখিতে পাস্ না? পুরুষ যে কি পরশ-রতন, তা তুই বুঝিবি কিরূপে আমিরা? তুই পোড়ারমুখী ত ভাল বাসিতে

শিখিলি না। তোদের কাশ্গার দেশে বোধ হয় একটীও প্রেমিক পুরুষ নাই? তা না হলে তোর এই দশা!"

আমিরা একটু উপেক্ষার সহিত বলিল—"তা তুমি যাই বল বেগম সাহেবা! আমি ভাবি পুরুষ জাত্টাই অতি স্বার্থপর। তারা নারীর কদর বুঝে না।"

আমিরা, পিয়ারির প্রিয়তমা সহচরী। বাল্যসঙ্গিনী ও ভদ্র কুলোদ্ভবা। সে তাহার পিত্রালয়ের বাঁদী। উভয়ের মধ্যে এই ভাবের বাধা সংকোচ হীন রহস্য প্রায়ই চলিত।

এমন সময়ে আমিরার দৃষ্টি সহসা নদীর অপর পারে পড়িল। আমিরা সবিস্ময়ে দেখিল, গৈরিকধারিণী এক পরমাসুন্দরী যুবতী সেই গিরিনদীর অপর পারে এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া, একদৃষ্টে তাহাদের দুজনের দিকে চাহিয়া আছে।

আমিরা, পিয়ারার দক্ষিণ হস্তটী মৃদুভাবে পীড়ন করিয়া বলিল—"মালা গাথা এখন রাখিয়া দাও। নদীর ওপারে যে একখানা জ্বলন্ত বিদ্যুৎ দাড়াইয়া আছে—ভাল করিয়া একবার দেখ দেখি ও কে?"

পিয়ারা দেখিল—সত্যসত্যই নদীর পরপারে, এক শাখাপ্রশাখা সমন্বিত শ্যামচ্ছায়াময়, বিটপীপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, অনিন্দ্যসুন্দরী এক চারণী-মূর্ত্তি। সে যেন তাঁহার রূপের প্রভায়, সেই স্থানটা আলো করিয়া আছে! অত রূপ কি মানুষের হইতে পারে?

পিয়ারা বিস্ময়োৎফুল্লচিত্তে বলিল—"তাই ত ব্যাপার কি আমিরা?"

আমিরা মাথা নাড়িয়া বলিল—"হয় ত কোন হিন্দু ভৈরবী। এই নদীর পরপারে মহারাজ মানসিংহের এক মঠ আছে শুনেছ তো? শুনিয়াছি,

সেখানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আসে, ভৈরবীযোগিনী দেওয়ানাও আসে। তাহারা—হাত গুণিয়া ভূত ভবিষ্যতের কথাও নাকি বলিতে পারে। একথাও শুনিয়াছি, দাওয়াই দিয়া লোকের দুঃসাধ্য রোগও আরাম করে।"

পিয়ারা আমিরার এই মন্তব্য সমর্থন করিয়া বলিল—"সত্যই ভাই। আমিও এ কথা শুনিয়াছি। বাবা বলিয়াছিলেন—এক হিন্দুসন্ন্যাসী তাঁহার হাতগুণিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন তিনি দিল্লীরবাদশার সেনাপতি হইবেন। কথাটা অক্ষরেঅক্ষরে ফলিয়াও গিয়াছে ত ভাই! তা তুই না হয়, ওঁকে আমার নাম করিয়া এখানে একবার ডাকিয়া আন্। বলিস্—শাহজাদী বেগম ডাকিতেছেন।"

আমিরা একথা শুনিয়া একটু নিরাশভাবে বলিল—"তাও কি হয়? ওঁরা হচ্ছেন, সংসার বিরাগী। খোদার সেবক। ওঁরা কি বাদশা আমীরকে গ্রাহ্য করেন? হরিদাস স্বামিজীকে, আর আগরার সেই নিরাহারী সাঁইজীকে,আগরার প্রাসাদে নিয়ে আসবার জন্য আকবর বাদ্‌শা কতই না চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা কি সফল হয়েছিল?"

পিয়ারা মনে মনে কি ভাবিল। তারপর উৎসুকভাবে বলিল—"চল্ বহিন্! আমরাই না হয় ওপারে যাই। এই ত এতটুকু ক্ষুদ্র নদী!"

আমিরা বিস্মিতভাবে বলিল—"ওমা! সেকি? তুমি না আকবর বাদ্‌শার পৌত্রবধূ! যদি এই কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহাহইলে লোকে বলিবে কি? সম্রাটইবা কি মনে করিবেন? আর আসিবার সময়, শাহজাদাকে তুমি বলিয়া আসিয়াছ, যে নদীতীরে আমরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিব। আমাদের খুঁজিতে খুঁজিতে, শাহজাদা

যদি এখানে আসিয়া পড়েন, তাহাহইলে কি হইবে শাহজাদী বেগম? মাঝখান হইতে আমি গরীব বেচারাই মারা যাইব!"

অদৃষ্ট, সর্ব্বদাই নূতন পথ রচনা করিতেছে। আর ছলনাময়ী নিয়তি দেবী—সেই পথের পরিচালিকা। নিয়তিই প্রলোভিত করিয়া অদৃষ্টরচিত এই সুপথে বা বিপথে, নরনারীকে ভুলাইয়া লইয়া যায়। নদীর পরপারে, শাহজাদী বেগমের চারণী সাক্ষাৎকারে গমন, সু—কি কুপথ, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু তাহাহইলেও সর্ব্বজ্ঞানময়ী, প্রজ্ঞাময়ী নিয়তি, পিয়ারা-বেগমকে সেই পথে আকর্ষিত করিল! হায়! সরলা পিয়ারা যদি এরূপ একটা নির্ব্বন্ধ প্রকাশ না করিত, ত ভালই হইত। কিন্তু সে শক্তি তাহার ছিল না। এরূপ একটা প্রজ্ঞা তাহার মত দুর্ব্বলহৃদয়া নারীতে সম্ভবপর নয়। কাজেই সে তাহার নিজের ইচ্ছায় প্রতিকূলতা করিতে পারিল না।

পিয়ারা বলিল—"শাহজাদা এখন শিকারের আমোদে উন্মত্ত। তিনি যে কখন ফিরিবেন, তাহারও স্থিরতা নাই। ধরিতে গেলে আমরাতো রাজপ্রাসাদের সীমার মধ্যেই আছি। শাহজাদার সঙ্গে কথাও ত ছিল—ইচ্ছা হইলেই আমরা প্রাসাদে ফিরিয়া যাইব। নদীর ওপারে গিয়া কাজ শেষ করিতে আমাদের কতই বা বিলম্ব হইবে? যদিই শাহজাদা আমাদের সন্ধানে এখানে আসিয়া পড়েন, আর এখানে না দেখিতে পান, তাহাহইলে হয় তো ভাবিবেন আমরা প্রাসাদে গিয়াছি। তাঁকে বুঝাইবার অনেক সাংঘাতিক উপায় যে আমার হাতে আমিরা!

আমিরা বলিল—"বলি সে উপায়টা কি একবার না হয় শুনি?"

পিয়ারা মৃদুভাবে আমিরার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল—"আ মর্!

পোড়ারমুখি! সব কথা বুঝেও যেন বুঝেন না। আমার এই ভাসাভাসা, কালোতারাওয়ালা সুরমারেখারঞ্জিত চোখদুটিতে বিদ্যুৎ হানিলে, তোর অত বড় বীর শাহজাদা ভয়ে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইবেন। আমার এই কোমল বাহুলতা ভুজঙ্গের মত তাঁহার কণ্ঠদেশে বেষ্টন করিয়া ফেলিলে তিনি মন্ত্রৌষধিরুদ্ধ ভুজঙ্গের মত হইয়া পড়িবেন। হতভাগিনী! তুই নারী হইয়া জন্মিয়াছিস কেন? পুরুষ ভুলাইবার মন্ত্র এখনও শিখিলি না?”

আমিরা মৃদুহাস্যের সহিত বলিল—“ওমা! তাই বল না কেন? দাসী বাঁদীমানুষ আমরা। আমরা কি অতশত রঙ্গবেরঙ্গের কথা জানি? তা—হাঁটিয়া নদীপার হইতে গেলে, তোমার দামী পেশোয়াজটা যে জলে ভিজিয়া নষ্ট হইবে?”

“হয় হইবে—তাতে তোর কি? তুই হচ্ছিস্ আমার বাঁদী। আমার হুকুম তামিল করাই হচ্চে তোর কাজ।” এই কথা—বলিয়া পিয়ারা আমিরাকে টানিয়া লইয়া নদীতীরে চলিল। আমিরাও পিয়ারার মনের সংকল্প বুঝিয়া, কোন বাধা দিতে সাহস করিল না। আর সেই ক্ষুদ্র গিরিনদী উত্তীর্ণ হইতে দুজনের বেশী একটা কষ্ট হইল না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পরপারে পৌছিয়া, উভয়েই সেই তরুতল লক্ষ্য করিয়া চলিল। সেই চারণীমূর্ত্তি তখনও সেই তরুতল আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বলা বাহুল্য—চারণী আর কেহই নহে, আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা—পূর্ণিমা।

মানসিংহের উপদেশেই, এই পিয়ারা হরিণীকে, কৌশলে ফাঁদে ফেলিবার জন্য, সে এইভাবে বাগুরাবিস্তার করিয়াছিল।

পিয়ারা ও আমিরা সেই চারণীর নিকটস্থ হইয়া, তাঁহাকে সম্মানপূর্ণ একটী সেলাম করিয়া বলিল—"কে তুমি মা?"

চারণী, এক শিলাখণ্ডের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া, গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ঐখানে বস। আমি একজন চারণী, তোমাদের কি প্রয়োজন?"

পিয়ারা আমীরার কাণে কাণে অস্ফুটস্বরে বলিল—"চারণী! তা ভালই হইয়াছে। আমার স্বামীর মুখে শুনিয়াছি—চারণীরা নাকি ভূত-ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ দেখিতে পান।"

চারণী, মৃদুহাস্যের সহিত বলিল—"কোথায় থাক তোমরা? বেশভূষা ও তোমাদের কমনীয়কান্তি আমায় বলিয়া দিতেছে, তোমরা সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভবা।"

পিয়ারা কোন কথাই বলিল না। আমিরা বলিল—"ইনি বাদশাহের পৌত্রবধূ। শাহজাদা খসরুর বেগম।"

চারণী। তা ইনি এখানে আসিয়াছেন কেন? আমার মত সন্ন্যাসিনীর কাছে এঁর কি প্রয়োজন?

পিয়ারা—এবার উপযুক্ত সুযোগ পাইয়া বলিল—"মা! আমার বিশ্বাস, আপনারা ভূত-ভবিষ্যৎ গণনা করিতে পারেন। আমার অদৃষ্টে কি আছে, আমার হাত দেখিয়া বলিতে পারেন কি? সেটা জানিতে বড়ই উৎসুক আমি!"

চারণী, পিয়ারাবেগমের মুখের দিকে চাহিয়া একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন—"তোমার হাতটী একবার দেখি বেগম!"

পিয়ারা তখনই বামহস্ত প্রসারিত করিয়া দিল। চারণীদেবী পিয়ারার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার অদৃষ্ট গণনায় আমার আপত্তি নাই। কিন্তু যাহা বলিব—তাহা যদি ভয়াবহ হয়, শোচনীয় হয়, তাহা শুনিবার সহিষ্ণুতা তোমার আছে কি? কোন সাংঘাতিক ব্যাপার শুনিলে আমার উপর রাগ করিবে না ত?"

কথাটা শুনিয়া, পিয়ারা মনোমধ্যে একটা প্রমাদ গণিল। সে ভাবিল—হয়ত এই চারণী এমন কোন কথা বলিয়া ফেলিবেন—যাহাতে চিরজন্মের মত তাহার চিত্তের শান্তি নষ্ট হইতে পারে! কিন্তু পিয়ারা চরিত্রের একটা বিশেষত্ব এই, সে যাহা ধরে, তাহা ছাড়ে না। সে যাহা করিব বলিয়া ভাবে, তাহাতে ভয় পাইয়া পিছাইয়া যায় না।

এজন্য পিয়ারাবেগম দৃঢ়স্বরে বলিল—"মা! যখন ভালমন্দ সব কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি, তখন ভয় করিলে চলিবে কেন? আমার বর্ত্তমান অবস্থা বড়ই সুখকর। খোদার মেহেরবানে নারীজন্মের শ্রেষ্ঠ সুখ আমি পাইয়াছি। তাহাহইলেও এই জীবনের বর্ত্তমান ও ভূত ভবিষ্যৎ আমার স্বামীর ভাগ্যের সহিত বিশেষভাবে জড়িত। তুমি যা বলিবে, তাহা যতই ভয়ানক হউক না কেন—আমি তিলমাত্র ভয় পাইব না।"

চারণী মৃদুহাস্যের সহিত বলিল—"মন্দই যে বলিতে হইবে, তার কোন মানে নাই। তোমার কর-কোষ্ঠী গণনায় যাহা জানিতে পারিব, তাহা যদি মন্দ হয়, তাহা শুনিতে তুমি প্রস্তুত কিনা—তজ্জন্যই তোমায় ঐ ভাবে প্রশ্ন করিয়াছিলাম।"

অনর্থক বাক্যব্যয় নিষ্ফল ও তাহার সময় অতি সংক্ষেপে, এজন্য পিয়ারীবানু, তাহার বাম হস্তখানি পুনরায় প্রসারিত করিয়া দিল। মোগলরাজ অন্তঃপুরে অনেক দেওয়ানা মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়। তাহাদের কাজ, বেগমমহলে বেগমদের হাত গুণিয়া, একটা পসার ও পয়সা রোজকার করা। এই দেওয়ানা সমাগম ঘটিলে রঙ্গমহলের রূপসীদের মধ্যে একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া যায়।

চারণী, তখনই পিয়ারার হাতখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, খানিকক্ষণ ধরিয়া খুব মনোযোগের সহিত দেখিয়া বলিল—"বেগমসাহেবা! তোমার উজ্জ্বল অদৃষ্টে রাজযোগ আছে। তুমি রাজরাজেশ্বরী হইবে। এ হিন্দুস্থানের সিংহাসন তোমার!"

পিয়ারা কথাটা শুনিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। চারণী মুখে একটা বিরক্তি ভাব আনিয়া বলিলেন—"হাসিলে যে বিবি!"

পিয়ারা। হাসিলাম, আপনার কথার ভঙ্গী দেখিয়া। আগে আমার শ্বশুর সুলতান সেলিম দিল্লীর রাজতক্তে বসুন, আমার শ্বশ্রুঠাকুরাণী রাজরাজেশ্বরী হউন, তারপর ত আমার পালা।

চারণী গম্ভীরমুখে বলিল—"না—তা নয় মা। তোমার করেরেখার বিচারে যাহা দেখিতেছি, তাহাতে তোমার স্বামীই হিন্দুস্থানের সম্রাট হইবেন। তোমার শ্বশুরের ভাগ্য বড়ই অন্ধকারময়। কিন্তু এই মস্নদ লাভের চেষ্টা তোমার স্বামীর নিজের আয়ত্তাধীন। তাঁহার এ চেষ্টা যদি চেষ্টার মত না হয়,তাহা হইলে শোচনীয় মৃত্যু তোমাদের সম্মুখে। তোমার স্বামী শাহজাদা খসরু যদি তাঁহার পিতার হাত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইতে না পারেন, তুমি যদি নিজের শক্তিতে তোমার স্বামীকে এই

কাজের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পার, তাহা হইলে তোমার অকালবৈধব্য অনিবার্য্য !"

এই ভয়ানক কথা শুনিয়া পিয়ারার চিরহাস্যোজ্জ্বল মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল। সে মনে ভাবিল—"হায় ! কেন নারীস্বভাবসুলভ চাঞ্চল্যবশে এখানে মরিতে আসিয়াছিলাম ? যাহা শুনিলাম তাহা যে অতি ভীষণ সমূহ অনিষ্টকর। ইহা না শোনাই যে আমার উচিত ছিল।"

পিয়ারা সহসা মুখ তুলিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে, সেই চারণীকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে মা ?"

চারণী গম্ভীরমুখে বলিল—"আমি চারণী—সন্ন্যাসিনী।"

পিয়ারা। তুমি থাক কোথায় মা ?

চারণী। তরুতলই আমার আশ্রয় স্থান। কখন যে কোথায় থাকি তাহার স্থিরতা নাই।

পিয়ারা। তুমি আমার সঙ্গে বাদশার রঙ্গমহলে যাইবে ?

চারণী। না মা—সেখানে যাইতে বড় ভয় করে।

পিয়ারা। কেন ?

চারণী। যেখানে সর্ব্বদাই ঐশ্বর্য্যের প্রকট লীলা, বিলাসিতার লাস্যভাব, সেখানে গেলে আমাদের ঈশ্বরচিন্তার ব্যাঘাত হয় !

পিয়ারা, তাহার কণ্ঠ হইতে বহুমূল্য একছড়া মতির মালা খুলিয়া চারণীকে দিতে গেল। কিন্তু চারণী তাহা লইল না। বরঞ্চ একটু বিরক্তির সহিত বলিল—"ওসব তুচ্ছ জিনিস লইয়া আমি কি করিব মা ! পুরস্কারের লোভে চারণীরা হাত গুণিতে অভ্যস্ত নয়। আবার বলিতেছি, তোমার ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকারময়। প্রবল চেষ্টা দ্বারা এ অন্ধকারকে দূর

করিতে হইবে। নারীর শক্তি বড়ই প্রবল। অতি পরাক্রান্ত শূরবীর যে, সেও নারীর শক্তির অধীন। চেষ্টা কর মা, দিল্লীর মসনদ তোমারই হইবে। যদি না হয় তাহা হইলে তোমার সমূহ সর্ব্বনাশ—তোমার স্বামীর অতিশোচনীয় অপমৃত্যু ঘটিবে। আর তোমার শ্বশুরই এই মৃত্যু ঘটাইবেন।"

পিয়ারা, এই সব ভয়ানক কথা শুনিয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। তাহার বুকের ভিতর যেন কেমন করিতে লাগিল। বামহস্তে মাথাটী রাখিয়া, সে নতমুখে কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। কিন্তু মুখ তুলিবার পরই দেখিল, সেই মায়াবিনী চারণী যেন মায়ামন্ত্রবলে সেই স্থান হইতে সহসা অদৃশ্য হইয়াছে।

আমিরা, বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে একদৃষ্টে শাহজাদী বেগমের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। সেও ততটা লক্ষ্য করে নাই, যে চারণী কখন সে স্থান ত্যাগ করিয়াছে।

তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে। পিয়ারা বলিল—"কি সর্ব্বনেশে কথা বলিয়া গেল ঐ সন্ন্যাসিনী! কি হইবে আমিরা?"

আমিরা বলিল—"চারণীদের সব কথা কি সত্য হয় শাহজাদী? বল যদি তো ঐ বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একবার দেখিয়া আসি, মাগীটা গেল কোন্ দিকে? ব্যাপার যে কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

পিয়ারা বলিল—"না—না, আর তার সন্ধানে গিয়া কাজ নাই। ওই সর্ব্বনাশী আমার হৃদয়ের সকল সুখশান্তি নষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছে। চল্ আমিরা! আমরা নদীর পরপারে যাই। বেলা পড়িয়া আসিতেছে।"

তখন দুইজনে আবার সেই উপলগর্ভ ক্ষুদ্র গিরিনদী পার হইয়া, সেই গিরিতরঙ্গিনীর অপর পারে আসিয়া পৌছিল।

ঠিক এই সময়ে শাহজাদা খসরু, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন— "কোথায় গিয়াছিলে পিয়ারেবানু? আমি যে তোমাকে চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।"

পিয়ারা মনে মনে বলিল—"কোথায় গিয়াছিলাম? ঠিক্ জানিনা আমি। হয়ত কোন শয়তানের রাজ্যে গিয়াছিলাম? প্রকাশ্যে বলিল— "তোমার বিলম্ব দেখিয়া আমরা ঐ পাহাড়ের উপর উঠিয়াছিলাম শাহ-জাদা। আর তুমি আমাকে চারিদিকে খুজিয়া বেড়াইতেছ দেখিয়া, একটা আনন্দ-উপভোগ করিতেছিলাম।"

খসরু একটু তিরস্কারপূর্ণস্বরে বলিলেন—"এ না হলে আর নারীর হৃদয়? ভাল তুমি যাহাতে সুখে থাক, তাহাই আমার সুখ। আমার যন্ত্রণা দিয়াও যদি তোমার আনন্দ হয়, তাহাই আমার আনন্দ। চল এখন আমরা প্রাসাদে ফিরিয়া যাই। এতক্ষণ পরিশ্রম করিলাম, কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য আমার, যে একটাও হরিণকে তীর বিদ্ধ করিতে পারিলাম না।"

পিয়ারা সহাস্যমুখে বলিল—"সেতো ভালই হইয়াছে। কেননা যাহার অভাবে তোমার মনোকষ্ট—তাহা না ঘটায় গরীব বেচারা হরিণগুলা বাচিয়া গিয়াছে। নির্ব্বাক পশুগুলি, তাহাদের নিজের স্বাধীনরাজ্যে মনের আনন্দে প্রকৃতির বুকে নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তচিত্তে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, তাহাদের শরাঘাতে বিদ্ধ করায় তোমাদের মত বীরপুরুষের যতটা আনন্দ—আমাদের মত দুর্ব্বলা নারীর পক্ষে ততটা নয়। তোমাদের কার্য্যদ্বারাই তোমরা আপনিই বুঝাইয়া দাও যে তোমরা অতি নিষ্ঠুর।"

এইরূপ শ্লেষময় রহস্যালাপে নিমগ্ন হইয়া, তিনজনে মৃদু পদাবিক্ষেপে

প্রাসাদের দিকে চলিলেন। এই কাননভূমি হইতে শিক্রিপ্রাসাদের দূরত্ব দুই চারি রশি মাত্র।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমটা ব্যর্থ হইয়াছে, একটীও শিকার মেলে নাই, এই চিন্তাতে শিকারপ্রিয় খসরু সে দিন বড়ই বিষণ্ণচিত্ত। আর পিয়ারার মনেও ঠিক এই সময়ে আর এক ধরণের বিষণ্ণতা জাগিয়া উঠিয়াছিল। ভীষণ যন্ত্রণাময়ী দুশ্চিন্তার একখানা কালো মেঘ উঠিয়া, তাহার আনন্দোজ্জ্বল হৃদয়খানিকে ক্রমশঃ তমসাচ্ছন্ন করিয়া দিতেছিল। চারণী তাহাকে যাহা কিছু বলিয়াছিল, সে কথাগুলা তাহার মনে বড়ই জাঁকিয়া বসিয়া গিয়াছিল। এজন্য পিয়ারা বড়ই বিষণ্ণ।

পিয়ারাকে বিষন্নবদন দেখিয়া খসরু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ তোমার সদাপ্রফুল্ল সরস মুখখানি অত মলিন কেন পেয়ারে?"

পিয়ারা সেই মলিন আস্তে তখনই একটু মধুর হাসি আনিয়া বলিল, "তোমার এই নিষ্ফল শিকারের ফ্যাসাদে সমস্ত দিনটা জঙ্গলের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। সূর্য্যতাপ যাহা করিতে পারে নাই, তোমার সারাদিনের অদর্শনজনিত বিরহতাপ, আমার মুখখানি তার চেয়ে মলিন করিয়া দিয়াছে।"

সময় কাহারও হাত ধরা নয়। দিন তো অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। তারপর সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হইয়া গেল। ক্লান্ত খসরু, যথাসময়ে শয্যা আশ্রয় করিলেন। পিয়ারাও তাঁহার পার্শ্বের শয্যা অধিকার করিল। ক্লান্তিবশে খসরু নিদ্রিত হইলেন। কিন্তু মখমলমণ্ডিত সুকোমলশয্যায় শয়ন করিয়াও পিয়ারার নিদ্রা আসিল না। খসরু তাহার পার্শ্বে অঘোরে ঘুমাইতেছেন। কিন্তু পিয়ারার পক্ষে সেই ইস্তাম্বুলসুবাসভরা সুকোমল সুখশয্যা
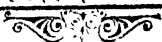
যেন অগ্নিকণাময় বলিয়া বোধ হইল। মধ্যরাত্রে পিয়ারাবানু শয্যা ত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত বাতায়নপথে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন রাত্রির দ্বিতীয় যাম উত্তীর্ণ হইয়াছে।

পিয়ারা দেখিল, প্রকৃতি ধীরে ধীরে রণরঙ্গিনীমূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন। তাহার সুনির্ম্মল হৃদয়ে যেমন চিন্তামেঘের সঞ্চার হইয়াছে, প্রকৃতির বক্ষেও সেইরূপ জলভরা কালোমেঘের কৃষ্ণচ্ছায়া পড়িয়াছে। সুনীল তারকাখচিত নীলাম্বরের কয়েক স্থানে খুব কালো এবং জলভরা মেঘগুলি তাণ্ডব নৃত্যে নিমগ্ন। আর সেই মেঘের অন্ধকারের সঙ্গে একটু জোর হাওয়াও উঠিয়াছে। বৃষ্টি আসিল বলিয়া।

পিয়ারা মনে মনে সেই মেঘাচ্ছন্ন লুপ্তনীলিমা অম্বরের দিকে আর বিকট তমসাচ্ছন্না প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, অস্ফুটস্বরে আপনা আপনি বলিয়া উঠিল—"তাকি হয় না? চারণী যে ভবিষ্যৎবাণী করিল—তাকি সম্ভব হইতে পারে না? এ জগতে অসম্ভব বলিয়া তো কিছুই নাই। মোগল রাজসংসারে, সম্ভবাতীত ব্যাপারও ত অনেক ঘটিয়া থাকে। মানুষের মত মানুষের চেষ্টায় না হইতে পারে কি? খোদা! আমার মনের মধ্যে যে আকুল বাসনা, চঞ্চল আশা জাগাইয়া দিয়াছ, তাহা কি পূর্ণ করিবে না? নারী আমি—সামান্য শক্তি আমার। আমার এই ক্ষীণ শক্তিকে প্রবলভাবে জাগরিত করিয়া দিতে তুমিই কেবল পার খোদা।"

সেই অন্ধকারময় আকাশের বুকে সহসা বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। ভীমনাদে ইরম্মদ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। পেলব করপল্লব দ্বারা চক্ষুরাবরণ করিয়া পিয়ারা বেগম কম্পিতপ্রাণে, চঞ্চলহৃদয়ে, তাহার কক্ষমধ্যে ফিরিয়া আসিল। সেই বজ্রধ্বনি, সেই অন্ধকারময় আকাশবক্ষে প্রদীপ্ত

বিদ্যুৎস্ফুরণ, তাহার প্রাণে একটা ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত করিল। পিয়ারা, তথনই ত্বরিতপদে শয্যায় আসিয়া খসরুকে আলিঙ্গন নিপীড়িত করিয়া, আতঙ্কের সেই প্রখর বেগটা সামলাইয়া লইল। তারপর নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। সে নিদ্রা—ভীষণ স্বপ্নময়!

আর ঠিক এই সময়ে, এই বজ্রবিদ্যুৎঝঞ্ঝাময়ী কৃষ্ণবসনা নিশীথে, অম্বর রাজপ্রাসাদের নিভৃত কক্ষে বসিয়া, মহারাজ মানসিংহ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তাহার চিন্তার বিষয়টি কি, একবার আমাদের দেখিতে হইবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চারিদিকে মুষলধারে বৃষ্টিপতনের শব্দ। উন্মাদ ঝঞ্ঝার, হৃদয়স্তম্ভনকারী চীৎকার। পুঞ্জীকৃত কৃষ্ণকায় মেঘমালার বুকে, উন্মাদিনী চঞ্চলার তাণ্ডব নৃত্যের ভীষণ অভিনয়।

ঠিক এই সময়ে অম্বরেশ্বর মানসিংহ, তাঁহার কক্ষমধ্যে চঞ্চলভাবে পদচারণা করিতেছেন। মর্ম্মরমণ্ডিত কক্ষের উন্মুক্ত বাতায়নপথে, জলকণাপূর্ণ প্রবল হাওয়া আসিতেছিল। আর সেই দমকা হাওয়ায়, কক্ষমধ্যস্থ অসংখ্য সুগন্ধ দীপরাশি, স্ফটিকাধার মধ্যে থাকিয়াও থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কোনটা বা নিভিবার মত হইতেছিল।

মানসিংহ বিরক্তির সহিত বাতায়ন বন্ধ করিয়া দিলেন। বাহিরের শব্দ ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারায়, ঝড়ের শন্‌সনানি অনেকটা কমিয়া আসিল। কিন্তু তাঁহার প্রাণের মধ্যে যে ভীম ঝঞ্ঝা উঠিয়াছিল, তাহার একটুও নিবৃত্তি হইল না। বোধ হয়—হইবারও উপায় নাই। কেননা—তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে, এক প্রজ্জ্বলিত রৌপ্যময় দীপাধারের নিম্নে, একখানি মোড়কহীন পত্র। আর এই খরিতাখানি পড়িয়াই, মহারাজের মনে একটা ভীষণ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সঙ্গে বাহিরের ঝঞ্ঝার মত, তাঁহার হৃদয়েও একটা মহা ঝড় উঠিতেছিল।

অম্বরেশ্বরের মুখমণ্ডল কঠোর রোষপ্রদীপ্ত। আয়ত নেত্রদ্বয়, অগ্নি-জ্বালাময়। এক একবার উত্তেজনাবশে তিনি তাঁহার কটিসংলগ্ন তরবারিকে অন্যমনস্ক ভাবে কোষবিমুক্ত করিতেছেন। আবার কি ভাবিয়া তাহা কোষনিবদ্ধ করিয়া, চঞ্চলভাবে কক্ষমধ্যে বিচরণ করিতেছেন। আর সেই চিঠিখানির দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্রই, তাঁহার মুখমণ্ডলে ক্রোধ, ঘৃণা ও একটা অদমনীয় বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে।

এই খরিতাখানি, ইলাহাবাদ হইতে আসিয়াছে। সম্রাটপুত্র সুলতান সেলিম এই পত্রের লেখক। যোধাবাই অম্বর ত্যাগ করিবার সাতদিন পরে অর্থাৎ সেইদিন মধ্যরাত্রে, এক মোগল-অশ্বারোহী মানসিংহের নিকট সেই পত্রখানি পৌঁছাইয়া দিয়া গিয়াছে।

পত্রখানির দিকে যখনই দৃষ্টি পড়িতেছে, সেই সঙ্গে অম্বরেশ্বরের মুখে একটা ঘৃণা ও বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইতেছে। বাতায়নপথপ্রবৃষ্ট, বায়ুপ্রবাহবিকম্পিত, চঞ্চল দীপশিখা যেন তাঁহার রুষ্ট দৃষ্টিতে ভয় পাইয়া আরও কাঁপিয়া উঠিতেছে!

পত্রে লেখা ছিল—

অম্বরেশ্বর! আপনি আমার অতি নিকট আত্মীয়। সে আত্মীয়তা, অবশ্য সাধারণ কার্য্যক্ষেত্রের অন্তরালে, অন্তঃপুরপ্রকোষ্ঠে ফুটিয়া উঠিতে পারে। কিন্তু যে কার্য্যের সহিত ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাটের স্বার্থসম্বন্ধ বিজড়িত রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আপনার স্বাধীন ব্যবহার কতটা ধৃষ্টতার পরিচয়, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবেন। আমার পত্নী ও পুত্র যে আমার অনুজ্ঞার অবাধ্য হইয়া উঠিতেছে—তাহার মূল কারণই আপনি। মোগলের দাসত্ব করা যাঁর ভাগ্যলিপি, হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ সম্রাটের আজ্ঞাপালন যাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য, তিনি যে এক এক সময়ে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে গিয়া পড়েন, তাহার এ অপরাধ সম্রাটের চক্ষে না হইলেও আমার চক্ষে অমার্জ্জনীয়। শাহজাদা খসরুকে এক ভিত্তিহীন অছিলায় অম্বরে আটকাইয়া রাখিবার, কোন অধিকারই আপনার নাই। আশা করি, এই পত্রখানি আপনার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিবে। আমার আদেশ পালনে আপনি তিলমাত্র বিলম্ব করিবেন না।—শাহজাদা সুলতান নূরমহম্মদ সেলিম।

মানসিংহ আবার সেই পত্রখানি পড়িলেন। তিনি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, হয়তো এই পত্রখানি জাল। সুলতান সেলিমের লেখা নহে। হয়তো তাঁহার দেখিতে ভুল হইয়াছে। কিন্তু তৃতীয়বার পত্রখানি পড়িবার পর, তাঁহার সে ভ্রম ভাঙ্গিল। তিনি দেখিলেন—স্বাক্ষর সেলিমের—পত্রের ভাষা সেলিমের—হস্তাক্ষরও সেলিমের। শীলমোহরের ছাপও তাঁহার।

মানসিংহের হৃদয়ে, পুনরায় দারুণ উত্তেজনা দেখা দিল। এই পত্রনিহিত অপমান বাক্যে তাঁহার প্রাণে যেন বিষ-বিশিখ বিদ্ধ হইল। সে প্রাণদাহী বিবের জ্বালার যেন তুলনা নাই। তাহাতে সমগ্র দেহ, মন, প্রাণ, অস্থিপঞ্জর, মর্ম্মস্থান পর্য্যন্ত যেন জ্বলিয়া যাইতেছে। জীবনে আর কখনও তিনি এ ভাবে অপমানিত হন নাই।

তখন বাহিরের ঝঞ্ঝা অনেকটা কমিয়াছে। প্রকৃতি রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি

ত্যাগ করিয়া, ক্রমশঃ শান্তভাব ধারণ করিতেছেন। বাহিরের শীতল বায়ুতে, উত্তেজিত মানসিংহ সামান্য একটু স্নিগ্ধতা অনুভব করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণের জ্বালা পূর্ব্বমতই রহিল।

তিনি দম্ভভরে মর্ম্মরমণ্ডিত হর্ম্ম্যতলে সজোরে পদাঘাত করিয়া বলিলেন,—"কি এত স্পর্দ্ধা! এত তেজ! মোগলের দাস মানসিংহ? হা ধৃষ্ট সেলিম! এই মানসিংহ না থাকিলে, আজ মোগল যে পাঠানের মত কালস্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইত! মহাপরাক্রান্ত এই দীন্-দুনিয়ার মালেক বাদশা আকবরশাহও যে কথা বলিতে সাহস করেন না, তুমি আমায় তাহাই বলিলে? এই যে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার পাঠান রাজত্ব সমূলে বিলুপ্ত হইল, তাহা কে করিল সেলিম? সিংহের মত শক্তিমান যে আফ্‌গান, দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য দুর্গবেষ্টিত যার মাতৃভূমি, তাহাকে বিধ্বস্ত করিয়া কাবুল দখল কে করিল সেলিম? নির্ম্মলাকাশের নিষ্কলঙ্ক শশীরূপে, মহীধরের ন্যায় দর্পভরে গৌরবদীপ্ত মস্তক তুলিয়া, একটা বিরাট মহাপ্রাণতা লইয়া, রাজপুতগৌরব রাণাপ্রতাপ, চিতোরের চারিদিকে যে প্রলয়ের দাবাগ্নি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে যে মোগলরাজত্ব সমূলে ক্ষয় হইত সেলিম! রাজপুতানার গৌরব, হিন্দুস্থানের গৌরব, হিন্দুর গৌরব, দাম্ভিকতা ও আত্মসম্মানের পূর্ণাবতার, সেই বীরকেশরী রাণাপ্রতাপকে কে ধ্বংশ করিল সেলিম? সত্য বটে, তুমি অসংখ্য মোগলসেনা লইয়া চিতোরের সর্ব্বনাশের জন্য সমরক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলে! কিন্তু কাজ কতটুকু করিয়াছিলে তুমি সেলিম! আর একদিন প্রাণের মহত্ব দেখাইয়া, নিজের স্বার্থ, সম্মান, রাজানুগ্রহ উপেক্ষা করিয়া, চিতোর জয়ের উদ্দীপ্ত গৌরবমণ্ডিত যশোমুকুট নিজের মাথা হইতে খুলিয়া, আত্মীয়

জ্ঞানে, কে তোমায় পরাইয়া দিয়াছিল সেলিম? হায়! এইরূপেই কি সেই মহত্ত্বের প্রতিদান করিতে হয়? আর একথাও কি তুমি একবার মনে ভাবিয়া দেখিলে না, যে মানসিংহ রাজপুতের চিরোন্নতশির অবনত করিয়া মোগলের দাসত্বস্বীকার করিয়াছে, যাহার বাহুবলে, কাবুল হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ আজ মোগলের করতলে—সেই মানসিংহ চেষ্টা করিলেই আবার এ সব অতল জলে ডুবাইতে পারে। কতটা বিদ্বেষ, কতটা ঘৃণা, কতটা প্রতিহিংসা, এই মানসিংহের হৃদয়ে তোমার কঠোর ব্যবহারে তুমি জাগাইয়া তুলিতেছ—তাহা আমি তোমায় শীঘ্রই বুঝিবার অবসর দিব।

এইরূপে অস্ফুটস্বরে মনোভাব প্রকাশের পরও, তাঁহার মনের যাতনা যেন পূর্ব্বমতই রহিল। মানসিংহ আবার দৃঢ় স্বরে বলিলেন—"কি ঘৃণা! কি লজ্জা! এ অপমান অসহ্য—অমার্জ্জনীয়। ভগ্নীর মুখ চাহিয়া তোমার উপেক্ষা, অনাদর, বিদ্রূপ অনেক সহিয়াছি। কিন্তু তোমার এই ধৃষ্টতাপূর্ণ লিপিখানি, আমার সহিষ্ণুতার সেই সুদৃঢ় বাঁধকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে। আমি নিশ্চয়ই তোমায় আমার আয়ত্তাধীন করিব। আজ হইতে তোমাকে প্রত্যেক কার্য্যে অপদস্থ করা, তোমার পিতা আকবরশাহের নিকটে তোমায় অতি অপদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করা, আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য করিয়া লইলাম। আমার স্নেহময় ভগ্নী যোধাবাই, যাহাতে সম্রাট-পত্নী না হইয়া, সম্রাট-জননী বলিয়া গৌরবলাভ করিতে পারে, আজ হইতে আমি তাহার চেষ্টাই করিব। হিন্দুস্থানের রত্নমণ্ডিত রাজমুকুট একদিন আমার ভাগিনেয় খসরুর শিরোদেশের শোভাবর্দ্ধন করিবে। আর এই খসরু আজীবন চলিবে—আমারই ইঙ্গিতে। আকবরশাহ, বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত,

রোগশোককাতর, দীর্ণহৃদয়। তাঁহার শক্তিশালী বাহুদ্বয় এখন শক্তিহীন, চিত্ত নিস্তেজ, বুদ্ধি বিকল, প্রজ্ঞা তিরোহিত, শৌর্য্য অস্তমিত। সাধ্য কি আকবরের—যে আমার কূটচক্রান্তজাল ভেদ করেন? তারপর মানসিংহের এই ক্ষুরধার তরবারি—যাহা তোমার পিতা কাবুলজয়ের পুরস্কার রূপে স্বহস্তে আমার কটিদেশে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন—সেই তরবারি কঠোর প্রয়োজন বুঝিলেই, তোমার হৃদয়ের শোণিত পান করিবে!"

একটা অসহ্য উত্তেজনাবশে শেষের কথাটা সহসা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি যেন দ্বারপার্শ্বে কাহারও মৃদু পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তখনই দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কেহই তথায় নাই। বুঝিলেন, এটা তাঁহার ভ্রান্তি বই আর কিছুই নয়। তিনি পুনরায় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

বাতায়নপথ উন্মুক্ত করিয়া মানসিংহ দেখিলেন—ঝড়ের বেগ অনেকটা শান্ত হইলেও, তাহার শন্‌শনানির শব্দটা তখনও একাবারে কমে নাই। কিয়ৎক্ষণ স্থিরচিত্তে কি একটা চিন্তা করায়, তাঁহার হৃদয় অনেকটা উত্তেজনাশূন্য হইল। কক্ষের আশে পাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া, তিনি এক মখমলমণ্ডিত আসনাধিকার করিলেন।

মানসিংহ অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"আমার আশা পূর্ণ হইবে না কি? এ দুনিয়ায়, ভগবানের নিম্নে, যদি কোন সৃষ্ট জীব শক্তিমান থাকে ত সে এই মানুষ! মানুষের শক্তিতে না হয় কি? সংসারের ঘটনাসংকুল কর্ম্মক্ষেত্রে, এই মানুষ কার্য্যগুণে কখনও দেবতা, কখনও বা শয়তান। সেলিমের সর্ব্বনাশের জন্য দেবত্ব বিসর্জ্জন দিয়া আমি শয়তান হইব। এই শান্তিময়ী ধরার বুকে মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি করিব। আমার এই শক্তিপূর্ণ দক্ষিণ

রাজু খসরুর মস্তকে রাজমুকুট বসাইয়া দিবে। যে সর্ব্ববিষয়ে যোগ্য—মোগলের অভিশপ্ত সিংহাসন তার! সেলিমের মধ্যে ভগবান যে সব উপাদান দিয়াছেন, তাহা ওজন করিয়া আর খসরুকে নাড়িয়া চাড়িয়া যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস—খসরুতে এমন অনেক শ্রেষ্ঠ শক্তি আছে যাহা চেষ্টা করিয়া পূর্ণতায় আনিতে পারিলে, সেলিমের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী! আমি সহোদরাকে বিধবা করিতে চাহি না, চাই তাহাকে রাজমাতা রূপে দেখিতে। মোগলের হাতে ভগ্নিসমর্পণ করিয়া অম্বররাজবংশ যে পাপ করিয়াছে, ইহাই তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। আর এই খসরু যদি আমার অবাধ্য হয়, তাহার মাতার বিপরীত শিক্ষায় অন্য পথে গিয়া দাঁড়ায়—তাহাহইলে তাহাকেও মার্জ্জনা করিব না।"

কথাটা শেষ না হইতে হইতে, কে যেন দ্বারপার্শ্ব হইতে বলিয়া উঠিল, "না—না মহারাজ-জী খোদা আপনাকে রক্ষা করুন! অতটা বোধ হয় আপনাকে অগ্রসর হইতে হইবে না"

মানসিংহ আসন ত্যাগ করিয়া চমকিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কে—এ আগন্তুক, যে তাঁহার কথাগুলির এইভাবে প্রতিধ্বনি করিল? মানসিংহের কটিদেশে রত্নখচিত এক শাণিত ছোরা ছিল। দৃঢ়মুষ্টিতে সেই ছোরা খানি ধরিয়া, দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া মানসিংহ বলিলেন, "কে তুই?"

সহসা এক আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত দীর্ঘকায় পুরুষ, মানসিংহের সম্মুখীন হইয়া বলিল—"আদাব! বৈবাহিক সাহেব!"

মানসিংহ তখনই এই আগন্তুককে চিনিলেন। তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত সোফায় তাঁহার পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, "খাঁ

সাহেব! আপনিই কি আমার এই সাংঘাতিক কথাগুলির প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন?”

সেই আগন্তুক সহাস্যে বলিলেন—“হাঁ আমিই! কিন্তু আপনার মত বীরপুরুষের আর অবস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে, এ ভাবের কথা বলিবার সময় অতটা অসাবধান হওয়া উচিত হয় নাই!”

মানসিংহ এ তীব্র তিরস্কারে বড়ই লজ্জিত হইলেন। নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, দীপাধারের নিম্নে রক্ষিত সেই পত্রখানি লইয়া আগন্তুকের হাতে দিয়া, অনুতপ্তচিত্তে বলিলেন—“উত্তেজনার এরূপ একটা সজীব কারণ বিদ্যমান থাকিতে আমি চঞ্চল হইয়া যে ভাবে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছি, তাহা কি খুব বেশী অপরাধ হইয়াছে খাঁ সাহেব!”

খাঁ সাহেব, আগ্রহ বশে পত্রখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—“তাইতো—সুলতান আজকাল বড়ই বাড়াইয়া তুলিতেছেন। এ পত্র খানি লিখিবার সময়, তাঁহার মনে ভাবা উচিত ছিল, যে সম্রাট আকবরশাহ এখনও জীবিত। আব আপনি সেই দিল্লীশ্বর আকবরশাহের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ।”

নিজের কর্ম্মদোষে মানসিংহ হাতেনাতে ধরা পড়িয়াছেন, এজন্য অনিচ্ছাসত্বেও সেই খরিতাখানি খাঁ সাহেবকে দেখাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ব্যাপারটা চাপা দিবার জন্য তিনি খাঁ সাহেবকে বলিলেন—“ব্যাপার কি খাঁ-খানান্? এই জল ঝড়ে, এ অবস্থায়—এত রাত্রে?”

খাঁ সাহেব গম্ভীরমুখে বলিলেন, “ব্যাপার বড় গুরুতর মহারাজ-জী?”

মানসিংহ। তাহাহইলে সম্রাটের পীড়া কি খুব বৃদ্ধি হইয়াছে?

খাঁ সাহেব। হইয়াছিল বটে, কিন্তু জাঁহাপনা এখন সাম্‌লাইয়া উঠিয়া-

ছেন। তবে আর একটা ভয়ানক দুঃসংবাদ সম্রাটের কাণে আসিয়া পৌছিয়াছে—যে অতিরিক্ত পানদোষে, শাহজাদা দানিয়ালের দাক্ষিণাত্যে অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। আপনি জানেন ত—সম্রাট এই দানিয়ালকে কতটা ভাল বাসিতেন ?

দানিয়ালের মৃত্যু সংবাদে, মানসিংহ একটু বিষণ্ণমুখে বলিলেন—"দেখিতেছি এ দুনিয়ায় যাহারা ভাল, একটু মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব লইয়া আসে, বিধাতা তাঁদের আগেই কোলে তুলিয়া লন্ ! এই দর্পিত সেলিমের সহিত তুলনায়, এই মহাপ্রাণ শাহজাদা, যে কত শ্রেষ্ঠ, ছিলেন, তাহা ত আপনার অবিদিত নাই—খাঁ সাহেব !"

খাঁ সাহেব মলিন মুখে বলিলেন—"ও সব কথা এখন থাক্। এর চেয়ে আর একটা সাংঘাতিক সংবাদ, আমি আপনার জন্য আনিয়াছি।"

মানসিংহ। আবার কি সংবাদ খাঁ সাহেব ?

খাঁ সাহেব, মানসিংহের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া অতি অস্ফুটস্বরে কি একটা কথা বলিলেন। মানসিংহ শিহরিয়া উঠিয়া, গম্ভীরমুখে বলিলেন—"কি সর্ব্বনেশে ব্যাপার ! সত্য না কি ?"

খাঁ সাহেব বলিলেন—"তাহা না হইলে এই ভীষণ ঝটিকাময়ী রাত্রে, এতটা কষ্ট স্বীকার করিয়া, বিনা শরীর-রক্ষী সহায়ে—অশ্বারোহণে ফতেপুর শিক্রি হইতে এই দীর্ঘ পথ আসিব কেন ?"

মানসিংহ। সম্রাট কি এখনও ফতেপুরের প্রাসাদে ?

খাঁ সাহেব। না—আমার এখানে আসিবার পূর্ব্বেই তিনি আগরায় চলিয়া গিয়াছেন !

মানসিংহ। খসরুও কি তাঁর সঙ্গে আগরায় গিয়াছে ?

খাঁ সাহেব। না—খসরু ফতেপুর প্রাসাদেই আছে !

মানসিংহ—খাঁ সাহেবকে সঙ্গে করিয়া, পার্শ্বস্থ কক্ষে গেলেন। ভৃত্য-বর্গকে জাগাইয়া, তাঁহার বেশ পরিবর্ত্তন ও খানা-পিনার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। খাঁ সাহেব যতক্ষণ আহারাদি করিতেছিলেন—ততক্ষণ মানসিংহ কোন কথাই কহেন নাই।

খাঁ সাহেবই প্রথমে মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন—"তাহাহইলে এখন কর্ত্তব্য কি মহারাজ ?"

মানসিংহ বলিলেন—"রজনী তৃতীয় যামে আসিয়াছে। দেখিতেছি আমাদের দুজনেরই বিশ্রামের প্রয়োজন। কাল প্রভাতে যথাকর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে।"

খাঁ সাহেবকে এক শয়নকক্ষে পৌছাইয়া দিয়া, ভৃত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, মানসিংহ শিষ্টাচার দেখাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এতক্ষণ এই খাঁ সাহেবের কোন পরিচয় দেওয়া হয় নাই। ইনি একজন পাঁচ-হাজারী মন্‌সব্‌দার। সম্রাটের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। শাহজাদা খসরুর শ্বশুর, পেয়ারেবানুর পিতা, আর এই সম্পর্কে মান-সিংহের বৈবাহিক।

ইতিহাসে ইনি খাঁ আজিজ বা আজিম খাঁ নামে পরিচিত। ইহার ন্যায় সমরকুশল, কুটচক্রী, মহাবীর মোগল-ওমরাহ, তখন আগরায় দুই চারিজন মাত্র ছিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ইলাহাবাদ দুর্গের এক নিভৃত কক্ষে বসিয়া, সুলতান সেলিম, গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। বোধ হয়, তিনি এ চিন্তাসাগরের কোন কুলকিনারা পাইতেছিলেন না। কারণ যতই সময় বহিয়া যাইতেছিল, ততই যেন তাঁহার মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাইতেছিল।

নিম্নেই গঙ্গাযমুনাসঙ্গম। জাহ্নবী-যমুনার মিশ্রিতপ্লাবনের গম্ভীর তরঙ্গ-নিনাদে, বোধ হয় তাঁহার চিন্তাস্রোত, মধ্যে মধ্যে বিপরীত পথগামী হইতেছিল। আর তার জন্য মুখে একটা বিরক্তির ভাব প্রকটিত হইতেছিল।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। সেই বিমল চন্দ্রকিরণে, জাহ্নবী-যমুনা হাসিতেছে। সেই কল্লোলময়ী প্রবল স্রোতমুখে, সাদা ও কালো সলিল প্রবাহের উপর, চঞ্চল চন্দ্রকিরণ পড়িয়া, যেন শতসহস্র হীরকখণ্ডের মত প্রতীয়মান হইতেছিল। এইজন্য নদীবক্ষে সেদিন অফুরন্ত শোভা। চাঁদের জ্যোতিতে ধরা হাসিতেছে। কুলায়মধ্যে প্রভাতভ্রমে জাগরিত, বিহগের করুণ স্বর, নিস্তব্ধ দিগন্তের বুকে ছড়াইয়া পড়িয়া, পঞ্চমের প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিতেছে। সেদিন এতটা সৌন্দর্য্যভরা এই নিসর্গ সুন্দরী। সুলতান সেলিম, সুন্দরী প্রকৃতির এই ভুবনমনমোহিনী শোভা দেখিয়াও প্রাণে একটু আনন্দ পাইতেছেন না।

সেলিম বিরক্তির সহিত, আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া হাঁকিলেন—"গোলাম।"

তখনই একজন তাতারী—তাঁহার সম্মুখীন হইয়া একটী কুর্ণীশ করিয়া বলিল—"জনাব! মেহেরবান্।"

সেলিম গোলামকে বলিলেন—ইস্কান্দারী বিবিকে সেলাম দে। আর তার সঙ্গে সাকিকে পাঠাইয়া দে।"

কিয়ৎক্ষণ পরে, সাকি—স্বর্ণময় ভৃঙ্গারে সুবাসিত সেরাজী আনিল। তাহার পশ্চাতেই ইস্কান্দারী বিবি। ইস্কান্দারী সুগায়িকা, নৃত্যকলা-পটীয়সী, চতুরা, রসিকা, আর চিত্তের অবসাদ সময়ে সেলিমের প্রিয় সঙ্গিনী। সুলতানের চিত্তরঞ্জনের জন্য সে সম্প্রতি আগরার রঙ্গমহল হইতে ইলাহাবাদে আনীতা হইয়াছে।

সম্রাটপুত্রের সন্নিকটস্থ হইয়া দুইহাত তুলিয়া, মাথা নীচু করিয়া, ইস্কান্দারী একটা তস্‌লীম বাজাইয়া বলিল—"জাঁহাপনা কি এ বাঁদীকে স্মরণ করিয়াছেন? মেজাজ সরীফ্?"

একটা মলিন হাস্যের সহিত সেলিম বলিলেন—"সত্যই আজ আমার মেজাজ বড় বিগড়াইয়াছে। আর চিকিৎসার জন্য তোমায় ডাকিয়াছি।"

চতুরা ইস্কান্দারী, তখনই সাকীর নিকট হইতে স্বর্ণখচিত সেরাজীপাত্র লইয়া, এক স্বর্ণময় ক্ষুদ্র পানপাত্রে মদিরা ঢালিল। তারপর সেই গুলাব-গন্ধ, রক্তাম্বুদতুল্য সেরাজী লইয়া সেলিমের সম্মুখে ধরিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে পানপাত্র শেষ করিয়া, সেলিম সহাস্যমুখে বলিলেন—"পার্শ্বের কক্ষে তোমার বীণ্‌টা পড়িয়া কাঁদিতেছে। সেটা একবার লইয়া আইস পেয়ারে মেরে! একটা গান শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে।"

হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ সম্রাটের হুকুম। ইস্কান্দারী, তখনই পূর্ব্বোক্ত কক্ষ হইতে বীণ্‌টা আনিয়া—সুলতানের ইঙ্গিতে তাহার সম্মুখের আসনে বসিল। তাম্বূলরসরঞ্জিত অধরে, হাসির লহর ছুটাইয়া বলিল—"কোন্ গানটা গাহিব জনাবালি! ফরমায়েস করুন।"

সুলতান হাস্যমুখে বলিলেন—"তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই গাও। আমার মতে ফরমায়েস্‌টা যেন একটা গুলানির ব্যাপার।"

ইস্কান্দারী তখনই সেই সুরবাঁধা বীণার সুরে, কণ্ঠ মিশাইয়া গান ধরিল—

"ন ছোড়ো হমে দিল্ দুখায়ে হুঁয়ে হৈ"

সঙ্গীতের প্রথম ছত্রটী শেষ না হইতে হইতেই, একজন তাতারী কক্ষমধ্যে আসিয়া সংবাদ দিল—শাহজাদী শাহী-বেগম জাঁহাপনাকে সেলাম জানাইয়াছেন। যোধাবাই রঙ্গমহলে শাহী-বেগম বলিয়াও পরিচিতা ছিলেন। এ আদরের ও সম্মানের নাম সুলতান সেলিমের নিজের প্রদত্ত।

সেলিম তখনই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"শাহী বেগম? যোধাবাই? এতরাত্রে অম্বর হইতে আসিলেন কেন?"

সেলিম তখনই হস্তেঙ্গিতে ইস্কান্দারীকে সেই স্থান ত্যাগ করিতে বলিলেন। অসমাপ্ত গীতের একটী অংশ—বায়ুস্তরে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মিলাইয়া, তখনই লোপ প্রাপ্ত হইল। ক্ষুণ্ণমনে ইস্কান্দারী বীণটী হাতে লইয়া তাহার নিজের কক্ষে চলিয়া গেল।

ইহার পরমূহুর্ত্তেই যোধাবাই বা শাহী-বেগম সেই কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইয়া, সম্মানপূর্ণভাবে, একটী কুর্ণীশ করিয়া বলিলেন—"সুলতান! তুমি কেমন আছ?"

সেলিম যোধার হাতখানি ধরিয়া, তাঁহার পার্শ্বে বসাইয়া, একটু বিদ্রুপের সহিত বলিলেন—"তুমি যেমন রাখিয়া গিয়াছ, তেমনিই আছি। কিন্তু আশা করি নাই, যে মানসিংহ আমার দ্বিতীয় পত্র পাইয়াও তোমায় এত বিলম্বে এখানে পাঠাইয়া দিবে।"

যোধা। তুমি কি আবার তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলে? সে পত্রে কি লিখিয়াছ?

সেলিম। তাহাতে পিতৃত্বের ও স্বামীত্বের একটা খুব কঠোর দাবির কথাই আছে! সে পত্র তুমি দেখ নাই কি?

যোধা। কই না—আমার চলিয়া আসিবার পর হয়তো তোমার সে পত্র অম্বরে পৌছিয়াছিল।

সেলিম। ভাল—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এত শীঘ্র যে তোমাদের রাজপুতের রাগ কমিয়া গেল?

যোধা। মোগল তোমরা! রাজপুতের সঙ্গে এত মিশিয়াও তাহাদের ভালরূপে চিনিতে পার নাই এই বড় দুঃখ! স্নেহ, মায়া, কর্ত্তব্য, আর নারীর স্বামীসেবা বলিয়া যদি কিছু না থাকিত, পত্নীর ও মাতার কর্ত্তব্য বলিয়া যদি কিছু এ দুনিয়ায় না থাকিত, তাহাহইলে বোধ হয় রাজপুতের রাগ এত শীঘ্র কমিয়া যাইত না।”

সেলিম। অতীতের কথা ছাড়িয়া দাও শাহী! যাহা বলিয়া ফেলিয়াছি তার জন্য আমি যদি তোমার কাছে অপরাধী হইয়া থাকি, তোমায় কোন মর্ম্মব্যথা দিয়া থাকি, তাহাও ভুলিয়া যাও। আমার বর্ত্তমান বড়ই অন্ধকারময়! ভবিষ্যৎ—তার চেয়েও বেশী! কিন্তু তুমি একা আসিলে কেন? খসরু কোথায়?

যোধা। সে ফতেপুর শিক্রির প্রাসাদে গিয়াছে।

সেলিম। কে তাহাকে সেখানে পাঠাইল শাহী-বেগম? নিশ্চয়ই তোমার সহোদর মানসিংহ?

যোধা। না—সম্রাট তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। এরূপ

বন্দোবস্ত ছিল, খসরু সরাসর আগরাতে যাইবে। তারপর ইলাহাবাদে আসিবে। এজন্য আমরা বিভিন্ন পথেই যাত্রা করিয়াছিলাম।

সেলিম। সম্রাটের সহসা এরূপ আহ্বানের উদ্দেশ্য কি?

যোধা। এই পত্রখানি পড়িয়া দেখিলেই সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিবে।

ফতেপুর শিক্রি হইতে প্রেরিত খসরুর একখানি পত্র, শাহী বেগমের কাছেই ছিল। শাহী-বেগম যোধাবাই স্বামীর হস্তে সেই পত্রখানি দিলেন। সেলিম আগ্রহের সহিত আদ্যোপান্ত সেই পত্রখানি পড়িয়া বলিলেন—"খোদা ধন্য! যে তিনি এবারও শাহ-ইন্-শাহকে এক ভয়ানক পীড়ার হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। কিন্তু ইহার পর তুমি খসরুর নিকট হইতে আর কোন পত্র পাইয়াছ কি?

যোধা। না—

সেলিম। মানসিংহ এখন কোথায়?

যোধা। খুব সম্ভব তিনি অম্বরেই আছেন।

সেলিম। না—ভুল বুঝিয়াছ তুমি। মানসিংহ স্বার্থের দাস। আর আমি এ কথা জানি, রাজপুতের অশ্বও তাহার প্রভুর স্বার্থ বুঝিয়া খুব দ্রুত ছুটিতে পারে। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি—সহস্র কার্য্য ত্যাগ করিয়া মানসিংহ সম্রাট দর্শনে গিয়াছেন। তুমি ও আমি যেমন এখানে দাঁড়াইয়া আছি—কথাটা এরই মত সত্য।

যোধা। তুমি আমার সহোদরের উপর অত বিরক্ত কেন? দেখিতেছি, চারিদিক হইতে তুমি ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হইতেছ। তোমার প্রথম ভ্রম—মানসিংহ সম্বন্ধে। দ্বিতীয় ভ্রম—খসরুর ব্যাপার। তৃতীয় ভ্রম—শেরের পত্নী মেহের উন্নিসা।

সেলিম। যোধা! আবার সেই পুরাতন কথা জাগাইয়া তুলিতেছ। যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তখন আমায় তাহা বলিতেই হইবে। মানসিংহের উপর আমি এত বিরক্ত কেন শুনিবে কি? দাম্ভিক মানসিংহ, মনে ভাবে, সে বাহুবলে মোগলসাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সে আলো, মোগল তার ছায়া। সেটা—তার ভয়ানক ভ্রম! দর্পিত শক্তিশালী মোগল বাহিনীর নায়ক বলিয়াই, মানসিংহের এতটা শক্তি, আর এই বিজয় দর্প। দুঃখের বিষয়, অম্বরের রাজা এ কথাটা বুঝিয়াও বুঝিতে চায় না। এটা আমার বিরক্তির অন্যতম কারণ। তারপর—এই কূটচক্রী রাজপুত রাজা মানসিংহ, আমার ঔরসজাত সন্তান খসরুকে বিপথগামী করিতেছে। আমার পিতৃভক্ত পুত্রকে পিতৃদ্রোহী করিয়া তুলিতেছে। যে খসরু আমার নয়নের আনন্দ, আমার সিংহাসনের অধিকারী, যাহাকে আমি বাল্যে, কৈশোরে, অসীম যত্নে মহাস্নেহে পালন করিয়াছিলাম, যে শিশুর সারল্যমণ্ডিত মুখ দেখিয়া, কতদিন খোদার এই জ্বালাময় দুনিয়ায়, একটা অনাবিল আনন্দ পাইয়াছিলাম, যাহার স্নেহে আবদ্ধ হইয়া আমি শাহজাদা খুরমকে ভুলিয়াছি, জগৎবাঈএর মনো বেদনার কারণ হইয়াছি, তোমার সহোদর মানসিংহ—আমার সেই খসরুকে দিনে দিনে চক্রান্তজাল বিস্তার করিয়া আমার এই স্নেহময় বক্ষ হইতে দূরে সরাইয়া দিতেছে! কেন—তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি? এ সম্বন্ধে পাছে কোন কথা বলিলে তুমি মনে দুঃখ পাও, এজন্য আমি এতদিন বলি নাই। আমার ধর্ম্মপরিণীতা পত্নী তুমি। আজ বাদে কাল যে হিন্দুস্থান আমার পদানত হইবে, তাহার রাজরাজেশ্বরী তুমি! এই মানসিংহের মনের উদ্দেশ্য পুনরায় হিন্দুস্থানে রাজপুতের শক্তি

প্রতিষ্ঠা করে। খসরুকে উপলক্ষ্য করিয়া সে প্রকারান্তরে সমগ্র হিন্দুস্থানের একাধিপত্য লাভ করিতে চায়। যে মোগল—বাহুবলে এই সোণার হিন্দুস্থান দখল করিয়াছে, তাহাকে বেদখল করিতে চায়! তাই খসরুকে তাহার এত প্রয়োজন। তাই সে তাহার প্রাণে এমন একটা অসম্ভব আশা জাগরিত করিয়া তুলিতেছে, এমন একটা বিচিত্র সুখস্বপ্নময় উজ্জ্বল দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে গড়িয়া তুলিতেছে, যে এখন হইতে এসব ব্যাপার উপেক্ষা করিলে, ভবিষ্যতে সে উপেক্ষার ফল অতি বিষময় হইবে। বলিব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু মানসিংহের এই ভীষণ উদ্দেশ্যের একটা বিশেষ প্রমাণ এই, সে বাদশাহকে গুপ্ত পরামর্শ দিয়া, আমায় বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আর আমায় পরামর্শ দিয়াছিল, পিতৃদ্রোহী হইতে। নিজের বাহুবলে, বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইতে। এমন কূটচক্রী যে, সে যে তার নিজের স্বার্থের জন্য খসরুকে বিপথচালিত করিবে না, তাহার সম্ভাবনা কই? আর এই সব ব্যাপারে মানসিংহের প্রধান সহায় হইয়াছেন, তোমার বৈবাহিক সেই শয়তান শ্রেষ্ঠ খাঁ আজিজ! আমি চাই, মানসিংহের একান্ত বাধ্যতা—সংকোচহীন বশ্যতা। আমি চাই, মানসিংহের প্রতিবাদ-শূন্য আত্মসমর্পণ। আমি চাই, তাহার হস্ত হইতে খসরুর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। এর জন্য যা কিছু দুরূহ কার্য্য করিতে হইবে, শাহী-বেগম তাহাতেই আমি প্রস্তুত।”

যোধাবাই ধীরভাবে তাঁহার রাজরাজেশ্বর স্বামীর কথাগুলি শুনিলেন। ভাবিলেন—সুলতান যাহা বলিতেছেন, তাহার তিলমাত্র মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নহে। আর সেই সঙ্গে এটুকুও বুঝিলেন, সত্যসত্যই

তিনি এক মহাসমস্যাময় অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছেন। একদিকে স্বামীর স্বার্থ, আর অপর দিকে পুত্র ও সহোদরের স্বার্থ। এ সব কথার উত্তর দিবার ত তাঁহার কোন যুক্তিই নাই। তবে স্বার্থের শ্রেয়ঃ ও হেয় দুইটি প্রকারভেদ আছে। এ ক্ষেত্রে যেটি তাঁহার শ্রেয়ঃ স্বার্থ, তাহাই তাঁহার পক্ষে অবলম্বনীয়!

স্বামীর কথায় প্রতিবাদ করিলে, তিনি আরও বিরক্ত হইবেন ভাবিয়া যোধাবাই এক মহা সমস্যার মধ্যে পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিলেন—"আচ্ছা—এই খসরুকে যদি আমি মানসিংহের শক্তি হইতে মুক্ত করিয়া তোমার কাছে আনিয়া দিই, তাহাহইলে তুমি কি তাহাকে পূর্ব্ববৎ স্নেহের চক্ষে দেখিবে? যে খসরু, তোমারই জন্য তাহার মাতুল মানসিংহকে হত্যা করিবার ব্যবস্থা করিতেছিল, তাহার প্রতি তোমার সমস্ত বিরক্তির ভাব বিদূরিত হইবে?"

যোধাবাইয়ের কথা শুনিয়া শাহজাদা সেলিম বিস্মিতমুখে বলিলেন, "কি অসম্ভব কথা বলিতেছ তুমি যোধা! খসরু মানসিংহকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল? কেন—কিসের জন্য?"

যোধা। কেন কিসের জন্য একথাও কি জিজ্ঞাসা করিতে হয় স্বামি! খসরু রাজ্য চাহে না, হিন্দুস্থানের অভিশপ্ত সিংহাসন চাহে না। সেই মাতৃভক্ত সন্তান চায়—কেবল পিতামাতার অনাবিল স্নেহ। চায় সে—কেবল জনকজননীর হাস্য-করুণা-স্নেহমুখরিত আদরের সম্বোধন। মাতার স্নেহ সে আশাতিরিক্ত পাইয়াছে। কিন্তু তাহার বড়ই দুর্ভাগ্য—যে সে পিতৃস্নেহে বঞ্চিত! তুমি এখনও সেই সরলপ্রাণ, আকাঙ্খাশূন্য, তোমার স্নেহের ভিখারী, হতভাগ্য সন্তানের প্রাণের

কথা বুঝিলে না—এই বড় আমার দুঃখ! হয়তো সে মনে ভাবিয়াছিল মাতুলকে হত্যা না করিলে, তোমার স্নেহময় বক্ষে পূর্ব্বস্থান অধিকার করিবার আর অন্য কোন সুযোগ পাইবে না। কিন্তু আমার বিবেচনায় এরূপ হত্যাসংকল্প, মনোমধ্যে পোষণ কবাই মহাপাপ! সন্তান কোন এক মহাপাপ করিতে অগ্রসর হইলে, কোন্ জননী তাতে বাধা না দিয়া থাকিতে পারে? তাই আমি তাহার সংকল্প বিফল করিয়া দিয়াছি। এই ঘৃণিত সংকল্পের জন্য, তাহাকে এত বেশী তিরস্কার করিয়াছি, যে সে মাতুলেব সাহচর্য্য ত্যাগ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে তোমাব চরণে অবনত হইতে আসিতেছে!”

এই কথা বলিয়া শাহীবেগম যোধাবাই, মানসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ ঘটিত সমস্ত কথাই তাঁহার স্বামীকে বলিলেন।

ভিতরের ব্যাপার শুনিয়া, সেলিমেব হৃদয়ে আবার অপত্য স্নেহেব প্রবলোচ্ছাস বহিল। যোধাকে আলিঙ্গন নিপীড়িত করিয়া সেলিম বলিলেন, “খসরু সম্বন্ধে তুমি যাহা করিয়াছ, তাহা ভালই করিয়াছ। সত্য বটে, আজ এক সমদিকগামী স্বার্থ লইয়া, মানসিংহ ও আমার মধ্যে ভীষণ মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। হইতে পারে—আমরা দুইজনেই এ সম্বন্ধে ভ্রান্ত! ভ্রান্তির উত্তেজনায়, এক এক সময়ে আমরা এমন সব কাজ করিয়া ফেলি, যাহাতে আজীবন অনুতপ্ত হইয়া থাকিতে হয়। শাহী! আমারও মনের ইচ্ছা এরূপ নয়, যে আমি মানসিংহকে বিনষ্ট করিয়া আকবর-শাহের দক্ষিণ বাহুচ্ছেদ করি। খসরুকে বিপথ চালিত না করিলে, গুপ্তভাবে আমার শত্রুতা না করিলে, মানসিংহকে আমিও কখন নিগৃহীত করিব না। তাহার শত অপরাধ মার্জ্জনা করিব।”

স্বামীর এই কথায়, শাহীবেগমের প্রাণের মধ্য হইতে যেন একটা ভাবি বোঝা নামিয়া গেল। সুলতান যে এত সহজে খসরুকে মার্জ্জনা করিবেন, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এজন্য বলিলেন—"তাহা হইলে তাহাকে একখানা পত্র দাও না কেন! ফতেপুর হইতে সে চলিয়া আসুক।"

সেলিম বলিলেন—"কাল প্রভাতেই আমি ফতেপুর শিক্রিতে সওয়ার প্রেরণ করিব। কতদিন আমি খসরুকে দেখি নাই শাহী? কতদিন এই বক্ষে তাহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করি নাই। কবে আমার এ শুভ সুযোগ ঘটিবে—তাহা খোদাই জানেন।

সেদিন আর বেশী কথা হইল না। ইহার পরে যাহা হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত-প্রতিনিধি মুখে, কোন গূঢ় রাজনৈতিক সংবাদ পাইয়া, আকবর শাহ ফতেপুর হইতে আগরায় চলিয়া গিয়াছিলেন। একথা পাঠক আজিজ খাঁ ও মানসিংহের কথোপকথন হইতেই জানিতে পারিয়াছেন। আজিজ খাঁ প্রকৃত সংবাদটি যে কি, তাহার আভাষ পাইয়াছিলেন। অনুমানসঙ্গত একটা সিদ্ধান্তে বুঝিয়াছিলেন, ব্যাপারটি বড় সহজ নয়। তাহা না হইলে শরীরের ওরূপ অবস্থায়, সম্রাট তাঁহার প্রিয় আবাসস্থান ফতেপুরশিক্রি ত্যাগ করিয়া, কখনও আগরায় যাইতেন না।

প্রস্থানকালে প্রাসাদের কর্তৃত্বভার তিনি খসরুর উপর দিয়া গিয়াছেন। একথাও আজিজ খাঁ জানিতেন। খসরুকে আয়ত্বাধীনে আনিবার বা বুঝাইবার পড়াইবার, এমন সুযোগ আর হইবে না ভাবিয়া, মানসিংহ পরদিন প্রভাতে খাঁ সাহেবকে বলিলেন—"তাহাহইলে এখন আমাদের সম্রাটের নিকট আগরায় যাইবার কোন প্রয়োজনই নাই। সম্রাট আমাকে ফতেপুর-শিক্রিতে যাইবার জন্য, ইতিপূর্ব্বেই পরোয়ানা প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সেই আদেশই পালন করিব। আগরা হইতে যদি তাঁহার দ্বিতীয় আদেশ কোন কিছু এর পর আসে, তাহাহইলে সেই অনুসারেই ভবিষ্যতে কাজ করিব। এখন চলুন খাঁ সাহেব—ফতেপুরেই যাওয়া যাক্।"

খসরুর শ্বশুর, খাঁ আজিজ-মহারাজের এই প্রস্তাবই সমাচীন বলিয়া ভাবিলেন। সেলিম সম্বন্ধে তাঁহার নিযুক্ত গুপ্তচরেরা তাঁহাকে এমন একটা জরুরি খবর আনিয়া দিয়াছে—যাহা তিনি তখনও মানসিংহের নিকট প্রকাশ করেন নাই।

চতুরে চতুরে প্রাণ বিনিময়। কর্ম্মক্ষেত্রে একদিকাভিমুখী স্বার্থ জন্য, দু'জনে অগাধ বন্ধুত্ব। মানসিংহ যেমন ভাবিতেছিলেন, খসরুকে সিংহাসনে বসাইলে তাঁহার আধিপত্য সার্ব্বভৌমিক হইয়া দাঁড়াইবে, অন্যপক্ষে খাঁ আজিজও ভাবিতেন—"এই নির্ব্বোধ ক্ষত্রিয়ের সহায়তা আমার চাই। বাহুবল, অর্থবল, সমরপ্রতিভা না আছে ইহার কি? তারপর আমার কার্য্য সিদ্ধি হইয়া গেলে, ইহাকে আমার স্বার্থপথ হইতে দূরীভূত করিতেই বা কতক্ষণ?"

উভয়ের এই আত্মীয়তার মধ্যে অবিশ্বাস বলিয়া কোন কিছু ছিল না

বটে, কিন্তু প্রয়োজন স্থলে মন্ত্রণাগুপ্তি উভয়েরই প্রধান লক্ষ্য। যাহা ব্যক্ত করিলে নিজেকে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে হইবে, তাহা গোপন করিতে উভয়েই সিদ্ধহস্ত।

সেলিম মানসিংহকে মনে মনে প্রশংসা করিতেন। তাঁহার সাহস শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে, তাঁহার খুব একটা উচ্চ ধারণা ছিল। কিন্তু খসরুর উপর মানসিংহের অগাধ স্নেহ, সেলিমকে ক্রমশঃই সন্দিগ্ধচিত্ত করিয়া তুলিতেছিল।

খাঁ সাহেবকে সেলিম মনে মনে যথেষ্ট ঘৃণা করিতেন। খাঁ সাহেব অপেক্ষা অন্য এক উচ্চপদস্থ ওমরাহের কন্যার সহিত—খসরুর বিবাহ দিবার জন্য তিনি বড়ই উৎসুক ছিলেন। কিন্তু খাঁ সাহেব, বাদশাকে হস্তগত করায়, তাঁহার কন্যা পিয়ারেবানুই মোগলবাদসাহের রঙ্গমহলে, সম্রাটের পৌত্রবধূরূপে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুলতান সেলিম তাঁহাকে বৈবাহিকের উপযুক্ত সম্মান না দিয়া, ঘৃণা ও উপেক্ষার চক্ষে দেখিতেন। তারপর মহারাজ মানসিংহের সহিত এই খাঁ সাহেবের অন্তরঙ্গ ভাবটী তাঁহার চক্ষে বড়ই তিক্ত বলিয়া বোধ হইত। অতীত ঘটনা পরম্পরার অনুমান সিদ্ধান্ত বিচারে তিনি অনেক সময়ে মনে মনে ভাবিতেন, তাঁহার মত শক্তিশালী শাহজাদার স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে, এ দুনিয়ায় আর কাহারও ক্ষমতা নাই, সওয়ায়—এই মানসিংহ ও আজিজ খাঁ। উভয়েই বাদশাহের সেনাপতি। মানসিংহের অধীনস্থ সাত সহস্র রাজপুত, আর এই আজিজ খাঁর অধীনস্থ পাঁচ সহস্র দুর্দ্ধর্ষ মোগল-সেনা একত্রিত হইলে, যে কোনদিন তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী অতি শোচনীয়ভাবে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে।

খাঁ আজিজ, যথাসময়ে মানসিংহের সহিত ফতেপুরে পৌছিলেন। প্রয়োজন মত বিশ্রামের পর, তিনি কন্যার কক্ষে উপস্থিত হইলেন।

খাঁ সাহেব—বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, সেদিন পিয়ারার মুখখানি বড়ই মলিন। কি যেন একটা মহাদুশ্চিন্তা, বর্ষার কৃষ্ণমেঘের মত তাহার চিরসুন্দর মুখখানিকে খুবই মলিন করিয়া দিয়াছে। এমন ত আর কখনও হয় নাই।

স্নেহময়ী আদরিণী কন্যা পিয়ারাকে পার্শ্বে বসাইয়া, খাঁ সাহেব স্নেহময় স্বরে বলিলেন—"তোমার মুখ অত মলিন কেন পিয়ারিবানু? কেমন আছ মা তুমি? আজকাল তবিয়ৎ কি তোমার ভাল যাইতেছে না?"

চারণীর সহিত সাক্ষাতের পর হইতেই, পিয়ারাবানু সত্যই যেন কি এক রকম হইয়া গিয়াছে। প্রবল বায়ুবিতাড়িত বাসিফুলের পাপ্‌ড়ীর মত—তাহার সদাপ্রফুল্ল চিত্ত হইতে যেন সকল আনন্দ ঝরিয়া পড়িয়াছে। তাহার চিরহাস্যময় মুখখানি, কি যেন একটা প্রচ্ছন্ন দুঃখের কালোমেঘে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে পিয়ারা তখন এ দুনিয়ার কার্যাক্ষেত্রের এক অতি সংকটময় সন্ধিস্থলে। সে এ পর্য্যন্ত তাহার স্বামীর নিকট চারণীসম্বন্ধীয় কোন কথা প্রকাশ করে নাই। কেননা সেটা করিতে তাহার সাহস হয় নাই। আমিরাকেও সে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল, যেন এ সম্বন্ধে কোন কথাই সে শাহজাদা খসরুকে জানিতে না দেয়।

তাহাহইলেও শাহজাদা খসরু, যখন পিয়ারার মলিনমুখ দেখিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে প্রশ্ন করিতেন—"তোমার চির আনন্দমাখা মুখে, মলিনতার ছায়া কেন পিয়ারা বেগম?" পিয়ারা তখনই সপ্রতিভের মত উত্তর

দিত—"রোগশোক মনস্তাপে শাহান্‌সার দেহ ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া আসিতেছে। এখন আমার প্রধান চিন্তার বিষয়, এই দুনিয়ায় বাদশা আকবরশাহ। তিনি গেলে আমাদের কি দশা হইবে শাহজাদা? চারিদিকে বিরাগ, চারিদিকে সন্দেহের কঠোরদৃষ্টি, চারিদিকে ঘৃণাপূর্ণ উপেক্ষা ও অনাদর; কার প্রসন্নমুখ দেখিয়া,আমরা এ দুঃখের দুনিয়ায় শান্তি পাইব শাহজাদা?"

পিয়াবার এ সঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ উত্তরে, খসরু কোন সন্দেহই করিতেন না। তিনিও পিয়াবার কথায় সায় দিয়া বলিতেন—"সত্যই ত তাই! পিয়ারা আমারও যে ঐ ভাবনা। রাজবংশে জন্মিয়া, আমার মত হতভাগ্য আর কে আছে? এ সংসারে আমার মুখের দিকে চাহিবার ত কেহই নাই। সত্যই আমাদের সাহস শক্তি, আশা ভরসা, আনন্দ উৎসাহ, সবই যে ঐ শক্তিমান আকবরশাহ। পিতা—তোমাকে ও আমাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারেন না। এমন কি তোমার পিতাকে পর্য্যন্ত তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখেন। শাহানশার যদি কোন ভালমন্দ হয়, তাহাহইলে আমাদের দশা কি হইবে পিয়ারা?"

এর চেয়ে খসরু আর বেশী বলিতে পারিতেন না। এইটুকু বলিতেই তাহার পাষাণ হৃদয়ের বাঁধটি ভাঙ্গিয়া যাইত। তিনি ভাবী অমঙ্গলাশঙ্কায় কাঁদিয়া ফেলিতেন। পিয়ারা তাঁহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিত—"কিসের ভয় তোমার প্রাণাধিক? মানুষের কাছে আমরা অপরাধী হইতে পারি, কিন্তু খোদার কাছে ত নই প্রিয়তম! খোদা—অতি দয়াময়, অতি আশ্রিতবৎসল। তিনি আমাদের কখনও মহা দুঃখে ফেলিবেন না।'

স্বামীর নিকট চারণীসম্বন্ধীয় কথাগুলি প্রকাশ করার পথে, যে সব অন্তরায় বর্ত্তমান,—পিতার নিকট সে কথাটা বলিবার পথে সেরূপ কোন

বাধাই ছিল না। চারণীর ভবিষ্যৎবাণীর কথা শুনিলেই, খসরু পিয়ারাকে তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য হয়তো খুবই তিরস্কার করিতেন। কিন্তু পিতার নিকট তাহার সে সব ভয় নাই।

এজন্য অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, নানাদিক দিয়া বিচার করিয়া, সে খাঁ সাহেবের নিকট বিতাগমন্দিরে পরিদৃষ্ট সেই চারণীর ভবিষ্যৎবাণী সম্বন্ধে, সকল কথাই ধীরে ধীরে প্রকাশ করিয়া বলিল।

কথাটা শুনিবামাত্রই, খাঁ সাহেব চমকিয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক অবস্থায় থাকিয়া, মনের মধ্যে ব্যাপারটা কয়েকমুহূর্ত্ত আলোচনা করিয়া, তিনি যেন সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে এক উজ্জ্বল আলোকরেখা দেখিলেন।

এই সব চারণী ও দেওয়ানার ভবিষ্যৎগণনা সম্বন্ধে, খাঁ সাহেবের মনে, বহুদিন হইতেই একটা উচ্চদরের ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাহার কারণ,কোনও হিন্দু-দেওয়ানা তাঁহার ভবিষ্যৎ ভাগ্যলিপি সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছে। সামান্য একশতী মন্সবদার হইতে তিনি তখন পাঁচহাজারি মন্সবদার পদে উন্নীত হইয়াছেন। সংসারের মধ্যে অতি শক্তিমান, আত্মনির্ভরশীল, উদ্যমশালী ব্যক্তি যাঁহারা, তাহাদের এই শ্রেণীর ভবিষ্যৎ গণনায় বিশ্বাস সম্বন্ধে একটা দুর্ব্বলতা আছে। সুতরাং আজিজ্ খাঁকে এজন্য কোন দোষ দেওয়া যায় না।

খাঁ সাহেব বুঝিলেন—এক সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, খসরুর আশাপ্রতীক্ষা করিতেছে। ঘটনা পরম্পরায় বিচারে তিনি যাহা বুঝিলেন, তাহাতে তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল, সম্রাট খসরুর উপর যেরূপ অতিরিক্ত ভাবে স্নেহশীল, আর সুলতান সেলিমের উপর যেরূপ অত্যধিক বিরক্ত, তাহাতে এটা বড় বেশী অসম্ভব নয়, যে সেলিমকে উপেক্ষা

করিয়া, খসরুকে তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করিয়া যাইতে পারেন।

দুরাশার মত তীব্র মদিরা আর কিছুই বোধ হয় নাই। মানুষের মগজকে, এই দুরাশাই খুব শীঘ্র বিগড়াইয়া দিতে পারে। তাহার প্রথম প্রমাণ পিয়ারাবানু। দ্বিতীয় প্রমাণ—তাঁহার পিতা খাঁ সাহেব। পিয়ারাও যেমন একদিন মনে মনে বলিয়াছিল—"কেন—ইহা কি সম্ভব হইতে পারে না ?" পিয়ারার পিতা খাঁ আজিজও চারণীঘটিত ব্যাপারটা শুনিয়া মনেমনে ভাবিলেন—"এ দুনিয়ায় অসম্ভব কি ! চেষ্টায় কিনা হয় ? এই মোগল-সম্রাজ্যের উত্তমপুরুষ বা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, এই সম্রাট আকবর। দ্বিতীয় ব্যক্তি—মানসিংহ। তৃতীয়—আমি। তিনজনেই আমরা খসরুর স্বপক্ষে। যদি বিধাতার লিপি ইহাই হয়, যে খসরু আগরার মসনদে সম্রাটরূপে বিরাজ করিবে, তাহাহইলে, তাহা রোধ করে কে ? ঘটনাপরম্পরা বলিয়া দিতেছে, স্পষ্ট বুঝাইয়া দিতেছে—"চেষ্টা কর ! চেষ্টায় কিনা হয় ? রাজ্যের মধ্যে শক্তিশালী লোক তোমরা দুইজন। তোমাদের চেষ্টায় মহাপ্রলয় উপস্থিত হইতে পারে। অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে।" খাঁ আজিজ, আত্মবিস্মৃত হইয়া এই কথাগুলি চিত্তমধ্যে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে সহসা তিনি গম্ভীরমুখে ডাকিলেন—"পিয়ারাবানু !"

পিয়ারাবানু—খাঁ সাহেবের সম্বোধনভঙ্গীতে ও বিকৃত কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"কেন পিতা ?"

খাঁ সাহেব বলিলেন—"চেষ্টায় না হয় কি পিয়ারা ?"

পিয়ারা। কেন এ কথা বলিতেছেন পিতা ?

খাঁ সাহেব। ভাবিয়া দেখিলাম—সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তোমার ও খসরুর

সম্মুখে। আমার বিশ্বাস, হিন্দু সন্ন্যাসিনীদের ভবিষ্যৎবাণী কখনও বিফল হয় না। তোমার কথা শুনিয়া আমার মনের মধ্য হইতে কে যেন বলিয়া দিতেছে, তুমিই ভারতেশ্বরী হইবে। অতি সন্নিহিত ভবিষ্যতে এ হিন্দুস্থান একদিন তোমার চরণতলে লুটাইবে। আর আমি সম্রাটের শ্বশুররূপে আমার জীবনের একটা অতৃপ্ত সাধ পরিপূর্ণ করিব।"

পিয়ারা বিস্মিতচিত্তে, পিতার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া থাকিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"কি বলিতেছেন আপনি পিতা? এ যে উন্মাদের প্রলাপ!"

খাঁ সাহেব দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"না পিয়ারাবানু! উন্মাদের প্রলাপ নয়। ঘটনা পরম্পারার বিচারে আমি যাহা বুঝিতেছি, প্রজ্ঞাবান মহারাজ মানসিংহ যাহা বুঝিতেছেন—তাহা কখনও উন্মাদের প্রলাপ হইতে পারে না। তুমি শুনিয়াছ কি—তোমার শ্বশুর সুলতান সেলিম শীঘ্রই আগরা আক্রমণ করিবেন!"

পিয়ারা কথাটা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল! পিতার মুখের দিকে বারেক-মাত্র চাহিয়া সে বুঝিল, তাহার পিতা রহস্য করিতেছেন না। যে কথাটি খাঁ সাহেব মানসিংহের নিকট প্রকাশ করিতে ইতঃস্তত করিয়াছিলেন—কে জানে কি অব্যক্ত কারণে, তাহা তিনি কন্যার নিকট ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন।

পিয়ারা এ কথা শুনিয়া বলিল—"কি সর্ব্বনাশ। এও কি সম্ভব?"

খাঁ সাহেব বলিলেন, "এই অভিশপ্ত হিন্দুস্থানের সিংহাসন লাভের জন্য, এরূপ ব্যাপার একটুও অসম্ভব নয়। আকবর শাহের জরাকম্পিত শিথিল হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইবার জন্য, সুলতান সেলিম বড়ই

অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছেন। তাই এ বিদ্রোহানুষ্ঠান। এই বিদ্রোহের পরিণাম, সেলিমের পক্ষে অশুভ হইলেও, তাহাতে খসরুর ভাগ্য প্রসন্ন হইবে।

সুচতুর মানসিংহ কাষ্ঠসংগ্রহ করিয়া যে মহাযজ্ঞের আয়োজন করিতে সংকল্প করিতেছেন—তাহার সংগৃহীত সেই অরণিতে, চাবণী যে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিলেন, খাঁ সাহেব সেই ধূমায়িত অগ্নিতে ফুৎকার দিয়া ভাল করিয়া ধরাইয়া দিলেন। অগ্নি বলসঞ্চয় করিয়া ধরিয়া উঠিল।

হায় ভবিতব্য! হায় হতভাগ্য খসরু! হায়! হতভাগিনী পিয়ারাবানু! আজ যে অগ্নি তোমাদের হৃদয়ে জ্বলিল—তাহা যে তোমাদের সকল আশা ভরসা, জীবনের সুখ-স্বপ্ন বিনষ্ট করিবে, তাহা তুমি কি একবারও ভাবিলে না!

মানবমাত্রেই ভবিষ্যৎ দৃষ্টিশক্তিবিহীন। বিশেষতঃ মন্দ কাজগুলি সম্বন্ধে। যদি সমস্ত মানুষের এ প্রজ্ঞা আর প্রতিভা থাকিত, তাহাহইলে জগতের অনেক মন্দ কাজ বোধ হয় কল্পনার সঙ্গেই বিলোপ হইত।

খাঁ সাহেবের কথায়, পিয়ারার কোমলপ্রাণে একটা অপূর্ব্বানুভূত উৎসাহ দেখা দিল। সে বলিল—"যদি তাহাই হয়, যদি ভাগ্য আমার স্বামীর মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দেয়, তাহাহইলে তাহার সুগম পথ প্রস্তুতের জন্য কোন কাজেই আমি সংকুচিত নহি। শাহজাদার প্রাণে যে নূতন মন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, যে মন্ত্রঃপুত জাগরণশক্তি নিহিত করিতে হইবে, তাহা করিতে গিয়া যদি আমি তাঁর বিরাগ নেত্রে পড়ি, তাহাও মুখ বুজিয়া সহ্য করিব। যদি এজন্য আমায় প্রলয়ের মুখে যাইতে হয়, অজাগরকে আলিঙ্গন

করিতে হয়, বজ্র-বিদ্যুতের মধ্যে গিয়া পড়িতে হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত। বলুন পিতা! আমায় কি করিতে হইবে?"

খাঁ সাহেব বলিলেন—"তোমায় আর বেশী কিছুই করিতে হইবে না। তুমি খসরুর নিশ্চেষ্ট কর্ম্মশক্তিতে, এমন একটা প্রবল শক্তি মিশাইয়া দাও, যাহাতে সে নিজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা বুঝিতে পারে। সেলিম সিংহাসন পাইলে, খসরুর কোনরূপেই নিস্তার নাই। এই আকবরশাহ যে দিন চক্ষু মুদিবেন, তাঁহার পঞ্চভূতময় দেহ যেদিন সেকেন্দ্রার সমাধিগহ্বরে চিরবিশ্রাম লাভ করিবে, সেই দিন হইতেই খসরুর অধঃপতন সূচনা আরম্ভ হইবে। সেই দিনই আমি ও মানসিংহ আগরা হইতে জন্মের মত নির্ব্বাসিত হইব। পিয়ারা! যদি এ শোচনীয় পরিণাম হইতে তোমার স্বামীকে রক্ষা করিতে চাও, গোয়ালিয়র দুর্গের অন্ধতমসাচ্ছন্ন নিভৃত কারাকক্ষের ভীষণ যন্ত্রণা ও বিষপ্রয়োগের ভীষণ অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে চাও,তাহাহইলে আজ হইতে তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা কর, যে সে চারিদিক হইতেই সমভাবে বিপন্ন! আর সে বিপদ অতি ভীষণ!"

এই কথা বলিয়া খাঁ সাহেব, উত্তেজিতভাবে, সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। পিয়ারা তাহার পিতাকে এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিবার অবসর পাইল না। সে মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেই কক্ষমধ্যে বসিয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল। সে ভাবনা-সমুদ্রের কূলকিনারা নাই। আর সেই মর্ম্মদাহী চিন্তার দহন, যেন বৃশ্চিকদংশনের জ্বালার মত অতি যন্ত্রণাময়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বিষের জ্বালায় অস্থির হইয়া, পিয়ারবোনু তাহার স্বামীর সন্ধানে চলিল। নানা স্থানে খুঁজিয়াও সে শাহজাদার কোনও সন্ধান পাইল না। অগত্যা সে তাহার পেয়ারের বাঁদী আমিরাকে ডাকিল। আমিরাকে বলিল— "শাহজাদাকে এখনি একবার এখানে ডাকিয়া আন্। বলিস্ বিশেষ প্রয়োজন।" কিন্তু আমিরাও কোন সন্ধান না পাইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে শুষ্কমুখে ফিরিয়া আসিল।

প্রাসাদমধ্যে এক গুলাববাগ ছিল। এই গুলাববাগ মধ্যে, খসরুর নিজের রুচি অনুসারে নির্ম্মিত, সযত্নে রচিত এক চামেলিকুঞ্জ ছিল। অনেক সময়ে দুশ্চিন্তাক্রান্ত চিত্তে, খসরু এই চামেলিকুঞ্জে বেড়াইতে আসিতেন। পিয়ারা তাহা জানিত।

অগত্যা পিয়ারা, এই চামেলিকুঞ্জের সন্ধানে চলিল। কুঞ্জদ্বারে উপস্থিত হইয়া সে দেখিল, সেই সুগন্ধিত নিকুঞ্জমধ্যে এক মর্ম্মরবেদীর উপর, চিন্তামগ্নভাবে খসরু বসিয়া আছেন। তাঁহার হস্তে এক খানি পত্র।

পিয়ারা বুঝিল, এই পত্রখানি হইতেই তাহার স্বামীর মনে একটা বিরাট অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে। সে নিস্তব্ধ অবস্থায়, রুদ্ধনিশ্বাসে, কুঞ্জান্তরালে দাঁড়াইয়া রহিল। খসরু কি বলেন বা কি করেন, তাহা গোপনে দেখাই যেন তার মনের উদ্দেশ্য।

সে শুনিল, খসরু আপন মনে অনুচ্চস্বরে বলিতেছেন—"আমায় পথ দেখাইয়া দাও—মেরে খোদা মেহেরবান! চারিদিক হইতে আমি ভীষণ অন্ধকার বেষ্টিত হইতেছি। এ অন্ধকার অতি অসহনীয়। আলোকরেখা মাত্র দেখিতেছি না! স্নেহময় পিতামহের আদেশ একদিকে, অন্যদিকে পিতার আদেশ। জননী বুঝাইয়া দিয়াছেন, পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম। পিতার অবাধ্য সন্তান যে, অনন্ত নরকে তার চির নিবাস। এ দিকে পিতামহ বলিয়া গিয়াছেন—"বিশেষ প্রয়োজনীয় রাজকার্য্যের জন্য আমি আগরায় যাইতেছি। এই ফতেপুর-শিক্রির প্রাসাদ রক্ষার ভার তোমার উপর দিয়া গেলাম। আমার দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত কখনই এস্থান ত্যাগ করিও না।"

খসরু আবার সেই পত্র খানি পাঠ করিলেন। পাঠান্তে তাঁহার মুখে যেন একটা প্রসন্ন ভাব দেখা দিল। তিনি অনুচ্চস্বরে বলিলেন—"কিসের ভয় ইলাহাবাদে আমার পিতার নিকট যাইতে? সেখানে তো আমায় স্নেহময়ী জননী আছেন। যিনি এতদিন মঙ্গলবিধায়িনী দেবীরূপে, আমায় সকল বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, পিতৃরোষের প্রবল তাপ হইতে আমাকে অঞ্চলাবরণ করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, তিনি যখন সেখানে আছেন, তখন আমার কিসের আশঙ্কা!"

এমন সময় কে যেন সেই কুঞ্জান্তরাল হইতে বলিল—"না—না—শাহজাদা! ইলাহাবাদে যাইও না। সেখানে গেলে মহা বিপদে পড়িবে।"

খসরু চমকিয়া উঠিয়া কুঞ্জবটিকার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—পিয়ারা বিষণ্ণমুখে সেখানে দাঁড়াইয়া আছে।

খসরু সোৎসুকে বলিলেন—"পেয়ারে! তুমিই কি এ সব কথা বলিলে ?"

পিয়ারা। বাঁদীর এ গোস্তাখি মাফ্ হৌক। তোমার দুশ্চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিবার জন্য আমিই এ কথা বলিয়াছি। তোমার হাতের ঐ পত্রখানি কোথা হইতে আসিয়াছে বলিবে কি আমাকে ?

খসরু। ইলাহাবাদ হইতে।

পিয়ারা। পত্র না পড়িলেও বুঝিতেছি, ওখানি আমার শ্বশুরের কোন জরুরি পত্র।

খসরু। নিশ্চয়ই তাই।

পিয়ারা। আর তিনি তোমায় ইলাহাবাদে তাহার নিকট যাইতে বলিয়াছেন।

খসরু। তোমার অনুমানই ঠিক পিয়ারা!

পিয়ারা। তুমি কি স্থির করিয়াছ ? যাইবে কি ?

খসরু। নিশ্চয়ই যাইব। পিতার এ স্নেহময় সম্বোধন উপেক্ষা করিলে ভীষণ অনিষ্ট ঘটিতে পারে!

পিয়ারা। না—তুমি যাইও না। এবার ইলাহাবাদে গেলে তুমি মহা বিপদে পড়িবে!

খসরু। কেমন করিয়া জানিলে ?

পিয়ারা। তুমি আমার ইষ্ট, তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তুমি ভিন্ন এ পিয়ারার মুখপানে চায়—এ নিষ্ঠুর হৃদয়হীন রাজসংসারে আর কেহই নাই! আমার মনের ভিতর হইতে কে যেন বলিয়া দিতেছে, নিশ্চয়ই তোমার কোন ভীষণ বিপদ ঘটিবে।

খসরু। দেখ, মনকে অতটা বিশ্বাস করিতে নাই। জান তো তুমি পিয়ারাবানু, এই দুনিয়ায় নরনারীর মনের আশেপাশে ভ্রান্তি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

পিয়ারা। সত্য—কিন্তু একান্তই যদি যাইতে চাও, তাহাহইলে আমাকে না হয় সঙ্গে নাও। তারপর এটাও ভাবিয়া দেখিও, শাহান্‌শা তোমাকে এখানে তাঁহার পুনরাগমন পর্য্যন্ত যখন অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন, তখন তাঁহার অনুমতি না লইয়া, চলিয়া যাওয়াটা ঠিক হয় কি? ফতেপুর হইতে আগরা তো বেশী দূর নয়। কাল প্রভাতেই, সওয়ার ডাকে বাদশাহকে সকল কথা খুলিয়া লিখিয়া, আগে তাঁহার সম্মতি আনাও না কেন?

খসরু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলেন—পিয়ারাব যুক্তিই অতি সঙ্গত। এইভাবে কাজ করিলে, সকল দিক রক্ষা পাইতে পারে।

খসরু, পিয়ারাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"দূর্‌মনভরা এই রাজপুরীতে তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে পিয়ারাবানু? যদি কখনও পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া, মোগলের এই মসনদে আমার অধিকার জন্মে, তাহাহইলে তুমিই যে রাজরাজেশ্বরীরূপে আমার পার্শ্বে বসিবার উপযুক্ত, তাহা আমি তোমার প্রত্যেক কার্য্যেই বুঝিতেছি। আর সেইজন্যই খোদা একাধারে তোমায় অত রূপ, অত গুণ, অতটা প্রখর বুদ্ধি দিয়া, এ দুনিয়ায় পাঠাইয়াছেন।

শাহজাদার কথাগুলি শুনিয়া, দূরাকাঙ্খান্দোলিত পিয়ারাবেগম একটু শিহরিয়া উঠিল। তারপর সে গম্ভীরমুখে বলিল—"দেখিও তুমি শাহজাদা! নিশ্চয়ই তোমার মনের অই আশাটী খোদার কৃপায় শীঘ্রই পূর্ণ হইবে!"

খসরু—পিয়ারার কথার মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া বলিলেন—"কি বলিতেছ—তুমি পিয়ারাবানু?"

পিয়ারা এবার সুযোগ পাইয়া বলিল—"শোন নাই কি তুমি, যে তোমার পিতা আগরা দখল করিতে আসিতেছেন! সম্রাটের জরাজীর্ণ, শোকতাপকাতর দুর্ব্বল হস্ত হইতে স্খলিত রাজদণ্ড কাড়িয়া লওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। আমার পিতা, বিশ্বস্তসূত্রে একথাও জানিতে পারিয়াছেন, ইলাহাবাদ হইতে বিহার পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগের রাজস্ব নাকি তাঁহার হস্তে। আর অসংখ্য সেনা সংগ্রহ করিয়া, তিনি আগরা কোষাগার লুঠ করিতে আসিতেছেন। এ বিবাদের শোচনীয় পরিণাম যে কি হইবে তাহা তুমি বুঝিতেছ কি?"

খসরু পিয়ারার এই কথাটী শুনিয়া খুবই দমিয়া পড়িলেন। অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"উত্তরাধিকারের দাবি অনুসারে, আগরার মসনদে যাঁর ন্যায্যাধিকার, তিনি বিদ্রোহী হইয়া এরূপ সাংঘাতিক ভ্রম করিবেন কেন? না—পিয়ারা! তুমি যাহা শুনিয়াছ, তাহার কোন ভিত্তিই নাই!"

পিয়ারা বলিল—"আমাদের মাথার উপর ঐ যে অনন্ত নীলিমাময় আকাশ রহিয়াছে, তাহা যেমন অভ্রান্ত সত্য, সদ্যোপ্রস্ফুটিত চামেলির সুবাস, মলয়ের বুকে চড়িয়া আমাদের চারিদিকে এখন যে সুগন্ধ বিলাইতেছে, তাহা যেমন সত্য—আমি তোমায় এইমাত্র যাহা বলিলাম—তাহাও সেইরূপ। শোন তবে শাহজাদা! যাহা কখনও তুমি কল্পনায় ভাব নাই, ভাবিবার সম্ভাবনা নাই, আমি আজ তোমায় তাহাই বলিব। আকবরশাহ তোমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন—তোমাকে ছাড়িয়া একদণ্ড থাকিতে পারেন না, এজন্য—তোমার পিতা তোমার উপর বড়ই সন্দিগ্ধ। তিনি তোমাকে

কৌশলে আয়ত্ত করিতে চান। তাই সেদিন তিনি কৃত্রিম স্নেহপূর্ণ সেই পত্র-খানি লিখিয়াছিলেন। সম্রাট পঞ্চাশতবর্ষকাল রাজত্ব করিতেছেন, আরও কতদিন করিবেন তাহারও স্থিরতা নাই, এজন্য তোমার পিতা বড়ই অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার সিংহাসনের পথের প্রধান কণ্টক অপসৃত করিবার জন্য, তিনি সর্ব্বাগ্রে তোমাকে আয়ত্ত করিতে চান। কিন্তু দেখিও, হিন্দুস্থানের সিংহাসন তোমারই হইবে। তাঁহার এ চেষ্টা বিফল হইবে। প্রত্যক্ষজ্ঞানসম্পন্না হিন্দু চারণীর ভবিষ্যৎবাণী কখনও মিথ্যা হইবে না!

খসরু ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিলেন—"হিন্দু চারণী? সন্ন্যাসিনী? কোথায় তুমি তার সাক্ষাৎ পাইলে? তিনি তোমার আমার সম্বন্ধে, কি ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছেন—পিয়ারা?"

তখন পিয়ারা পূর্ণ সুযোগাবসর পাইয়া, চারণীঘটিত সমস্ত ব্যাপার তাহার স্বামীর নিকট ব্যক্ত করিল।

নির্ণিমেষনেত্রে পিয়ারার মুখের দিকে চাহিয়া, খসরু তাহার সমস্ত কথাগুলি ধীরভাবে শুনিলেন। কিরূপ একটা জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত তাহার আদরের পিয়ারা, এই কথাগুলি বলিতে লাগিল, তাহাও তিনি দেখিলেন। আর সেই সঙ্গে মনে মনে ভাবিলেন, বিধাতা ইতিপূর্ব্বেই তাহাকে যে সমস্ত প্রহেলিকার মধ্যে ফেলিয়াছেন, ইহা তাহারই একটী নূতন পল্লব মাত্র।

খসরুকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া, পিয়ারা বলিল—"কি ভাবিতেছ তুমি প্রিয়তম?"

খসরু বলিল—"ভাবিতেছি, ভাগ্যের ছলনা। ভাবিতেছি, ললাট-

লিপির অব্যক্ত ভাষাময় বিচিত্র লেখা। আর সুদূর ভবিষ্যতে তোমার ও আমার কুহেলিকাচ্ছন্ন পরিণাম।"

পিয়ারা বলিল—"এ সব ব্যাপারের পরও কি তুমি ইলাহাবাদে যাইতে সাহস কর ?"

খসরু। সেটা এখন ঠিক বলিতে পারিতেছি না।

পিয়ারা। ধর যদি না যাওয়া হয়, তাহাহইলে সুলতানের পত্রের একটা উত্তর দেওয়া ত খুবই প্রয়োজন।

খসরু। সম্রাটের আদেশ যতক্ষণ না আসিতেছে, ততক্ষণ সুলতানের পত্রের উত্তর প্রদান করাও সম্ভবপর নহে। আমি এটুকু বুঝি, আমার কার্য্যগুণে, অবস্থাগুণে, দুর্ভাগ্যগুণে, আমি আমার পিতার বিষ-নেত্রে পড়িয়াছি। প্রবলপ্রবাহমুখে ক্ষুদ্র তৃণের মত, ভাগ্য আমাকে সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রের জটিল পথে সবলে আকর্ষণ করিতেছে। আমার মত দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির প্রাণে, এ আকর্ষণ উপেক্ষা করিবার কোন শক্তিই নাই। এই বিড়ম্বিত ভাগ্য, আমাকে যে পথে লইয়া যাইবে, তাহাতেই আমি প্রস্তুত। মৃত্যুও—যদি সে পথের মধ্যে, আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে, তাহাহইলে তাহাতে বাধা দিবার শক্তিও আমার নাই।

পিয়ারা কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া, মরালীর মত তাহার বঙ্কিমগ্রীবা হেলাইয়া, তেজদৃপ্তস্বরে বলিল—"তাহাহইলে পুরুষকার কি ভাসিয়া যাইবে? অদৃষ্টকে বাধা দিবার কোন শক্তিই কি এই পুরুষকারের নাই? চেষ্টায় না হয় কি শাহজাদা? প্রলয়ের ভীষণ বন্যা-প্রবাহের সমাগম সূচনা না হইতে হইতেই, চেষ্টা করিয়া বাঁধ বাঁধিতে হয়। তাহা না হইলে সে বন্যা প্রবলবেগে সব ভাসাইয়া লইয়া যায়। তোমার পিতার আজ্ঞায় শৃঙ্খলিত

হইয়া কারাবাস, গুপ্তঘাতকের অস্ত্রমুখে জীবন বিসর্জ্জনের অপেক্ষা, কি পুরুষকারের আশ্রয় লইয়া ভবিষ্যতে উজ্জল ভাগ্যগঠনের চেষ্টা নিন্দনীয়? আমি তোমার পিতৃবিদ্রোহী হইতে বলিতেছি না—পিতার আদেশ অবজ্ঞা করিতে বলিতেছি না—বলিতেছি তোমায়—কেবল আত্মরক্ষা করিতে। ভাব দেখি শাহজাদা! নিত্য নূতন ঘটনাজাল সৃষ্টি হইয়া, তোমার মনে কি ভীষণ তুষানলের জ্বালা প্রতি মুহূর্ত্তে জাগাইয়া তুলিতেছে। পলে পলে তোমার মর্ম্মসন্ধিকে দগ্ধ করিতেছে। দেবভোগ্য আহারে তোমার রুচি নাই, নিদ্রায় আরাম নাই, সঙ্গীতে আনন্দ নাই—কোন স্থানে দুদণ্ড স্থির হইয়া বসিতে পার না। আজকাল কেন তোমার এমন হইয়াছে শাহজাদা?

এক মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া খসরু বলিলেন,—"জানিতাম না পিয়ারা! দিল্লীর বাদশাহের গৃহে জন্মানো এতটা মহা পাপ! মোগলের রাজবংশে উত্তরাধিকারের আশা লইয়া জন্মান এত জ্বালাময়? পলেপলে তুষানলের আগুণে দগ্ধ হইতেছি। কেন যে তা জানিনা। ঠিক বলিতে পারি না, কেন এত দুচিন্তা আমার প্রাণে! বোধহয় এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে একদিন আমার বুদ্ধিবৃত্তি লোপ পাইয়া যাইবে। চিরপ্রেমময়ী আনন্দরূপিণী সোণার প্রতিমা, তুমি আমার! একদিকে প্রচণ্ড বহ্নিজ্বালাময় সংসার, আর একদিকে তুমি শান্তির অমৃত প্রস্রবণ। কিন্তু দেখিতেছি— খোদা তোমার মগজেও এরূপ একটা বিরাট দুরাকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিতেছেন। এর প্রমাণ সেই—চারণী। কে সে চারণী, কোথায় থাকে সে, তা জানিনা। তুমি তাহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া যে তীব্র বিষ সংগ্রহ করিয়াছ,—একটুও না ভাবিয়া, তাহা এখনি আমার কাণে ঢালিয়া দিলে। করিলে কি পেয়ারে?"

খসরু আর বলিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। সেই অশ্রুধারা, তাঁহার গণ্ড বহিয়া পিয়ারার দক্ষিণ বাহুতে পড়িল।

স্বামীর চক্ষে অশ্রুবারি দেখিয়া, পিয়ারা দারুণ মর্ম্মযাতনা পাইল। তাহার সকল দুরাকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্নময় দৃশ্য, এই ক্ষুদ্র অশ্রু-কণার মুখে তৃণের মত ভাসিয়া গেল।

সে খসরুর চোখের জল মুছাইয়া আবেগভরে কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল,—"শাহজাদা! সিংহাসনে প্রয়োজন নাই ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই, রাজ-সংসারে সৌভাগ্যবান জীবরূপে বিলাস ভোগেও প্রয়োজন নাই। ছার এ মোগলের মস্‌নদ, ছার এ হিন্দুস্থানের আধিপত্য! চল আমরা ফতেপুর প্রাসাদ ছাড়িয়া আর কোন বিজন, কোলাহলশূন্য, স্বার্থসংগ্রাম বিমুক্ত, শান্তিরসাস্পদ স্থানে গিয়া নিভৃতে বাস করি। আগবার সহিত আমাদের সকল সম্পর্ক লোপ করিয়া দিই! যে দুনিয়ার কাঞ্চনের এত আধিপত্য, স্নেহ ভক্তি ও প্রেমের পুরস্কার নাই, বন্ধুকে বিশ্বাস করিবার উপায় নাই—কে আপনার—কে পর, চিনিবার উপায় নাই, যেখানে এতটা হিংসা, দ্বেষ, সন্দেহ, অবিশ্বাস, অকারণ নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা, চল আমরা সেই স্থান হইতে জন্মের মত চলিয়া যাই। প্রাণের শান্তি পাইব যেখানে—সেই স্থানই বেহেস্ত। চল যাই শাহজাদা, সেইস্থানে যেখানে আমরা দুজনে 'সরাবন্-তহুরা' পানে উন্মত্ত হইয়া থাকিব। সেখানে পর্ণকুটিরে বাস করিলেও আমরা রাজপ্রাসাদের সুখ-স্বচ্ছন্দ অনুভব করিব। সেখানে থাকিব—কেবল তুমি আর আমি। তুমি আর আমি, দুইজনে মিলিয়া একটী অতিক্ষুদ্র সুখের দুনিয়া সৃষ্টি করিব। সেখানে কেবল অনাবিল আনন্দ, প্রেম ও প্রীতির হিল্লোল। বিদ্বেষের

জ্বলন্ত নিশ্বাস সেখানে থাকিবে না, হৃদয়ক্ষতবিক্ষতকারী স্বার্থসংগ্রাম সেখানে থাকিবে না। সেখানে থাকিবে কেবল—নূরাণী-জামাল অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় সৌন্দর্য্য।"

খসরু পিয়ারার এই মর্ম্মবেদনাময় কথা গুলি শুনিয়া, জ্বালাময় প্রাণে যেন একটু শান্তি বোধ করিলেন। মনে ভাবিলেন, সত্যই এই মায়াবিনী পিয়ারা চেষ্টা করিলে, একটা নূতন বেহেস্তের সৃষ্টি করিতে পারে!

আকাশে তখনও চাদ হাসিতেছিল। খসরু সেই অনিন্দ্যজ্যোতিপূর্ণ চাঁদের দিকে চাহিলেন, কিন্তু বুঝিলেন—চাঁদ যেন তাহাকে বিদ্রূপ করিতেছে। সে একবার দেখা দিতেছে, আবার যেন ঘৃণাবশে মেঘের আড়ালে লুকাইতেছে। গগনবিহারী সেই চাঁদ যেন বলিতেছে—"হায়! হতভাগ্য রাজকুমার! শান্তি কি তুমি এ দুনিয়ায় আর কখনও পাইবে? নারীর মিষ্ট কথার ছলনায়, উচ্চ আকাঙ্খায় মজিয়া, অনেক দুর্দ্দশা তোমার হইবে। মালতীসুবাস চুরী করিয়া মলয় তাঁহার নাসারন্ধ্রে পৌঁছাইয়া দিয়া, যেন গোপনে কাণে কাণে বলিয়া গেল—"তোমার ঐ পিয়ারাটি যাদুকরী! তাহার ছলনায় ভুলিও না। হিন্দুস্থানের সিংহাসন, তোমার পক্ষে একটা অতি ভীষণ দুঃস্বপ্ন। বৃথা সে স্বপ্ন দেখিয়া যন্ত্রণায় জ্বলিবে কেন? গাছের আড়াল হইতে একটা পাপিয়া ঠিক এই সময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। এটা যেন আনন্দের চীৎকার। পরের দুঃখ দেখিলে, অনেকেই এইরূপ উল্লাসে মাতিয়া থাকে। পাপিয়াটাও যেন তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে—কালসাপিনী রমণীর কথায় ভুলিও না। তাহাদের উপর অতটা বিশ্বাস করিও না। দৃষ্টিতে

যাহাদের ছলনা, কথায় যাহাদের প্রতারণা, অন্তরে যাহাদের হলাহল, তাহাদের তীব্র বিষের জ্বালা অতি ভয়ানক।

খসরু দেখিলেন—সমস্ত জড়প্রকৃতি সে দিন যেন মন্ত্রণা করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। পিয়ারা যখন চারণীর ভবিষ্যৎবাণীর কথা তাঁহাকে বলিয়াছিল,—তখন তাঁহার মনে এমন ধরণের একটা চিন্তার উদয় হইয়াছিল—"চেষ্টা করিলে হয় না কি! পুরুষকারের শক্তির জোরে শত্রু মিত্র, সকলকে কি আয়ত্বাধীনে আনা যায় না? যে পথ এখন এত কণ্টকিত, তাহা কি বাধা শূন্য করা যায় না?" কিন্তু জড় প্রকৃতির এই বিদ্রুপবাণী শুনিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন—"না না, সিংহাসনে আমার কোনও প্রয়োজন নাই, শক্তিপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় কোন আবশ্যক নাই। যেমন আছি—তেমনি থাকিব। যেমন জ্বলিতেছি—তেমনি জ্বলিব। তারপর কবরে গিয়া, চিরদিনের মত জ্বালা শূন্য হইব। এই পিয়ারা সত্যই শয়তানী, সত্যই সে ছলনাময়ী। সে আমার প্রাণে আজ এমন একটা মহা দুরাশার উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতেছিল, যাহার পরিণাম—ভীষণ কলঙ্ক। শোচনীয় অপমৃত্যু।"

শাহজাদাকে তন্ময়ভাবে চিন্তা করিতে দেখিয়া, পিয়ারা বীণানিন্দিত স্বরে ডাকিল—"শাহজাদা! রাত অনেক হইয়াছে। চল এইবার আমরা প্রাসাদে ফিরিয়া যাই।"

এই সম্বোধনে, খসরু যেন এক স্বপ্নময় রাজ্য হইতে তাঁহার চির পরিচিত দুনিয়ায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি সকল মর্ম্মবেদনা ভুলিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ পিয়ারার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"চল পেয়ারে! কিন্তু প্রাসাদে গেলেই কি চিত্তের পূর্ব্ব শান্তি ফিরিয়া পাইব?"

তখন দুই জনে ধীরপদবিক্ষেপে সেই চামেলি-কুঞ্জ ত্যাগ করিয়া রাজপ্রাসাদের দিকে চলিলেন। প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে, এক ক্ষুদ্রকায়া তাতারী, শাহজাদার হাতে একখানি পত্র দিল। খসরু পত্রখানি লইয়া তাঁহার খাস কামরায় চলিয়া গেলেন। আর পিয়ারা নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার বিশ্রাম কক্ষে চলিয়া গেল।

প্রাসাদের কক্ষগুলি তখন আলোকোজ্জ্বলিত। খসরু আগ্রহের সহিত সেই পত্রখানি পাঠ করিয়া জানিলেন—তাঁহার মাতুল মহারাজ মানসিংহ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহাকে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন।

শাহজাদা মনে মনে বলিলেন—"জানি না মহারাজ মানসিংহের সহিত সাক্ষাতে আবার কি একটা নূতন যন্ত্রণার সৃষ্টি হইবে! খোদা! খোদা! আমাকে আমার হিতাকাঙ্খী আত্মীয়দের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া দাও, প্রভু! তাহাহইলে বোধ হয় আমি অনেকটা শান্তির অধিকারী হইতে পারিব।"

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ফতেপুর শিক্রির প্রাসাদে, রাজ অতিথিদের বসবাসের জন্য, একটী নির্দ্দিষ্ট মহল ছিল। যে সমস্ত আমীর-উল্-উমরা, সেনাপতি, ও মন্সবদার-দের লইয়া সম্রাটের রাজ-কার্য্য, তাঁহারাই এই মহলে বাস করিতে পারিতেন।

মহারাজ মানসিংহের এইরূপ একটী নির্দ্দিষ্ট মহল ছিল। তাঁহার অধীনস্থ সেনাদের জন্য সেনা-নিবাসও ছিল। মহারাজ যে সমস্ত ভৃত্যবর্গ ও অন্তঃপুরিকাদের লইয়া ফতেপুরের প্রাসাদে আসিতেন, তাঁহাদেরও থাকিবার স্থানের অপ্রতুল হইত না।

এই মহলের একটী সুসজ্জিত কক্ষে, দ্বিপ্রহর নিশীথে, মহারাজ মানসিংহ শাহজাদা খসরুর জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন।

ঠিক এই সময়ে কে একজন ধীরগতিতে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আগন্তুক আর কেহই নহেন স্বয়ং শাহজাদা খসরু!

মানসিংহ চারণীঘটিত সমস্ত সংবাদই খসরুর শ্বশুর আজিজখাঁর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। আর এই কারণে পিয়ারার মনের চঞ্চল অবস্থার কথা শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিয়াছিলেন। কেননা, এই চারণী তাঁহারই নিয়োজিত। আর খাঁ আজিজ, যে তাঁহার কন্যাকে এ সম্বন্ধে খুব গোপনে একটা বড় গোছের আশা দিয়া আসিয়াছেন, তাহাও তিনি মানসিংহকে বলিতে ভুলেন নাই।

খসরুর বাহুতে শক্তি ছিল, সেনা পরিচালনার সামর্থ্য ছিল, ছিল না কেবল একটা—উত্তেজনাময় দুরাকাঙ্খা। পিতৃশক্তির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান চেষ্টা। মানসিংহ ও আজিজ খাঁর দৃঢ়নির্ব্বন্ধ হইয়াছে, যে উপায়েই হউক, খসরুকে সিংহাসনে বসাইতেই হইবে। তাঁহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায়, খসরুর অনাবিল পিতৃভক্তি। আর এই পিতৃভক্তি তাঁহার প্রাণে জাগরিত করিয়া দিতেছেন তাঁহার মাতা শাহীবেগম বা যোধাবাই।

আজিজ খাঁ ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার কন্যার প্রাণে তিনি যে দুরাশার আগুণ ধরাইয়া দিয়া আসিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই খসরুর প্রাণে সংক্রামিত

হইবে। এই অগ্নিতে, একটু জোরে ফুৎকার দেওয়া প্রয়োজন। তাই তিনি মানসিংহের সহিত যুক্তি করিয়া, এই গভীর নিশীথে, তাঁহার নিজের মহলে খসরুকে আহ্বান করিয়াছিলেন। মানসিংহও ইচ্ছা করিলে প্রাসাদ মধ্যে গিয়া, খসরুর সহিত দেখা করিয়া, নিজের বক্তব্য-গুলি বলিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই, কেবলমাত্র মন্ত্রণাগুপ্তির প্রয়োজনে।

সেলিমের যে পত্রখানি একদিন তিনি খাঁ সাহেবকে দেখাইয়াছিলেন, যে পত্রখানি সুলতান সেলিমকে তাঁহার হৃদয় হইতে অনেক দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, সেই পত্রখানি খসরুকে দেখাইবার জন্য, মানসিংহ যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলেন।

খসরু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই, মানসিংহ স্নেহভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। স্বাগত কুশল প্রশ্নের পর, তিনি খসরুকে বলিলেন—"তোমার পিতামহের এত শীঘ্র ফতেপুর শিক্রি হইতে চলিয়া যাইবার কারণ কি শাহজাদা খসরু ?"

খসরু মানসিংহের এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া বলিলেন,—"কেন গিয়াছেন, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। এত তাড়াতাড়ি তিনি চলিয়া গেলেন, যে কোন কথা জিজ্ঞাসারও অবসর আমি পাই নাই। তবে যাইবার সময় এইটুকু কেবলমাত্র আমায় বলিয়া গেলেন,—এই ফতেপুর প্রাসাদে, আমার আগরা রাজকোষের স্বর্ণময় কুঞ্চিকা রহিল। তাহার রক্ষক রহিলে তুমি। জীবনপণে তাহা রক্ষা করিও। আমার দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত, তুমি এ স্থান ত্যাগ করিও না।"

মানসিংহ খসরুর পৃষ্ঠদেশে, স্নেহের সহিত হস্তামর্ষণ করিয়া বলিলেন—"শাহজাদা! তুমি সম্রাটের সহসা প্রস্থানের কারণ বুঝিতে না পারিলেও, আমি তাহা বুঝিয়াছি। তুমি হয়ত জাননা—যে তোমার পিতা সুলতান সেলিম, সেনা সংগ্রহ করিয়া আগরা দখল করিতে আসিতেছেন। সত্তর হাজার সেনা তাঁহার অধীনে। ইলাহাবাদের রাজকোষ তাঁহার হস্তগত। সমগ্র বিহার ও অযোধ্যা তাঁহার দখলে। সুলতান সেলিম যদি আগরা অবরোধের ফলে, বাদশাহী রাজকোষ দখল করিতে পারেন, তাহা হইলে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে। সেই প্রচণ্ড প্রলয়ের তীব্র স্রোতমুখে তুমি যে কোথায় ভাসিয়া যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই। আর সেই সঙ্গে আমার ও তোমার শ্বশুর আজিজ খাঁর যে কি শোচনীয় পরিণাম হইবে, তাহা কল্পনার চক্ষে দেখিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে।"

পিতার এই বিদ্রোহের কথাটা, খসরু একটু আগে পিয়ারার নিকট একবার শুনিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাহাতে ততটা মনোযোগ দেন নাই। মানসিংহের মুখের উত্তেজিত অবস্থা ও কণ্ঠস্বরে বুঝিলেন, তিনি যাহা বলিতেছেন—তাহা ভয়প্রদর্শন বা কল্পনারঞ্জিত উপকথা নহে। খসরু এজন্য শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন,—"তাহাও কি সম্ভব? দুনিয়ার বাদশা প্রবল পরাক্রান্ত আকবরশাহ এখনও যে জীবিত মহারাজ!"

মানসিংহ বলিলেন,—"সত্য—কিন্তু বাদশাহ রোগশোকে জীর্ণ। ধরিতে গেলে, প্রকৃত আকবরশাহ অনেকদিন চলিয়া গিয়াছেন, এখন যিনি আছেন,—তিনি কেবল তাঁর ছায়ামূর্ত্তি। যে মহাশক্তি চিতোরকে শ্মশানভূমি করিয়াছিল, মালব ও বঙ্গদেশ হইতে পাঠানকে বিতাড়িত

করিয়াছিল, এখন কোথায় সে উদ্যম, কোথায় সে শক্তি? কোথায় সে উজ্জল সমরপ্রতিভা? আর একটা কথা যেন তোমার মনে থাকে,—আকবরশাহ তাঁহার এই জীবনের সন্ধ্যায়, পুত্রের সহিত সিংহাসন লইয়া যে বিবাদ করিবেন না—ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব। যে রাজকুমার ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তাঁর সিংহাসনাধিকারী, যে এই অভ্যুত্থানের চেষ্টা না করিলেও, বিনা বিবাদে তাঁহার মসনদ পাইত, তাঁহার সহিত—সিংহাসন লইয়া বিবাদ? লোকে বলিবে কি? সমগ্র জগৎ যে বিস্মিতনেত্রে এই বীরকেশরী সম্রাটের দিকে চাহিয়া থাকিবে খসরু?"

খসরু দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"আমার স্বার্থের জন্য, আপনারা কেন বৃথা কষ্ট পান মহারাজ? ছার সিংহাসনের জন্য আমি কখনই পিতৃ-দ্রোহিতার কলঙ্ক কিনিব না। আপনারা আমাকে চিরজন্মের মত আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিন, আমি পিতার চরণতলে আত্মসমর্পণ করি। ইহাতে আমার মর্ম্মদাহী অনুশোচনার অবসান হইবে,—মাতার নিকট যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছি, তাহাও রক্ষা করা হইবে। আপনারাও পুনরায় পিতার সুনজরে পড়িয়া সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিতে পারিবেন। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট যিনি, অসংখ্য সেনাবল যাঁহার ইঙ্গিতে পরি-চালিত, সমরপ্রতিভা যাঁর চিরসহচর, আগরা দখল করিতে পারিলে, যিনি মোগলের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবেন,—জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে আমি যাঁহার উত্তরাধিকারী, তাঁহার সহিত রাজ্য লইয়া বিবাদ! মহারাজ! আমায় মুক্তি দিন, স্বাধীনতা দিন, আমার অধীন চিত্তকে পাশমুক্ত করিয়া দিন। আমি পিতার নিকটে গিয়া, তাঁর চরণে ধরিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। তাঁর স্নেহময়বক্ষে বিলীন হইয়া,

একটা আতঙ্কময় চিন্তা হইতে চির মুক্তি পাই। আমার শয়নে ভ্রমণে, আরামে বিশ্রামে স্বস্তি নাই, নিদ্রায় সুখস্বপ্ন নাই,—চিত্তে প্রফুল্লতা নাই, প্রাণে সজীবতা নাই। অথচ আমি সম্রাট আকবরের পৌত্র! তবে কেন আমার এ দশা হইল অম্বরেশ্বর?"

এই সময়ে কে একজন সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"নির্ব্বোধ যুবক! পিতার নিকট এ আত্মসমর্পণের শোচনীয় পরিণাম যে কি হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? এ আত্মসমর্পণের পরিণামে লাভ করিবে—কেবল গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে অতি বিভীষিকাময় মৃত্যু! অথবা বিষে—অপমৃত্যু! যদি একটু সামান্য চেষ্টা করিলে এ শোচনীয় মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাও, তাহাতে ক্ষতি কি খসরু?"

এই বক্তা আর কেহই নহেন, খসরুর শ্বশুর আমির-উল্-উমরা খাঁ আজিজ কোকা। বাদশাহের বিশ্বস্ত উজীর ও সর্ব্ববিষয়ে পরামর্শদাতা।

খসরু, খাঁ সাহেবের উত্তেজিত মুখমণ্ডলের দিকে, বিস্মিতভাবে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, প্রশ্ন করিলেন,—"আপনারা কি আমায় পলে পলে হত্যা করিতে চান? খোদার দোহাই! আর আমাকে এ ভাবে যন্ত্রণা দিবেন না। আপনাদের মনের কথা শীঘ্রই আমাকে বলুন।"

খাঁসাহেব বলিলেন,—"শোন তবে খসরু! আজ তোমায় সবই খুলিয়া বলিব। আমাদের—বলিবার কারণ, আমার ও তোমার এই মহা পরাক্রান্ত মাতুল মানসিংহের মিলিতপরামর্শে, যাহা কিছু স্থির হইয়াছে, তোমাকে তাহাই এখন বলিতেছি। বিশসহস্র দুর্দ্ধর্ষ রণকুশল মোগলসেনা আমার আজ্ঞাধীন। পঁচিশ সহস্র বীর্য্যবান রাজপুত সেনা এই মহারাজ মানসিংহের করেঙ্গিতে পরিচালিত। মোগল-সাম্রাজ্যের রাজকোষের

চাবি, এই প্রাসাদের কক্ষমধ্যেই ত আছে! তোমার পিতা সুলতান সেলিম আগরার রাজকোষ দখল করিবার পূর্ব্বে তুমি যদি তাহা কোন উপায়ে হস্তগত করিতে পার, জানিও—এ সোণার হিন্দুস্থান তোমার। এই মেদিনী চিরদিনই বীরভোগ্যা। খোদা তোমাকে সাহস দিয়াছেন, শক্তি দিয়াছেন, আমাদের মত পৃষ্ঠবলও দিয়াছেন। স্বীকার করিতেছি, তোমার পিতামহের স্নেহময় বক্ষে তোমার নির্ব্বিবাদিত আসন। অন্যপক্ষে বাদশাহ তোমার পিতাকে সন্দেহ করেন, বিরাগনেত্রে দেখেন, কিন্তু তোমাকে একদণ্ড নয়নান্তরাল করিতে তাঁর ইচ্ছা হয় না। এ সব দেখিয়াও কি বুঝিতেছ না খসরু! যে ভাগ্য, ঘটনা ও অসংখ্য সুযোগপূর্ণ বর্ত্তমান, তোমার অনুকুল। তোমার ভবিষ্যৎও অতি সমুজ্জ্বল।"

খসরু তাঁহার শ্বশুরের কথাগুলি শুনিয়া মর্ম্মেমর্ম্মে শিহরিয়া উঠিলেন। দুরুদুরু কম্পিতস্বরে বলিলেন,—"জনাব! খাঁ সাহেব! শাহজাদা সেলিমের পুত্র হইয়া জন্মিয়াছি বলিয়াই ত আমি বাদশাহের আদরের পৌত্র। তাঁহার বিনানুমতিতে তাঁহার পুত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে, বাদশাহ কি মনে করিবেন?

খাঁ সাহেব বলিলেন,—"আর তুমি যদি সম্রাটের এ বিপদে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় থাক খসরু! তাহা হইলেই বা তিনি কি মনে করিবেন? চিতোর-জয়ী, কাবুলজয়ী, দাক্ষিণাত্যজয়ী, চিরশক্তিমান সম্রাটের বাহুতে এখন ত আর সে শক্তি নাই। তাঁহার নিত্যসহচর পরামর্শদাতা সুহৃৎ আবুল ফজলও এখন সুদুর দাক্ষিণাত্যে। তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতিদের অনেকেই তোমার পিতার প্রতি মনে মনে অনুরক্ত, তাঁহার অর্থে ও অনুগ্রহে ক্রীত। এটা স্থির জানিও, সম্রাট ভিন্ন আর কেহই সুলতানের

বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে সমর্থবান নহেন। সম্রাট যখন অসমর্থ, সুতরাং এ ক্ষেত্রে তোমারই অগ্রসর হওয়া শ্রেয়ঃ। যদি তুমি তোমার পিতার আগরাপ্রবেশে বাধা দিতে পার, আর বাদশাহের অনুমতি না লইয়াই এ কাজটা যদি একটু আগে করিয়া ফেল, তাহা-হইলে কূটবুদ্ধি আকবরশাহ প্রকাশ্যে তোমায় একটু তিরস্কার করিবেন বটে, কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত ও অনর্থকর বিদ্রোহশান্তির কৃতজ্ঞতা দেখাইতে তিনি কখনই ভুলিবেন না।"

"উজ্জ্বল আলোকময় ভবিষ্যৎ তোমার সম্মুখে। ঐ শোন। মোগলের রাজলক্ষ্মী তোমায় হাস্যমুখে বলিতেছেন,—"চেষ্টা কর খসরু। উদ্যোগী হও, বীরদর্পে বীরের সুনাম অর্জ্জন কর। সেই প্রত্যাশিত শুভমুহূর্ত্ত, অতি নিকটে যে শাহজাদা! মোগলের অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্নিত রাজ-পতাকা, অতি শীঘ্র তোমারই প্রাসাদশিখরে উড্ডীয়মান হইবে। কত জন্মের পুণ্যফলে জীব মানুষ হইয়া জন্মায় তা জানত শাহজাদা খসরু! খুব বেশী পুণ্য না হইলে রাজকুলে কেহ জন্মায় না। আর রাজবংশীয়দের মধ্যে যাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল অতি শক্তিময়, সেই ভাগ্যবানই সম্রাটের মণিখচিত স্বর্ণ-মুকুট মস্তকে ধরিয়া গৌরবান্বিত হন—মানবজন্ম সার্থক করেন। প্রমাণ—মরুভূমে ভূমিষ্ঠ, তোমার পিতামহ আকবরশাহ। মরুভূমির উষ্ণ নিশ্বাসে দুঃখকষ্টের মধ্যে যাঁর জন্ম, অকালমৃত্যু একদিন যাঁর শিয়রে আসিয়া বসিয়াছিল, তিনি যে আজ ভাগ্যফলে, কর্ম্মফলে পুণ্যফলে, স্বাবলম্বনের আদর্শরূপে দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা বলিয়া এই হিন্দুস্থানে পূজিত।"

"একবার তোমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তুমি শাহজাদা

খসরু! আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী বিস্তৃত ভূভাগ, তোমার পদতলে লুটাইতে উৎসুক! ঐ দেখ! শাহজাদা! মোগলের রাজলক্ষ্মী সুরভিসিঞ্চিত অঞ্চল দোলাইয়া, তাঁহার স্নেহময় অঙ্কোপরি বসিবার জন্য তোমায় আহ্বান করিতেছেন। ঐ শোন—তোমার বিজয়দুন্দুভির গভীর মন্দ্র, যাহাতে সমস্ত হিন্দুস্থান তোমাকে ধনধান্য ও পুষ্পমাল্য লইয়া সম্রাটরূপে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য প্রস্তুত। চাঘ্‌টাইবংশের চিরপ্রচলিত সিংহাসনলাভ প্রথা ত্যাগ করিও না। প্রবৃত্তি, স্নেহ, মায়া, দয়া, পিতৃভক্তি সব ডুবাইয়া উন্মুক্ত অসিহস্তে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। মোগলের শৌর্য্যবীর্য্যের সম্মান রক্ষা কর।"

খসরু, মন্ত্রমুগ্ধবৎ খাঁ সাহেবের এই উত্তেজনাময় কথাগুলি শুনিলেন। তাহার মর্ম্মেমর্ম্মে বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিতে লাগিল। এই সময়ে জননী শাহী-বেগম যোধাবাইয়েব উপদেশ গুলি, তাঁহাব মনে পড়িল। বাল্যের মধুর স্মৃতি, পিতার সেই স্নেহাপ্লুত খসরু সম্বোধন, খুর্‌রমকে উপেক্ষা করিয়া সাদরে মুখচুম্বন, তাহাও মনে পড়িল। এই চিরস্নেহময় পিতার বিরুদ্ধে, সামান্য সিংহাসনের জন্য তাহাকে অসিহস্তে দাড়াইতে হইবে? কি ঘৃণা! কি লজ্জা! কি পরিতাপ! সমস্ত জগৎ বলিবে কি? আকবরশাহের মার্জ্জনাশীল হৃদয়ে, তাঁহাব পিতা সুলতান সেলিমের কতটা বেশী অধিকার, তাহাত তিনি জানেন। একটা ভ্রমে, একটা বিচারদোষে, একটা অসহিষ্ণুতার ফলে, একটা ভিত্তিহীন সন্দেহের উত্তেজনায়, পিতাপুত্রে এই বিবাদ উপস্থিত হইতেছে। বিদ্রোহ-পরায়ণ অনুতপ্তপূর্ণ পুত্র, অশ্রুপ্লুত নেত্রে সম্রাটের চরণতলে উপস্থিত হইলে, আকবরশাহ হয়তো সন্তানকৃত সমস্ত অপরাধই ভুলিয়া যাইবেন। তাঁহার

পিতার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আবার তাঁহাকে নিজের স্নেহময় ক্রোড়ে টানিয়া লইবেন। কিন্তু তাঁহার পিতৃদ্রোহিতার কলঙ্ক ত ইহজন্মেও মুছিবে না! তাঁহার পিতা একটা ভ্রম আর চঞ্চল প্রবৃত্তির মধ্যে পড়িয়া বিদ্রোহী হইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহা বলিয়া তিনিই বা এ মহা পাপ করিতে যান কেন?

খসরুকে দীর্ঘকাল নির্ব্বাক অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া, মানসিংহ বলিলেন—"প্রাণাধিক খসরু! দীর্ঘকাল চিন্তার ত অবসর আর নাই। কালক্ষয়ে, তোমার যে মহা সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। তোমার মঙ্গলের ও স্বার্থের জন্য, আমরা দুজনে মহা কলঙ্ক কিনিতে প্রস্তুত, জীবন-বলি দিতে প্রস্তুত। কিসের আশঙ্কা, কিসের সন্দেহ? শোন খসরু! তোমার কাছে একটী জিনিস আমরা এখন চাই। সেটি দিতে তোমার আপত্তি আছে কি?"

খসরু বিস্মিতনেত্রে মাতুলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আমার এমন কি আছে, যাহা আপনাদের দিবার উপযুক্ত? বলুন মহারাজ! কি চান আপনি?"

মানসিংহ। তোমার নিকট বাদশাহ—আগরার রাজকোষের যে চাবি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনিই আমাদের দাও।

খসরু রুষ্টদৃষ্টিতে, বিরক্তিপূর্ণনেত্রে, মানসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"আর সব পারি, কিন্তু দুনিয়ার বাদশা, শাহানশা আকবরশাহের নিকট বিশ্বাসঘাতক হইতে পারি না। ছার এ হিন্দুস্থানের সিংহাসন মহারাজ মানসিংহ! আমার চির স্নেহময় পিতামহের চক্ষে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ার

কলঙ্ক, যে শত হিন্দুস্থানের বিনিময়ে মুছিবে না। আর খাঁ সাহেব! আপনাকে আর বেশী বলিব কি? জনাবালি! সামান্য অবস্থা হইতে আজ যে আপনি ভারতেশ্বর আকবরশাহের প্রধান উজীর, প্রিয় পার্শ্বচর, ও আমীর-উল্-উম্‌রা হইয়াছেন, সে কথাটা কি এত শীঘ্রই ভুলিয়া গেলেন? যে স্বার্থ লইয়া আপনি আর আমার মাতুল এই মহারাজ মানসিংহ, আমাকে বিদ্রোহে, বিশ্বাসঘাতকতার হীন-কার্য্যে উৎসাহ দিতে আসিয়াছেন, সে স্বার্থ—আমার চক্ষে অতি তুচ্ছ!

আপনাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আমি পিতৃদ্রোহিতা আর পিতামহের নিকট বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ক কিনিতে প্রস্তুত নই। উত্তরাধিকারের বিধিসঙ্গত নিয়মে, যে বিশাল সাম্রাজ্য একদিন আমার করতলগত হইবে, তার জন্য পিতৃদ্রোহ ও শোণিতপাত করিব কেন মহারাজ? এ জগতে যদি কাহারও সুবিমল নিঃস্বার্থস্নেহ পাইয়া থাকি, যদি কাহাকেও প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকি, তাহাহইলে তিনি আর কেহই নহেন, দিল্লীশ্বর আকবরশাহ। কিন্তু এই আকবরশাহও যদি আমায় আদেশ করেন—"আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম বিদ্রোহী হইয়াছে, সে আমার রাজ-ধানী ও রাজকোষ দখল করিতে আসিতেছে,—আমায় বন্দী করিতে আসিতেছে, এই আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী হিন্দুস্থানের সম্রাট আমি। আমার সমস্ত সেনাবল লইয়া, তোমার পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াও গিয়া খসরু। আমার এই হিন্দুস্থান তোমার। আমার নির্ব্বাচিত উত্তরাধিকারী তুমি।" বোধ হয় তাহা হইলেও, আমি,আমার প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা-মহের আদেশ পালনে অসম্মত হইব। আর আমার অধীনস্থ সেনাবল,

আর আমার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ, আকবরশাহের অনুমতি না পাইয়াও, আমি বিনা সংকোচে, বিনা দ্বিধায়, পিতৃচরণে সমর্পণ করিব।"

"মহারাজ! আপনিও ত পুত্রের পিতা। আপনার পুত্র যদি বিদ্রোহী হয়, তাহাহইলে আপনার মনের ভাব কি হয় বলুন দেখি অম্বরেশ্বর! পাপের একটা নিদ্ধারিত সীমা আছে, কর্ত্তব্যহীনতার একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী আছে—কৃতঘ্নতারও একটা সসীম অবস্থা আছে। আপনি দেখিতেছি, সকল নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে গিয়া আমাকে এক মহাপাপানুষ্ঠানে ব্রতী করিতেছেন! ধিক আপনাকে! ততোধিক ধিক, আপনার বন্ধু এই খাঁ-আজিজ সাহেবকে। ধিক! আপনাদের হীন স্বার্থে! খসরু আর আপনাদের ছলনামুগ্ধ নহে—খোদার কৃপায় তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইয়াছে।"

উত্তেজনাবশে এতগুলি কথা বলিয়া, খসরু তখনই মানসিংহের কক্ষ ত্যাগ করিলেন। আর খাঁ আজিজ্ ও মহারাজ মানসিংহ বিফল মনোরথ হইয়া, একান্ত নির্ব্বোধের মত পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এ চাহনীর উদ্দেশ্য, আমরা দুজনেই এ পর্য্যন্ত খসরুকে চিনিতে পারি নাই। তাহার পিতৃ ও মাতৃভক্তি কতটা গভীর, তাহার একটা অযথা অনুমান করিয়াছিলাম।

প্রাণের মধ্যে বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা লইয়া, শাহজাদা খসরু, রঙ্গমহলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার মহা দুঃখে সান্তনা, মর্ম্মবেদনায় প্রবোধ, যাতনায় শান্তি, নিরাশায় আশা, পিয়ারাবানু বেগম! মরুপথবাহী তৃষাতুর পথিকের মত, শান্তিবারির আশায়, খসরু পিয়ারার মহলের দিকে মন্থরগতিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার

প্রাণের জ্বালা কমিল না। মরুভূমির উষ্ণ নিশ্বাস হইতে আত্মরক্ষা করিয়া তিনি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গবৎ আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

দাও, মধুবর্ষী চন্দ্রমা! তোমার সমস্ত স্নিগ্ধজ্যোতিঃ আমার এ জ্বালাময় প্রাণে ঢালিয়া। শুনিয়াছি, তুমি স্নিগ্ধতার আধার, শৈত্যের আশ্রয়, অমৃতের অনাবিল উৎস! এস! প্রসূনসুবাসময় স্নিগ্ধ মন্দানিল! দাও তোমার ঐ শিহরণ-স্পর্শ আমার এ জ্বালাময় হৃদয়ে মিশাইয়া। এস! সর্ব্ব-যন্ত্রণানাশিনী, স্নিগ্ধকারিণী শান্তি, আমার এ অনন্তজ্বালাময় হৃদয়-কন্দরে, আমার এ শান্তিময় বক্ষপঞ্জরে। একটা বিদ্যুৎশিখা যেন অন্তরের চারিদিক হইতে জ্বলিয়া উঠিতেছে। তোমার কোমলকরস্পর্শে সে আগুণ নিভাইয়া দাও, আমার প্রাণে শান্ত আনিয়া দাও। এস আমার হৃদয়ের দেবতা, আমার আরাধনা ও ধ্যানধারণার জিনিস, শাহজাদা খসরু! আমি সতৃষ্ণ-নয়নে তোমার আশাপথ চাহিয়া আছি। সুযোগ পাইয়া, শয়তান আমার হৃদয়ে আসন পাতিবার চেষ্টা করিতেছিল। তোমার মত দেবতার দাসী আমি শয়তানের দাসী হইব কেন? এস কান্ত! এস দয়িত! এস প্রিয়তম! আমায় নরকাগ্নি হইতে উদ্ধার কর। দীন্‌দুনিয়ার পয়দাকর্ত্তা মহিমময় খোদা! দেখিয়া যাও, তোমার বাঁদীর বাঁদী, চরণের দাসী

পিয়ারাবানু বেগম, ঐশ্বর্য্যের, বিলাসের, দুরাকাঙ্ক্ষার, নিরাশার গভীর আবর্ত্তে পড়িয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছে। আমায় উদ্ধার কর মেরে খোদা!"

ফতেপুর-শিক্রি রাজপ্রাসাদের, পাঁচমহলের হাওয়াখানার একটা কক্ষে বসিয়া, শাহজাদা খসরুর আদরিণী বেগম পিয়ারাবানু, উল্লিখিত-ভাবে, অস্ফুটস্বরে, তাহার মনের বেদনা প্রকাশ করিতেছিল। কক্ষটী আলোকোজ্জ্বলিত।

পার্শ্বে স্বর্ণখচিত অক্ষরে লেখা—একখানি হাফেজ। অদূরে একটা সুর করা বীণ্ অনাদরে কক্ষতলে পড়িয়া লুটাইতেছে। কক্ষের চারিদিকে স্বর্ণপাত্রে রক্ষিত, চম্পা চামেলি ও নাগকেশর ফুলের রাশি। তাহাদের সুবাসে সমস্ত কক্ষটী মদগন্ধময়।

আর মেঘশূন্য নীলাকাশে—ষোলকলাপূর্ণ শশী, যেন পিয়ারার দুঃখ দেখিয়া হাসিতেছে। গলিত রজতধারার মত চাঁদের আলো, অদূরে পাহাড়ের চূড়ায়, প্রস্তরময় মিনার গাত্রে, স্নিগ্ধসলিলসম্পদময়ী তরঙ্গায়িত ক্ষুদ্র গিরিনদীর লহরের উপর পড়িয়া, নৈশসৌন্দর্য্যকে আরও নয়নারাম করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু পিয়ারার প্রাণে প্রচণ্ড জ্বালা, মরুর উষ্ণনিশ্বাস।

পিয়ারা দেখিল—স্নিগ্ধমলয়ে, সুগন্ধি প্রসূনবাসে, রজতশুভ্র চাঁদিমার অমৃতবর্ষণে, তাহার প্রাণের জ্বালা শান্ত হইতেছে না। সে একবার তাহার বড় আদরের 'হাফেজ্' খানি হাতে তুলিয়া লইল। পাতাগুলি উল্টাইয়া, এক একটী স্থান বাছিয়া মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও মন বসিল না। হাফেজ্খানি বন্ধ করিয়া সে বীণ্টা লইয়া নাড়াচাড়া করিল। কিন্তু তাহার চম্পককলিবৎ কোমলকরাঙ্গুলি পীড়নে, পরদা হইতে কেবল বেসুরা সুর বাহির হইতে লাগিল।

বীণ্‌কে দূরে সরাইয়া রাখিয়া, পিয়ারা অস্ফুটস্বরে মনে মনে বলিতে লাগিল—"হায়! কেন এমন কাজ করিলাম? কেন এক হিন্দু চারণীর ভবিষ্যৎবাণীতে বিশ্বাস করিয়া, দুরাশার ছলনায় মজিয়া, শাহজাদার প্রাণে একটা অশান্তি জাগাইয়া দিলাম। যিনি আমাকে একদণ্ড ছাড়িয়া কোথাও থাকিতে পারেন না, এখন দেখিতেছি আমার সাহচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া দূরে থাকিতে পারিলেই, যেন তাঁর চিত্তের শান্তি হয়। হায়! কেন সে সর্ব্বনাশী চারণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম? সাম্রাজ্য, সিংহাসন অতলজলে নিমগ্ন হোক! আমি চাই—শাহজাদার মনের শান্তি, প্রাণের সুখ। যাহা আমি চাহি নাই, খোদা আমাকে তাহাই ত দিয়াছিলেন। যাহা দেন নাই, তাহার কামনা করিলাম কেন? আর করিয়াই বা এ যাতনা ভোগ করিতেছি কেন?"

পিয়ারা একটু আগে তাহার বাদী আমিরাকে খসরুর সন্ধানে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু আমিরা, সারা মহল খুঁজিয়াও খসরুর কোন সন্ধান পায় নাই। না পাইবারই কথা। কেননা খসরু, সেই সময়ে মানসিংহ ও আজিজ খাঁর কবলে। পিয়ারাবেগম সেই গভীররাত্রে আমিরাকে আবার শাহজাদার সন্ধানে পাঠাইল। আমিরা যেমন কক্ষ মধ্য হইতে বাহির হইয়াছে—দেখিল, সেই বারান্দার সুদূরপ্রান্তে, কে একজন এক স্তম্ভগাত্রে হেলান দিয়া, উন্মুক্ত আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছে।

একটু অগ্রসর হইয়া আমিরা সবিস্ময়ে দেখিল, এক রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভগাত্রে হেলান দিয়া নক্ষত্রখচিত চন্দ্রালোকবিভাসিত আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া, শাহজাদা খসরু নিবিষ্ট চিত্তে কি ভাবিতেছেন।

আমিরা, পিছন হইতে বলিল—"শাহজাদা! বাঁদীর তস্‌লীম গ্রহণ করুন।"

খসরুর চমক ভাঙ্গিল। তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন—আমিরা।

খসরু একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"কি মনে করিয়া এত রাত্রে আসিয়াছিস্ আমিরা?"

আমিরা। শাহজাদী বেগম আপনাকে সেলাম দিয়াছেন!

খসরু। রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—এখনও তোর বেগম জাগিয়া আছেন? কারণ কি?

আমিরা বলিল—"কারণ কি—এ বাঁদী তাহা ত জানে না। কিন্তু আপনি এখনও নিদ্রা যান নাই কেন জনাবালি?"

খসরু, পিয়ারার কক্ষেই আসিতেছিলেন। কিন্তু বারান্দার মধ্যপথ পর্য্যন্ত পৌছিয়া, কি ভাবিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাঁহার প্রাণের মধ্য হইতে কে যেন বলিয়া দিল—"যাইও না খসরু! সেই মায়াবিনী পিয়ারার কাছে। এই পিয়ারাই ত তোমার প্রাণে বিষের প্রবাহ ঢালিয়া দিয়াছে! সে আর এখন সেই পূর্ব্বকার শান্তিময়ী স্বর্ণপ্রতিমা নয়। সে নিজে বিষের জ্বালায় জ্বলিতেছে, তোমাকেও জ্বালাইতেছে।"

তাই খসরু, স্তম্ভগাত্রে হেলান দিয়া অতীতের কথা আলোচনা করিতেছিলেন। আর ভাবিতেছিলেন, সুখ—নির্জ্জনতায়। সুখ—মানবের সাহচর্য্য বিহীনতায়। সুখ—স্নেহময়ী প্রকৃতির শ্যামাঞ্চলের মধ্যে। সুখ—চাঁদের কিরণে, পাখীর গানে, নির্ঝরিণীর কলতানে।

সুখ—আকাঙ্খা ও প্রবৃত্তির দমনে, আর কর্ত্তব্যপালনে। আর ঠিক এই সময়েই আমিরা আসিয়া তাঁহার চিন্তাসূত্রটীকে ছিন্ন করিয়া দিল।

শাহজাদা বিমর্ষবদনে আমিরার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। প্লাবনপীড়নে নদীর সঙ্গমস্থলে, ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডের যেমন একটা চঞ্চল অবস্থা হয়, তাহা যেমন একবার একদিকে, অপর বার অন্যদিকে যায়, শাহজাদা খসরুর মনের অবস্থাও তখন ঠিক সেইরূপ।

খসরু ভাবিতেছেন, পিয়ারার নিবাস কক্ষ যে, তাঁহার চক্ষে বাসন্তী ভ্রমরগুঞ্জনময় নিকুঞ্জকানন। সেখানে কত বীণাবাঁশির সাধের রাগ, আর মিশ্রসুর চারিদিকে ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে। সেখানে কত আলো, কত গন্ধভরা ফুল। সেখানে সর্ব্বদাই হাবভাবময় মৃদু লাস্যের মধুর স্ফুরণ। সেখানে সদাই যে চাঁদের আলো। তাঁহার জীবনানন্দদায়িনী পিয়ারা যে কক্ষে বাস করে, তাহা যে তাঁহার চক্ষে স্বর্ণজ্যোতির্ম্ময় বেহেস্ত। হায়! আজ সে বেহেস্ত হইতে সকল সৌন্দর্য্য ঝরিয়া পড়িল কেন? আজ আনন্দ-কাননে শ্মশানের পূতিগন্ধময় ভাব ফুটিয়া উঠিল কেন?

এই সকল কথা মনোমধ্যে আলোচনা করিতে করিতে, খসরু পিয়ারা বেগমের কক্ষ দ্বার সমীপে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন—"পিয়ারাবানু!"

পিয়ারা তখনই দ্রুতবেগে উঠিয়া আসিয়া খসরুর চরণতলে বসিয়া, আর্দ্রনেত্রে মলিনমুখে বলিল—"আমায় মার্জ্জনা কর স্বামিন্! আমি বড় জ্বালায় জ্বলিতেছি! তোমার মুখে হাসি নাই, প্রাণে আনন্দ নাই, কণ্ঠস্বরে সে প্রেমসোহাগভরা পিয়ারা সম্বোধন নাই, তোমার নেত্রের চারি পাশে কি যেন একটা কালিমা পড়িতেছে। ওঃ! আর যে আমার সহ্য হয় না। আমায় মার্জ্জনা কর, আবার বুকে তুলিয়া লও,

আবার তেমনি করিয়া আদরের সহিত সোহাগভরে 'পিয়ারে মেরে' বলিয়া মুখচুম্বন কর! যাঁহাদের রাজ্য, যাহাদের মসনদ্—তাঁহারাই ভোগ করুন। আমাদের তাহাতে লক্ষ্য কেন? তুমি আমার সাত রাজার ধন, তোমায় যখন পাইয়াছি, তখন কিসের অভাব আমার? চল আমরা দুজনেই পিতামহ বাদশাহের নিকট হইতে একটু জাইগীর ভিক্ষা করিয়া, সুদূর দাক্ষিণাত্যে কিম্বা বাঙ্গলায় চলিয়া যাই। তাহা হইলে প্রাণে হয়তো শান্তি পাইব।"

পিয়ারার নলিননেত্র দিয়া অশ্রুপ্রবাহ বহিতেছে দেখিয়া, খসরু আদরভবে পিয়ারাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। অনুশোচনাময় হৃদয়ে, নিজের বস্ত্রপ্রান্তে, তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া—নিকটস্থ এক মখমলমণ্ডিত সোফার উপর বসিয়া বলিলেন—"এখন যাহা বলিলে, এতদিন তাহা বল নাই কেন পিয়ারা?"

পিয়ারা, স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া অনুতপ্তস্বরে বলিল—"বলি নাই কেন, তাহা জানিনা। চারণীর সহিত সাক্ষাতের দিন হইতেই, আমার মনে কেমন একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, যে আমাকে শয়তানে ধরিয়াছে। শয়তানের সে শক্তির বিরুদ্ধে এতদিন ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া, আজ তাহাকে হারাইয়াছি। তাহার কুহকমুক্ত হইয়াছি। শাহজাদা! আমার এ অপরাধের কি মার্জ্জনা নাই?"

খসরু, সহাস্যমুখে অনুশোচনাবিদগ্ধা পিয়ারার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—"এই যে তোমার অপরাধের মার্জ্জনা পিয়ারি! এও কি সম্ভব, তুমি আমার কাছে অপরাধিনী হইবে? আমি অনেকক্ষণ ভাবিয়া একটা মতলব স্থির করিয়াছি। যদি সেটা কার্য্যে পরিণত করিতে

পারি, তাহা হইলে বোধ হয় মানসিংহ ও খাঁ আজিজের কঠোর শক্তির নাগপাশ বন্ধন হইতে আমি মুক্ত হইব। উহারা যেন আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আমার মনের ইচ্ছা, আজ কালের মধ্যে সুবিধা বুঝিয়া আমি ও তুমি, চল পিতামহের নিকট আগরায় যাই। সেখানে গেলে আমাদের কোন ভয়ই নাই।"

পিয়ারা সহাস্যমুখে বলিল—"ভাল! তাহাই কর। আমিও ঠিক ঐ কথা একটু আগে ভাবিতেছিলাম। খোদা তোমার মঙ্গল করুন।"

খসরুর এই প্রস্তাবে পিয়ারার প্রাণের মধ্য হইতে যেন একটা পাষাণের বোঝা নামিয়া গেল। জগৎ আবার তাহার চক্ষে সুখময় হইল।

মানসিংহ আর খাঁ আজিজ, যতটুকু গড়িয়া তুলিয়াছিলেন,—তাসের প্রাসাদের মত পিয়ারা তাহা অঙ্গুলিস্পর্শে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

এইবার আমরা উপন্যাসের কথা চাপা দিয়া, একটু ইতিহাসের কথা বলিব। তাহা হইতে পাঠক কতকগুলি অপ্রকাশিত ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাইবেন ও পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি বুঝিবারও অসুবিধা হইবে না।

শাহজাদা খসরু

বিধির বিধান এমনই বৈচিত্রময় যে আকবরশাহ বাল্যে ও বার্দ্ধক্যে সমান ভাবেই অদৃষ্টহস্তে নিগৃহীত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ—তাঁহার শেষ জীবনের ঘটনাগুলি বড়ই সাংঘাতিক, বড়ই কষ্টকর, বড়ই মর্ম্ম-স্পর্শী। সেগুলি যে কি তাহা পরে প্রকাশ পাইবে?

আমাদের শাস্ত্রে বলে, যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব আর অবিবেকিতা এই চারিটী একত্রিত হইলে মহা অনর্থ উপস্থিত করে। আকবরশাহের উত্তরাধিকারী সুলতান সেলিমের এই চারিটীই একত্রে জুটিয়াছিল। পিতার অত্যধিক প্রশ্রয়, আজীবন সুখবিলাসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ, অতি-রিক্ত পরিমাণে সেরাজী আর অহিফেন সেবন, তাহার উপর কুসঙ্গী-গণের কুপরামর্শ সুলতান সেলিমের মগজ বিগড়াইয়া দিল।

রাজসংসারের চারিজন লোককে সেলিম তাঁহার সাংঘাতিক শত্রু বলিয়া ভাবিতেন। ইহাঁদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মানসিংহ ও আবলফজল। ইহাঁরা দুই জনেই সেলিমকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতেন। সুযোগ পাইলেই দুই জনেই আকবরশাহকে প্রকারান্তরে বুঝাইতেন, সেলিম যেরূপভাবে চলিতেছেন, তাহা হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ সম্রাটের ইজ্জতের উপযুক্ত নহে। সম্রাট সবই জানিতেন, সবই বুঝিতেন, কিন্তু তাঁহার আদরের পুত্র সেলিমকে কোনরূপ কঠোর শাসনের মধ্যে সহসা আনিতে চাহিতেন না।

মানসিংহ—অনেক সময়ে বাদশাহকে পরামর্শ দিয়াছিলেন,—"সুল-তান সেলিমকে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার দায়িত্বপূর্ণ শাসনভার দিয়া পাঠাইয়া দিন, বিগ্রহময় কার্য্যক্ষেত্রে গিয়া নানা কাজে ব্যস্ত থাকিলে, হয়ত তাঁহার মতিগতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে।" বলা বাহুল্য, মানসিংহের এ সুপরামর্শটী বাদশাহ অন্য অর্থে ধরিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার মনে

কেমন একটা সন্দেহ জন্মিয়াছিল,—মানসিংহ, আবলফজল ও আজিজ্ খাঁ—তিন জনেই সুলতানের উপর বিরূপ। কিন্তু শাহজাদা খসরুর প্রতি ইঁহাদের অসীম স্নেহ। সেলিমের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার সময়, ইঁহারা খসরুর কৃতিত্বের কথাটাই বেশী পরিমাণে সম্রাটের কাণে তুলিতেন। এইজন্য সন্দিগ্ধচিত্ত আকবরশাহ, সেলিমকে সুদূর বাঙ্গালায় পাঠাইতে রাজি হন নাই। কিন্তু মানসিংহের ও আবলফজলের এইভাবে পরামর্শদানের কথাটা সেলিমের কাণে যথাসময়ে পৌছিল।

মানসিংহ যে অত বড় হইয়াছিলেন, তাহা আকবরশাহেরই জন্য। আবার ভারতবিজয়ী মানসিংহ না থাকিলে, আকবরশাহও এতবড় রাজ্যের অধিপতি হইতে পারিতেন না। মানসিংহের শক্তি, সাহস ও সামর্থ্যের কথা সবই তিনি জানিতেন। মানসিংহ, সুলতান সেলিমের অতি নিকট আত্মীয়, রাজ্যের একজন প্রধান সেনাপতি। কিন্তু সেলিম ও মানসিংহের মধ্যে যে দারুণ মনোমালিন্য, তাহাও তিনি জানিতেন। এ জন্য বঙ্গদেশে পাঠান-বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, তিনি মানসিংহকেই বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দেন। আর নিজে দাক্ষিণাত্যবিজয়ে যাত্রাকালে, সেলিমকে আজমীরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, রাজপুতানার বিদ্রোহদমনে নিযুক্ত করেন। আর এই ব্যবস্থায় মানসিংহের কূটচাল ব্যর্থ করিয়া দেন।

মানবমাত্রেই ভ্রমের অধীন। তা সম্রাটই হউন, আর যিনিই হউন। আকবরশাহ সেলিমকে বাঙ্গালায় না পাঠাইয়া, আজমীরের শাসনকর্ত্তা করিয়া একটা মহা ভ্রম করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, মহারাণা প্রতাপের উত্তরাধিকারী রাণা অমরসিংহকে দমন করিতে পাইলেই, সেলিমের সমরক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও সুযোগাভাবে বিলাসে

অনাসক্তি আসিতে পারে। তাহার উপর বিজয়লাভের যশোগৌরব ত আছেই। এই সমরকুশল দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত নৃপতিকে বিধ্বস্ত করার যে গৌরব, পুত্রকে তাহা অর্জ্জনের সুবিধা দিবার জন্যই আকবরশাহ এই ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁহার এ ভ্রান্তিময় কল্পনাপ্রেরিত আশা সমূলে চূর্ণ হইয়াছিল।

পিতার অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া সেলিম ইচ্ছার বিরুদ্ধে আজমীরে আসিলেন। আরাবল্লীর প্রিয় সন্তান শক্তিমান রাজপুতের সহিত যুদ্ধ, ঠিক যেন আগুন লইয়া খেলা করা। এ আগুন নিভিবার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। রাজপুতানার ভীষণ সমরের যবনিকাপতন করিতে হইলে, দীর্ঘ সময়ের, প্রচুর অর্থের ও কষ্ট সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। সেলিম পিতার নিকট বাহানা ধরিলেন—আরও অর্থ চাই, প্রচুর সেনা চাই। সম্রাট পুত্রের এ প্রার্থনাও পূর্ণ করিলেন। অপরিমিত সেনাবলের অধিনায়ক হইয়া সেলিম আরও শক্তিশালী হইলেন। ইহাই আকবরের সেলিম সম্বন্ধে—দ্বিতীয় ভ্রম।

কুচক্রী পার্শ্বচরেরা এই সময়ে সেলিমের মনে বিদ্রোহবাসনা অঙ্কুরিত করিয়া দিল। তাঁহারা তাঁহাকে বুঝাইল—সাম্রাজ্যের অধিকাংশ সেনা এখন বাঙ্গালায় আর দক্ষিণাত্যে। সামান্য চেষ্টাতেই তিনি হিন্দুস্থানের অর্দ্ধাংশ তাঁহার পিতার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইতে পারেন। তাহাদের এই কথাটা সেলিমের মনেও লাগিল। আর এক অশুভমুহূর্ত্তে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হইল। সম্রাট এই সময়ে সুদূর দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে ব্যস্ত।

কালক্ষয় না করিয়া, সুলতান সেলিম, আজমীর হইতে আগরার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বাদশাহের অনুপস্থিতির সুযোগে আগরার

রাজকোষ হস্তগত করাই তাঁহার আন্তরিক উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁহার সে উদ্দেশ্য বিফল হইল। আগরা দুর্গে তখনও যথেষ্ট সেনা ছিল। আকবর-শাহ এক যোগ্যতম কর্ম্মচারির হস্তে এই দুর্গ রাজকোষ ও নগর রক্ষার ভার দিয়া গিয়াছিলেন। তবুও সুলতান সসৈন্যে যমুনা পার হইলেন।

সুলতান সসৈন্যে আসিতেছেন শুনিয়া, দুর্গাধিপতি কুলিজ খাঁ দুর্গ হইতে বাহির হইয়া সেলিমের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তাঁহাকে বুঝাইলেন, আগরা রাজকোষে এমন কিছু নাই—যাহার জন্য সুলতান অসংখ্য সেনাবল ক্ষয় করিতে পারেন। যদি শক্তিসঞ্চয় আর অর্থসঞ্চয় করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তিনি ইলাহাবাদ দুর্গ দখল করুন। বিহার ও অযোধ্যা প্রদেশ এখন অরক্ষিত। তাহাও তিনি অতি সহজে করায়ত্ত করিতে পারেন। সম্রাট সংবাদ পাঠাইয়াছেন, দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া অসংখ্য সেনাবল সঙ্গে, তিনি আগরায় ফিরিতেছিন। এ সময়ে শত্রুরূপে আগরায় অবস্থান, সুলতানের পক্ষে নিরাপদ ও যুক্তিযুক্ত নহে।

দুর্গরক্ষক কুলিজ খাঁকে সেলিম খুব ভালরূপেই চিনিতেন। তাঁহার শক্তিসামর্থ্যের কথাও জানিতেন। তিনি তাহাকে মিত্র বলিয়াই ভাবিতেন। সুতরাং তাঁহার এই পরামর্শ খুবই সমীচিন ভাবিয়া, তিনি ইলাহাবাদের পথ ধরিলেন। অযোধ্যা ও বিহারের অধিকাংশ ভূভাগ এই সময়ে তাঁহার করায়ত্ব হইল। ইলাহাবাদ দুর্গপ্রাকারে তাঁহার নামাঙ্কিত মোগল পতাকা উড়িল। আর তিনি স্বনামে মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া, দুষ্টবুদ্ধিবশে তাহা সম্রাটকে উপহাররূপে পাঠাইয়া দিলেন।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যজয়ী সম্রাট, বিজয়কেতন উড্ডীয়মান করিয়া, আগরার পথ ধরিয়াছেন। সেলিমের নামাঙ্কিত মুদ্রা পথিমধ্যেই তাঁহার

হস্তগত হইল। এই মুদ্রাগুলিই তাহার অকৃতজ্ঞ পুত্রের বিদ্রোহের জ্বলন্ত প্রমাণ!

সম্রাট ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। এক হিন্দুস্থানে দুইজন সম্রাট থাকিতে পারে না। বিদ্রোহী পুত্রকে শিক্ষা দিবার জন্য, সম্রাট সসৈন্যে ইলাহাবাদে যাইবার সংকল্প করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণে আবার পুত্রস্নেহ উথলিয়া উঠিল। তিনি পুত্রকে তিরস্কার করিয়া পত্র লিখিলেন—"কত শক্তি সেলিম তোমার, যে তুমি হিন্দুস্থানের মালেক, তোমার পিতা আকবরশাহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পার? যাহা করিয়াছ, তাহা বালকের চাপল্য বই আর কিছুই নয়—তোমার স্নেহময় পিতৃচক্ষে এ অপরাধ মার্জ্জনার যোগ্য। তোমার কুসঙ্গীদের পত্রপাঠ বিদায় করিয়া দাও। এখনও নিজের মতিগতি সংশোধন কর। কতদিন আর আমি—সেলিম! সিংহাসন ত তোমারই। তবে এ দুর্মতি কেন? এখনও আমার স্নেহময় বক্ষ তোমায় মার্জ্জনাপূর্ণ আলিঙ্গনদানে প্রস্তুত। আমার কোষনিবদ্ধ অসি কখনই তোমার বিরুদ্ধে উন্মোচিত হইবে না। যদি তোমার অনুষ্ঠিত এই ঘৃণিতকার্য্যের জন্য একটুও অনুতপ্ত হইয়া থাক, তোমার মহাভ্রম বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে এই পত্র প্রাপ্তি মাত্রেই আগরায় চলিয়া আসিবে।"

পিতার এই পত্রখানি পাইয়া, সেলিম যথেষ্ট অনুতপ্ত হইলেন। তাহার মনেও অনেকটা সাহস জন্মিল। তিনি ভাবিলেন,—হয়ত উদারপ্রাণ স্নেহময় পিতা, চির করুণাময় ভারত সম্রাট আমাকে মার্জ্জনা করিয়াছেন। পিতা আর কতদিনই বা এ সংসারে থাকিবেন? তাঁহার দেহান্তের পর এ সিংহাসন ত আমারই। অতি হতভাগ্য সন্তান আমি, বংশকুলের

কলঙ্ক আমি, যে এমন মার্জ্জনাশীল, স্নেহময় পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবার চেষ্টা করিতেছিলাম ?

সেলিমের দুষ্টমতি পার্শ্বচরদের কর্ণে, সেলিমের এই আত্মসমর্পণের কথা উঠিল। যতদিন শাহজাদা তাহাদের ছলনাচক্রে, মোহিনীমন্ত্রে ভুলিয়া থাকেন, ততদিন তাহাদের বৃহস্পতির দশা। এই সব কুটচক্রীরা সুলতানকে বুঝাইল, "অমন কাজও করিবেন না—হুজুবালি! কোনও রাজবিদ্রোহীকে আকবরশাহ কখনও মার্জ্জনা করেন নাই। আপনি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিতে গেলে নিশ্চয়ই বন্দী হইবেন। সিংহাসন আপনার পুত্র খসরুর হইবে। যদি নিতান্তই যাইতে চান, তাহা হইলে প্রচুর সৈন্যবল সঙ্গে লউন। আমরা আপনার বান্দার বান্দা, আপনাকে উপদেশ দিই এমন কি ক্ষমতা আমাদের! তবে জ্ঞানসত্ত্বে নিমকহারামী করিব না।"

অব্যবস্থিতচিত্ত, তোষামোদতুষ্ট, ভ্রমমুগ্ধ, সুলতান সেলিম কথাটা ঠিকই বুঝিয়া গেলেন। ইলাহাবাদ হইতে প্রচুর সেনাবল সঙ্গে, তিনি এটোয়ায় আসিয়া পৌছিলেন। সম্রাটের কর্ণে সংবাদ পৌছিল, অগণ্য বাহিনী লইয়া, সেলিম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। তিনি কালক্ষয় না করিয়া সেলিমকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"অপরিমেয় সেনাবল সঙ্গে লইয়া চাঘ্‌টাই-বংশের কোন রাজপুত্রই রাজ্যেশ্বরের সহিত এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ করিতে আসেন নাই। সামান্য শরীররক্ষী সেনা ও দুই চারিজন বিশ্বস্ত পার্শ্বচর লইয়া, আগরার দরবারে হাজির হইও। ইহাতে যদি অসুবিধা বোধ কর, তাহাহইলে ইলাহাবাদ ছাড়িয়া আসিবার কোন প্রয়োজনই তোমার এখন নাই।"

এই পত্র পাইয়া সুলতান সেলিম শেষোক্ত শ্রেয়ঃ পন্থাই অবলম্বন করিলেন। আর এই সঙ্গে, তাঁহার অবিমৃশ্যকারিতার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া, সম্রাটের নিকট একখানি পত্রও পাঠাইয়া দিলেন।

এই বশ্যতাস্বীকার, এই অনুতাপ, সুফল প্রসব করিল। সম্রাট ইহার উত্তরে সেলিমকে বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত করিয়া, একখানি রাজকীয় সনন্দ পাঠাইয়া দিলেন। অপরাধের পরিবর্ত্তে মার্জ্জনা, ক্রোধের পরিবর্ত্তে স্নেহ, কারাগারের পরিবর্ত্তে দুইটী প্রদেশের সার্ব্বভৌমিক আধিপত্য লাভ করিয়া, সেলিম—পিতার ক্ষমাশীল হৃদয়ের মহত্বের পরিমাণ উপলব্ধি করিলেন। কিছু দিনের জন্য পিতাপুত্রের মিলন হইল।

কিন্তু সেলিমের পার্শ্বচরগণ ইহাতেও নিষ্ক্রিয় রহিল না। তাহাদের মধ্যে একজন আবলফজলের হস্তে ভয়ানক নিগৃহীত হইয়া, সেলিমের নিকট আশ্রয় লইয়াছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই কুচক্রী পার্শ্বচরকে সেলিমও খুব বিশ্বাস করিতেন। সে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল—"মানসিংহ সুদূর বাঙ্গলা দেশে বিদ্রোহ দমনে গিয়াছেন। ফিরিবার সম্ভাবনা তাঁহার খুব কম। তিনিতো সম্রাটের বন্ধু নহেন, তাঁহার আজ্ঞাধীন কর্ম্মচারী মাত্র। কিন্তু এই আবলফজল সম্রাটের পরামর্শদাতা ও সুহৃৎ। আবলফজলকে ইহলোক হইতে এই অবসরে সরাইতে পারিলে, কাজটা অনেক অগ্রসর হইয়া যায়। আমরা সংবাদ পাইয়াছি—সম্রাট তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য হইতে তলব করিয়াছেন। নিশ্চয়ই আগরা সিংহাসনের উত্তরাধিকার ব্যাপারের সম্বন্ধে কোন কিছু জরুর পরামর্শ জন্য। যে কোন উপায়ে হোক, আবলফজলকে হত্যা করা চাই। এই সুযোগে পথিমধ্যে তাহাকে নিহত করিতে পারিলে, লোকে বুঝিবে—দস্যু হস্তে তাহার জীবন গিয়াছে।"

পরামর্শটী সেলিমের মনের মত হইল। তাঁহার মনে বরাবরই একটা দৃঢ়বিশ্বাস ছিল—সম্রাটের প্রধান পার্শ্বচর এই আবলফজলই তাঁহার ঘোর শত্রু। খসরুকে সিংহাসনে বসাইবার ষড়যন্ত্র ব্যাপারে একজন প্রধান নেতা, আর মহারাজ মানসিংহের দক্ষিণ হস্ত। তারপর আবুলফজল মোগল সাম্রাজ্যের একজন সম্ভ্রান্ত ওমরাহ, সেনাপতি অথচ সম্রাটের সুহৃৎ ও পার্শ্বচর। তাঁহাকে হত্যা করিতে হইলে খুব সাবধানেই কাজ করিতে হইবে।

শয়তান—সুলতান সেলিমের হৃদয়ে আসুরিক শক্তি আনিয়া দিল। বিবেক, কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম, ন্যায়, ভুলিয়া তিনি তাঁহার প্রিয় মিত্র বুঁদেলা রাজ বীরসিংহ দেবের সহায়তায় আবলফজলকে হত্যা করাইলেন। আর যথা সময়ে আবলফজলের ছিন্ন মুণ্ড ইলাহবাদে আসিয়া পৌছিল।

আগরার রাজপ্রাসাদে, আমীরওমরাহদের কর্ণে আবলফজলের হত্যা সংবাদ পৌছিবামাত্রই, তাঁহারা বড়ই ভয়চকিত হইয়া উঠিলেন। সম্রাটকে এ সংবাদ জানাইতে গেলে ত কাহারও নিস্তার থাকিবে না।

সম্রাটকে এই দুঃসংবাদ জানাইবার জন্য, প্রধান ও পদস্থ ওমরাহবর্গ এক নূতন পন্থা বাহির করিলেন। মোগল-রাজবংশের কোন শাহজাদার মৃত্যু সংবাদ সম্রাটকে জানাইবার প্রয়োজন হইলে, তাঁহার উকীলের দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে, একখানি রেশমী রুমাল জড়াইয়া সম্রাটের সম্মুখে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। এক্ষেত্রে আবলফজলের উকীলকে সম্রাটের নিকট ঐ ভাবেই পাঠান হইল। সম্রাট তখনই সমস্ত ব্যাপার বুঝিলেন।

ইহার পর কয়েক দিন, আকবরশাহ প্রিয়বন্ধু আবলফজলের শোকে মূহ্যমান হইয়া রহিলেন। শোকদুঃখে অবিচলিত, সম্রাটের চক্ষে কেহ
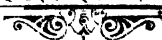
কখনও অশ্রুপ্রবাহ দেখে নাই—এবার তাঁহার সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া বন্যা বহিল। যখন রাজদূত আসাদ খাঁ, সম্রাটের প্রিয়বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ সবিস্তারে জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিতেছিল—তাহা শুনিয়া আকবরশাহ শোকোচ্ছাসপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"হায়! সেলিম! সম্রাট হইবার ইচ্ছা যদি তোমার এতই প্রবল হইয়াছিল, তাহা হইলে আবলফজলকে এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে ইহলোক হইতে না সরাইয়া, তোমার পিতাকে হত্যা করিলে না কেন? তাহাতে ত অতি সহজেই তোমার আশা পূর্ণ হইত।"

আবলফজলের অকালমৃত্যুর এই ব্যাপারে সম্রাট, সুলতান সেলিমের উপর বড়ই বিরক্ত হইলেন। আর এই বিরক্তির পরিণাম, অতি ভয়ানক ফলপ্রসব করিবে দেখিয়া, এক মহীয়সী মহিলা পিতাপুত্রের মনোমালিন্য দূর করিবার জন্য, এই ক্ষেত্রে মধ্যস্থরূপে দেখা দিলেন। ইনি সুলতানা সেলিমা বেগম। আকবরশাহের অন্যতম মহিষী। সুলতান সেলিমের মাতৃবিয়োগের পর হইতে ইনিই তাঁহার মাতৃস্থানীয়া হইয়াছিলেন।

সুলতানার চেষ্টায়, পিতাপুত্রে আবার মিলন হইল। আকবর—পুত্রের সহিত এরূপ স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিতে লাগিলেন—তাহা দেখিয়া কেহই বুঝিতে পারিল না, যে পিতাপুত্রে একটা মনান্তর উপস্থিত হইয়াছিল।

যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে, কুসঙ্গীদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিলে, পুত্র ক্রমশঃ কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারেন, এই ভাবিয়া আকবরশাহ পুনরায় সুলতান সেলিমকে উদয়পুরের রাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করিতে আদেশ করিলেন। সুখবিলাসমগ্ন সুলতান এবারেও পূর্ব্বের ন্যায় আপত্তিকর কারণসমূহ উপস্থিত করায়, সম্রাট তাঁহাকে পুনরায় ইলাহা-

বাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সম্মতি দিলেন। সেলিম—ইলাহাবাদে ফিরিয়া আসিয়া আবার পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলেন। কুসঙ্গীগণ আবার তাঁহার চারিদিক বেষ্টন করিল। আবার সেরাজী, আরক ও অহিফেনের পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার চলিল। দিনে দিনে সেলিম অধঃপতনের নিম্নস্তরে নামিতে লাগিলেন। আর ইলাহাবাদে আসিয়া সুলতান যাহা কিছু করিতে লাগিলেন, তাহার সকল সংবাদই সম্রাটের নিয়োজিত গুপ্ত প্রণিধি তাঁহার কর্ণগোচর করিল।

বার্দ্ধক্যপীড়িত, শোকতাপজর্জ্জরিত, সম্রাট দেখিলেন—কেবলমাত্র মিষ্ট কথায় আর চলিবে না, স্নেহের আবরণে অন্তরের জ্বলন্ত ক্রোধকে আচ্ছন্ন রাখিলে—তাঁহার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারির সম্যক অধঃপতন ঘটিবে। তাঁহার গুপ্তপ্রণিধি—তাঁহাকে এমন একটা গূহ্য সংবাদ জানাইল, যাহাতে তিনি বুঝিলেন, যে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া সেলিমকে ভয়প্রদর্শন না করিলে, কিছুতেই তিনি এই অবাধ্যপুত্রকে বশে আনিতে পারিবেন না।

অনন্যোপায় হইয়া, সম্রাট বিদ্রোহিপুত্রকে দমন করিবার জন্য ইলাহাবাদের পথ ধরিলেন। বৃহৎ বাহিনীদল সমেত যমুনা পার হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পরই, সম্রাট সংবাদ পাইলেন—যে তাঁহার জননী হামিদাবানু বেগম সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত।

আকবরশাহ বড় মাতৃভক্ত ছিলেন। জননীকে তিনি সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে পূজা করিতেন। যাঁর স্তন্য পান করিয়া আজ তিনি মহাশক্তিমান সম্রাট, সেই জননীর শেষ মূহুর্ত্ত উপস্থিত। আকবর তখনই ইলাহাবাদের পথ ত্যাগ করিয়া, পুনরায় আগরায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কিছুতেই জননীকে সে যাত্রা বাঁচাইতে পারিলেন না। মাতৃশোকার্ত্ত বালকের মত

অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে করিতে, মাতার পবিত্র দেহের সংকারের জন্য, নগ্নপদে—শূন্যমস্তকে শবাধার স্কন্ধে লইয়া, সম্রাট সমাধি-ক্ষেত্রের দিকে চলিলেন। অসংখ্য আমীরওমরাহ নগ্নপদে তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইল। পিপীলিকাসারির মত অগণ্য সেনা আগরার রাজপথের দুইধারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া, মৃতা সম্রাটজননীর প্রতি সম্মান দেখাইল। তৎপরে এই বাহিনী দল দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধিক্ষেত্রের পথ ধরিল। যথাসময়ে সম্রাট মাতৃদেহ সমাধিস্থ করিয়া আগরার প্রাসাদে ফিরিলেন। সমস্ত রাজসভাসদগণ শোকচিহ্ন পরিধান করিলেন। প্রাত্যাহিক দরবার ও রাজকার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। সম্রাট সমস্ত সুখবিলাস, মণিমুক্তাহার ও অন্যান্য অঙ্গশোভন দ্রব্যের ব্যবহার ত্যাগ করিয়া, শোকাচ্ছন্ন চিত্তে দিন কাটাইতে লাগিলেন। সেলিমের বিদ্রোহ, অবাধ্যতা, তাহাকে শাসন চেষ্টা, সবই তাঁহার চিত্তক্ষেত্র হইতে কিছুদিনের জন্য অপসৃত হইল।

আর তাঁহার বিদ্রোহী পুত্র সুলতান সেলিম, ইলাহাবাদে বসিয়া পিতামহীর মৃত্যু সংবাদ ও পিতার শোচনীয় অবস্থার কথা শুনি-লেন। এইবার অবাধ্যতার প্রবল বাঁধ ভাঙ্গিল। এই প্রবল শোক বন্যার ভীষণ প্রবাহে, সকল অবাধ্যতা, সকল অশিষ্টতা, শয়তানের প্রচ্ছন্ন শক্তি, সবই তাহার চিত্তক্ষেত্র হইতে সরিয়া গেল। পিতামহীর বড়ই আদরের ধন যে—তিনি।

অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক ভাবিয়া সুলতান সেলিম আগরায় আসিয়া পৌছিলেন। পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার চরণে ধরিয়া মার্জ্জনা চাহিলেন। পিতামহীর মৃত্যুর জন্য অশ্রুপ্রবাহে বক্ষসিক্ত

করিলেন। এই অশ্রুপ্রবাহ স্রোতে, সম্রাটের ক্রোধ, বিরাগ, উপেক্ষা সবই ভাসিয়া গেল। এক দৈবপ্রেরিত ঘটনার মধ্য দিয়া আবার পিতা পুত্রে মিলন হইল।

যখন লোকের দুঃখের দিন আসে, তখন কেহই তাহার অশ্রুময় স্রোতে বাধা দিতে পারে না। আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী হিন্দুস্থানের সম্রাট, শাহ আকবর ত এই দুনিয়ার সম্রাট। কিন্তু তাঁহার উপরে, সুদূর বিমানান্তরালে, আর একজন দীন্ ও দুনিয়ার সম্রাট আছেন। আকবরের গৌরবের, সুখের, আনন্দের, দর্পের দিন শেষ হইয়া আসিতেছিল। সিংহাসনাধিকারী পুত্রের অবাধ্যতা, সোদরোরম সুহৃৎ আবলফজলের শোচনীয় মৃত্যু, দারুণ মাতৃবিয়োগ প্রভৃতি কষ্টকর ঘটনার পর, ঠিক এই সময়ে তাঁহার প্রিয়পুত্র দানিয়ালের মৃত্যু ঘটিল।

এইবার পাষাণ বিদীর্ণ হইল! নানাদিক হইতে দুঃসহনীয় শোকের তাড়নে, আকবর শাহ একাবারে ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িলেন। মোরাদ গেল, দানিয়াল গেল—রহিল কেবলমাত্র সেলিম। সম্রাটের ষোল আনা স্নেহ, এই জন্য সেলিমের উপর গিয়া পড়িল।

এই সকল দুর্ভাগ্য সূচনাকারী ঘটনার পর, এমন আর একটী ব্যাপার ঘটিল, যাহার পরিণাম ফলে আকবরশাহ ভগ্নস্বাস্থ্য, ভগ্নোৎসাহ হইয়া, রোগশয্যা আশ্রয় করিলেন। তাহা কি, পরের পরিচ্ছেদে বলিতেছি।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্রমাগতঃ দুর্ভাগ্যপীড়নে, আকবরশাহ চিত্তবল হারাইলেন। এজন্য তিনি তাঁহার শেষ জীবনে অনেকটা খেয়ালের অধীন হইয়া পড়িলেন। একদিন এই খেয়ালের বশে, তিনি হুকুম দিলেন—"হাতীর লড়াই দেখিব। তাহার বন্দোবস্ত কর। শাহজাদাদের হাতীই কেবল লড়িবে।"

হাতীর লড়াই, বাঘের লড়াই, চিড়িয়ার লড়াই—আকবরশাহের চির জীবনের সাধের আমোদ। কবুতর, বাজ ও শিকরীর কথা ছাড়িয়া দিই, ইতিহাসে এ কথাও আছে, যে আকবরশাহ উর্ণনাভের লড়াইএর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আর তাহা দেখিয়া, একটা খুব আনন্দ পাইতেন।

ঘটনাচক্রের প্রেরণায়, এই সময়ে শাহজাদা খসরু, পিয়ারাবানুকে লইয়া আগরায় পৌছিয়াছেন। খসরুর এক লড়ায়ে হাতি ছিল, তাহার নাম "অপরূপ।" সমসাময়িক অন্য এক ঐতিহাসিক খসরুর এই হাতিটাকে "চঞ্চল" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আর সুলতান সেলিমের এক দুর্দ্দান্ত লড়ায়ে হাতী ছিল। তাহার নাম "গিরানবার।"

আকবরশাহ খেয়ালের বশে এক নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিতে গিয়াও আবার একটা ভ্রম করিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে খসরু ও সুলতান সেলিমের হাতী দুইটী লড়িবার জন্য আদিষ্ট হইল।

এই হাতীর লড়াই এক অতি ভয়ানক ব্যাপার! অঙ্কুশাঘাতে উন্মত্ত, মত্ত মাতঙ্গ একবার ক্ষেপিয়া গেলে, আর রক্ষা নাই। যেটার শক্তি বেশী, সে তাহার প্রতিদ্বন্দী হাতিটার প্রাণবধ করিবেই করিবে। এই সমস্ত সমর-কুঞ্জর অতি সুশিক্ষিত। আর তাদের মূল্যও খুব বেশী।

হাতীর লড়াইয়ে আর একটা নিয়ম এই—একটা তৃতীয় হাতীকে এই সংগ্রামস্থলে সাহায্যকারী রূপে উপস্থিত রাখা। যখন কোন সমরজয়ী হাতী, তাহার প্রতিদ্বন্দী হাতিটাকে শুণ্ডাঘাতে বিদীর্ণ করিয়া, তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিত, তখন এই তৃতীয় হাতিটী প্রতিদ্বন্দীদ্বয়ের মাঝখানে পড়িয়া, তাহাদের পৃথক করিয়া দিত। এই মীমাংসাকারী হস্তীর আখ্যা ছিল, "তবঞ্চা।"

সম্মুখে প্রাচীর বেষ্টিত বিস্তৃত রণ-প্রাঙ্গণ। তাহার উত্তর দিকে কতকগুলি মর্ম্মর ও রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত বসিবার আসন। আসন গুলির উপর স্বর্ণখচিত চন্দ্রাতপ। যথাসময়ে একটী চন্দ্রাতপতলে সম্রাট, ও তাঁহার পার্শ্বে কিশোরবয়স্ক শাহজাদা খুরম (পরে শাহজাহান) আসনাধিকার করিলেন। সম্রাটের বামে ও দক্ষিণে আমীর ওমরাহদের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল।

সম্রাটের আদেশে লড়াই আরম্ভ হইল। সুলতান সেলিমের 'জিরানবার' বড়ই শক্তিশালী হাতী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার প্রতিদ্বন্দী ছিল—এই অপরূপ বা চঞ্চল। জিরানবার সবলে চঞ্চলকে আক্রমণ করিল। রণোন্মত্ত গজরাজদ্বয়ের বৃংহণধ্বনিতে একটা মহা হুলুস্থুল উপস্থিত হইল। কে হারে কে জিতে, ইহাই তখনকার সমস্যা।

'অপরূপে'র অবস্থা শোচনীয় হওয়ায়, খসরু ঘোড়া ছুটাইয়া তাঁহার হাতীর নিকট চলিয়া গেলেন। এই সময়ে সম্রাটের নিজস্ব 'তবঞ্চা' হাতিটীকে, লড়াই থামাইবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

মাহুতের ইঙ্গিতে এই তবঞ্চা, জিরানবাব ও অপরূপের মধ্যস্থলে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের আলাহিদা করিয়া দিবার জন্য সবেগে অগ্রসর হইল। এমন সময়ে সেলিমের দলের লোকেরা তবঞ্চাকে প্রস্তরখণ্ড ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। সেলিমের মনের ইচ্ছা নয়, যে তাঁহার হাতীটী হারিয়া যায়—আর খসরুর হাতী জয়ী হয়।

আকবরশাহ ক্রীড়ামঞ্চ হইতে সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া, বড়ই বিরক্ত হইলেন। সকল শ্রেণীর লড়াইএর একটা বিধিসঙ্গত নিয়ম আছে। হাতীর লড়াই সম্বন্ধেও তাই ছিল। সেলিমের দলের লোক তবঞ্চাকে প্রস্তর খণ্ড ছুঁড়িয়া মারিয়াছে, এটা বে-আইনী কাজ। সম্রাট, শাহজাদা খুরমকে বলিলেন—"তুমি নীচে নামিয়া যাও। তোমার পিতাকে গিয়া বল, কেন তিনি এই নিয়ম বিগর্হিত কাজ করিতেছেন?" খুরম—পিতামহের আদেশানুসারে প্রাঙ্গণমধ্যে আসিয়া অশ্বারূঢ় পিতাকে বলিলেন—"সম্রাট এইভাবে তবঞ্চাকে পাথর ছুঁড়িয়া মারার জন্য বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন।" সেলিম—পুত্রকে বলিয়া দিলেন—"তোমার পিতামহকে গিয়া বলগে, আমি আমার ভৃত্যদের এরূপ কোন আদেশ দিই নাই। খসরুর অনুচরেরাই পাথর ছুড়িয়া এই গোলমাল করিয়াছে।"

তখনও রণোন্মত্ত হস্তীদ্বয়, রুধিরাপ্লুত দেহে পরস্পরকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিতেছে। তবঞ্চার চেষ্টা বিফল হইলে খড়ের আগুন জ্বালিয়া, জানোয়ার দুটাকে পৃথক করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইল।[৭] কিন্তু

তাহাতে কোন ফল হইল না। অপরূপ ও সেই তবঞ্চা হাতিটা জ্বালার ও উত্তেজনার চোটে রুধিরাপ্লুত দেহে, সবেগে যমুনায় ঝাঁপ দিল।

যৌবন মদোন্মত্ত খসরু, তাহার শিক্ষিত যুদ্ধহস্তীর এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া, সেই প্রকাশ্য রণাঙ্গণে, সর্ব্বসমক্ষে পিতার সহিত অতি রুক্ষ ভাবে বচসা আরম্ভ করিলেন। উপর হইতে আকবরশাহ স্বকর্ণে খসরুর এই দুর্ব্ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া, বিরক্তিপূর্ণ চিত্তে আসনত্যাগ করিলেন। হাতির লড়াইএর পরিণামে ভীষণ আগুণ জ্বলিয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবিধ বৈচিত্রময় ঘটনাস্রোতের মধ্যে পড়িয়া, আমরা এ পর্য্যন্ত পুর্ণিমা ও দুর্জ্জয়সিংহ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অবকাশ পাই নাই।

মানসিংহ, দুর্জ্জয়সিংহের কারাবাসের কষ্টসমূহের অবসানজন্য, সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দুইমাস অতীত হইয়া গেল, তাহার মুক্তির কোন ব্যবস্থাই করিলেন না। তারপর তিনি সহসা আগরায় চলিয়া গেলেন। পুর্ণিমা তাঁহাকে আর কোন কথা বলিবার অবসর পাইল না।

সুখের আশা-প্রতীক্ষায়, এজগতে সকলেই ত দিন গুণিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু কয়জনের আশা পূর্ণ হয়? পুর্ণিমা—দুর্জ্জয়সিংহের মুক্তির আশায় দিন কাটায় আর মধ্যেমধ্যে তাহার সহিত দেখা করিয়া আসে। আর প্রতিদিন সন্ধ্যার আরতির পর, মানসিংহের নবপ্রতিষ্ঠিত কালিকা-

মন্দিরে গিয়া, ভবানীর সম্মুখে বসিয়া, অশ্রুপূর্ণনেত্রে—আর্দ্রস্বরে বলে, "আর কেন আমায় যন্ত্রণা দাও মা! আমার মনের আশা পূর্ণ কর। আর ত এ ভাবে কাঁদিতে পারি না, ভাবিতে পারি না, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে পারি না। নারীজন্ম যদি দিয়াছিলি মা, তবে স্বামীর বক্ষ হইতে আমাকে বিচ্যুত করিলি কেন? তুই তো জগন্মাতা—আমি কি তোর জগৎছাড়া জননী? একটা উপকার কর্ না মা আমায়। আমার স্মৃতি ডুবাইয়া দে মা, আমি সব ভুলিয়া যাই।"

অম্বরসহর হইতে রতনগড় দুই ক্রোশের কম নয়। কিন্তু সে ত নিত্য এতটা পথযাতায়াত করিতে পারেনা!

বিয়োগবিধুরা অসহিষ্ণু পূর্ণিমা এক পরাহ্নে আবার রতনগড়ে গেল। কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিল—"দুর্জ্জয়সিংহ কারাগার হইতে পলাইয়াছে।"

পূর্ণিমা কথাটা শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল। তারপর কারা-রক্ষককে অনেক মিনতি করিয়া, একবার সেই কারাকক্ষে গেল। দেখিল পিঞ্জরশূন্য, পক্ষী পলাইয়াছে।" কিন্তু তাহার মনে কেমন একটা সন্দেহ হইল, দুর্জ্জয় পলায় নাই। নিশ্চয়ই মানসিংহ তাহাকে ইহলোক হইতে অপসৃত করিয়াছেন। এই দুর্জ্জয়সিংহ সেলিমের বিরুদ্ধে পরামর্শের সকল কথাই জানে। মানসিংহের গোপনীয় পত্র সমূহের একমাত্র বাহক সে। গুহামধ্যে খসরুকে হত্যাকবার অভিযোগ কেবল একটা ছলনামাত্র।

পূর্ণিমা, সেই ক্ষুদ্র দুর্গমধ্যস্থ এক নির্জ্জন স্থানে দাঁড়াইয়া, কত কি ভাবিতে লাগিল। বায়ুতাড়িত কেতনের মত, তাঁহার মনটী সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান। সে একবার ভাবে, দুর্জ্জয়সিংহ দীর্ঘকালব্যাপী অধীনতা সহ্য করিতে না পারিয়া, নিশ্চয়ই হয়তো পালাইয়াছে। আবার

ভাবে, কাপুরুষতা এই বীরশ্রেষ্ঠ দুর্জ্জয়ে কখনই সম্ভব নয়। মানসিংহ নিশ্চয়ই তাঁহাকে বিষ দিয়া হত্যা করিয়াছে।

সে উচ্চৈস্বরে আকুলকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"কোথায় তুমি দুর্জ্জয়সিংহ! আমার জীবনের ধ্রুবতারা, প্রাণের জীবনীশক্তি, নেত্রের জ্যোতি! সত্যই কি বিষে তোমার অপমৃত্যু ঘটিয়াছে? তোমার অশরীরি আত্মা কি আমায় ইঙ্গিতে তোমার হত্যাকারীর নামটী বলিয়া দিতে পারে না?"

এই সময়ে কে যেন একজন তাহার পশ্চাৎ হইতে বলিল—"অশরীরি আত্মা না পারুক, এক শরীরি আত্মা তোমায় বলিয়া দিবে, কে দুর্জ্জয়কে বিষ দিয়াছে।"

ব্যাধস্বরে হরিণী যেমন চকিতভাবে পশ্চাতে দৃষ্টি করে, পূর্ণিমা সেইভাবে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, তাহার সম্মুখে সেই প্রস্ফুট দিবালোকে দাঁড়াইয়া—লাজপতসিংহ। পাঠক বোধ হয়, এই লাজপত সিংহের কথা স্মৃতিপথ বহির্ভূত করেন নাই।

সহসা সম্মুখে ফণাধারী সর্প দেখিলে, পান্থ যেমন সচকিতে সভয়ে দূরে সরিয়া দাঁড়ায়, লাজপতকে তাহার সম্মুখীন হইতে দেখিয়া সে সেই ভাবে চমকিত হইল। লাজপত তাহার অপরাধের জন্য, ইতিপূর্ব্বে পদচ্যুত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে মানসিংহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আবার পূর্ব্বের চাকরীটি পাইয়াছে!

পূর্ণিমা বিরক্তির সহিত বলিল, "তুমি কি আমার সব কথা শুনিয়াছ?"

লাজপত। হাঁ—কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমি দুর্গের বাহিরে কোন কোন প্রয়োজনে যাইতেছিলাম, কিন্তু তোমাকে এই নির্জ্জনস্থানে দেখিতে

পাইয়া, ঐ স্তম্ভপার্শ্বে আত্মগোপন করিয়াছিলাম। আর তোমায় যে দেখা দিলাম, তার কারণ আর কিছুই নয়, তোমার একটু উপকার করিব বলিয়া। তোমার উপর আমি বড়ই অত্যাচার করিয়াছি। তোমার মাতৃকুলের বৃথা কলঙ্ক রটনা করিয়া, আমি মহাপাপ করিয়াছি। আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। পূর্ণিমা! কে—তোমার স্বামী দুর্জয় সিংহকে হত্যা করিয়াছে, তাহা জানিতে চাও কি?

পূর্ণিমা, লাজপতের কথাগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল। সন্দিগ্ধনেত্রে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিবামাত্রই বুঝিল—লাজপত সত্যসত্যই অনুতপ্ত। তাহার চক্ষু দুটি ছলছল করিতেছে।

পূর্ণিমা বলিল—"চাই আমি তার নাম জানিতে, যে বিষপ্রয়োগে আমার স্বামীকে হত্যা করিয়াছে!"

লাজপত একবার চারিদিকে সন্দিগ্ধনেত্রে চাহিয়া বলিল—"অদূরে ঐ স্তম্ভটার আড়ালে চল। এখানে হয়ত অন্য কেহ আসিয়া পড়িতে পারে। ওসব সাংঘাতিক কথা প্রকাশ্য স্থানে হইতে পারে না। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে পূর্ণিমা! যার আদেশে এই সাংঘাতিক কাজ হইয়াছে, তাঁহার অসীম শক্তির তুলনায় তুমি যে অতি সামান্যা।"

কথাটা শুনিয়া পূর্ণিমার মুখখানি ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। সে আত্মসংবরণ করিয়া, কম্পিতস্বরে বলিল—"বুঝিয়াছি কে সে,—যে আমার স্বামীকে হত্যা করিয়াছে। সতীর মর্ম্মজ্বালাময় নিঃশ্বাসে, এই অকালবৈধব্যের মর্ম্মন্তুদ যাতনাসঞ্জাত অভিশাপে, তাহার সর্ব্বনাশ হইবে!"

লাজপত বলিল—"কাহাকে তুমি এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য সন্দেহ করিতেছ পূর্ণিমা?"

পূর্ণিমা—বিস্ফারিত নেত্রে, লাজপতের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"মহারাজ মানসিংহ!"

লাজপত। তুমি ভ্রান্ত! মহারাজ মানসিংহের আদেশে দুর্জ্জয় ইহলোক ত্যাগ করে নাই।

পূর্ণিমা। তবে কে সে?

লাজপত। শাহজাদা খসরু!

পূর্ণিমা। মানসিংহের বন্দীর উপর খসরুর আদেশ চলিবে কেন?

লাজপত। খসরু এখন এই মানসিংহের সর্ব্বস্ব। তাহার ন্যায্য অন্যায্য সকল অনুরোধ রাখিতে, মানসিংহ এখন প্রস্তুত।

পূর্ণিমা। যদি তাই হয়, তুমি যাহা বলিতেছ তাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার প্রমাণ কই!

"জাননা তুমি পূর্ণিমা! আমি ইতিপূর্ব্বেই একদিন দুর্জ্জয়ের চরণে ধরিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিয়া, পুনরায় তাহার মিত্রস্থানীয় হইয়াছিলাম। বহুবার তাহাকে বলিয়াছিলাম—তুমি আমার এই প্রহরীর পরিচ্ছদ পরিয়া নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন কর। আমি তোমার উপর অত্যাচার করিয়া যে পাপার্জ্জন করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করি। কিন্তু যতবারই তাহার নিকট এ প্রস্তাব করিয়াছি, ততবারই সে তাহা উপেক্ষা করিয়াছে। আমাকে বিপদে ফেলিয়া এইভাবে পলায়ন করিতে, সে কোনমতেই সম্মত হয় নাই। এটুকু অবশ্য তার সহজাত মহত্ত্ব। একটু এখানে অপেক্ষা কর। একটী জিনিস, যাহা দুর্জ্জয়সিংহ আমাকে তাহার মৃত্যুকালে বিশ্বাস করিয়া দিয়া গিয়াছে—তাহা তোমায় আনিয়া দেখাইতেছি।"

লাজপতসিংহ তথনই একটী ক্ষুদ্র বারান্দা পার হইয়া তাহার কক্ষ

মধ্যে প্রবেশ করিল। দুর্জ্জয়সিংহের সেই মৃত্যু নিদর্শনটী হাতে লইয়া পূর্ণিমা যেখানে নতমুখে নানা কথা ভাবিতেছিল, ক্ষণকাল পরে সেইখানে আসিল। চারিদিকে আবার সন্ত্রস্তভাবে চাহিয়া—পূর্ণিমার হাতে একটী অঙ্গুরীয়ক দিয়া বলিল,—"দেখ দেখি এ কার অঙ্গুরীয়।"

পূর্ণিমা, সে অঙ্গুরীয়ক দেখিবামাত্রই চিনিল। এটি যে তাহার বিবাহের অঙ্গুরী। শিশোদিয় রাজপুতের ইষ্টদেবতা ভগবান একলিঙ্গের মূর্ত্তি অঙ্কিত এ আংটীটি, তাহার পিতাই যে বিবাহকালে জামাতাকে দান করিয়াছিলেন। দুর্জ্জয়সিংহের মনে একটা বিশ্বাস ছিল, এ অঙ্গুরীয় মন্ত্রপূতঃ। এজন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার সময়েও, সে এ অঙ্গুরীয়কটী পরিয়া যাইত। আর সকল স্থলেই জয়ী হইয়া আসিত।

পূর্ণিমা অঙ্গুরীয়কটী বহুবার নাড়াচাড়া করিয়া, তাহা ভক্তিভরে চুম্বন করিয়া বলিল—"স্বামী! দেবতা! ইষ্ট! আজ তোমার মৃত্যুর প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাইলাম। নিষ্ঠুর সংসারের হৃদয়হীন লোকের অত্যাচারে, অপরের স্বার্থসংগ্রামের কঠোরচক্রে পেষিত হইয়া—যে পরলোকে তুমি প্রস্থান করিয়াছ, সেখানে যাইবার পথও এই পূর্ণিমা জানে। কিন্তু এখন—যাইতেছি না। অনেক কাজ আমার বাকী। যে আজ আমার চোখে এই জল বহাইয়াছে—তাহার চোখের শোণিতময় অশ্রুধারা না দেখিয়া আমি একটুও শান্তি পাইব না।"

সাতপাঁচ ভাবিয়া পূর্ণিমা বলিল, "এই অঙ্গুরীয়কটী এখন আমার কাছে থাক্। ঐটিই ভবিষ্যতে আমার ধ্যানধারণার ও পূজার জিনিস হইবে।"

লাজপত বলিল,—"দুর্জ্জয় ঐটী তোমাকেই দিতে বলিয়াছিল। স্বচ্ছন্দে তুমি উহা লইতে পার।"

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে সূর্য্য ডুবিতেছে। আর অস্তাচলের নীল আবরণের উপব সুদূর দিগান্তরালে খুব একখানা কালো মেঘ উঠিয়াছে। বৃষ্টি আসিবার খুবই সম্ভাবনা।

আকাশের অবস্থা দেখিয়া, পূর্ণিমা একটু ভয় পাইল। কেননা, এই কালসাঁঝির মুখে, তাহাকে দুই তিন ক্রোশ পথ যাইতে হইবে। পূর্ণিমা—লাজপতকে বলিল, "তোমার কৃত এই উপকারের জন্য আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ। আমি তোমার কৃতাপরাধ ভুলিয়া প্রাণেব সহিত তোমায় মার্জ্জনা করিতেছি।"

লাজপত বলিল—"ওসব কথা আব কেন পূর্ণিমা! তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখিবে কি?"

পূর্ণিমা। কি অনুরোধ?

লাজপত। আজ না হয় আমার বাটীতেই থাক। ভয়ানক মেঘ উঠিতেছে। পথে বৃষ্টি আসিলে বড়ই কষ্ট পাইবে। তার উপর তুমি একা। এই অন্ধকার রাত্রে তোমার মত যুবতীর একা যাওয়া ঠিক নয়।

পূর্ণিমা। মেঘ বৃষ্টিতে ভয় আমি করি না। আর এই রাজপুতেব দেশে, রাজপুত যুবতীর কিসের ভয়!

পূর্ণিমা—আর কোন কথা না বলিয়া, দ্রুতপদে দুর্গদ্বাব দিয়া বাহিব হইয়া গেল। আর লাজপত একদৃষ্টে পূর্ণিমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া, একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"হায়! পাষাণী! আমি তোমার জন্য এত কাণ্ড করিলাম, আর তুমি কি না উপেক্ষাব সহিত আমায় পদদলিত করিয়া চলিয়া গেলে! যাও—কিন্তু আমি প্রেতের মত তোমার অনুসরণ করিব।"

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

রূপশালিনী পূর্ণিমা—সেই নৈশান্ধকারের মধ্য দিয়া পথ চলিতেছে। রতনগড় হইতে একটী সোজা পথ সরাসর অম্বরে চলিয়া গিয়াছিল। এ পথ পূর্ণিমার চির পরিচিত। সেই পথই সে ধরিয়াছে।

আকাশের কোলে অন্ধকার। চারি পাশের প্রকৃতিবক্ষে অন্ধকার। আর পূর্ণিমার প্রাণের মধ্যেও অন্ধকার! এ অন্ধকারের তাণ্ডবলীলা অতি বিভীষিকাময়! কিন্তু পূর্ণিমার সেদিকে তিলমাত্র লক্ষ্য নাই।

পূর্ণিমা ভাবিতেছিল—"সত্যই কি দুর্জ্জয়সিংহ পরলোকে! শাহজাদা খসরুই কি তাহার প্রাণহন্তা! না—না—কে যেন আমার প্রাণের মধ্য হইতে বলিয়া দিতেছে—"পূর্ণিমা! তোর দুর্জ্জয় মরে নাই! তোর সীমন্তের সিন্দুর এখন সমুজ্জ্বল। তোর মত সতীসাধ্বীর অকালবৈধব্য কখনই ঘটিতে পারে না।"

কিন্তু তখনই অঙ্গুরীয়ের দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "না—না, আমার হস্তে যে তোমার মৃত্যুর প্রত্যক্ষ নিদর্শন! দুর্জ্জয়! প্রাণাধিক! তাহা হইলে সত্যসত্যই কি তুমি ইহলোকে নাই! সকলের প্রতি তুমি অতি দয়াময় বিধাতা! আমার উপর নিষ্ঠুর হইলে কেন? আমার এ সর্ব্বনাশ করিলে কেন? মৃত্যুই যদি পরপারের

সেতু হয়, তাহা হইলে দাও করুণাময়! আমায় সেই পথই দেখাইয়া। আর যে আমি সহিতে পারি না। আর যে কাঁদিতে পারি না! এস মৃত্যু! এস সখা! জানিনা—তোমার স্পর্শ কত সুখকর, কত শান্তিময়, আমার মত এই জ্বালাময়ী, শান্তিহীনা, অভাগিনীর পক্ষে।”

প্রাণের এইরূপ বিপ্লবময় রোরুদ্যমান অবস্থায় কতকদূর আসিবার পর, পূর্ণিমা—তাহার পশ্চাতে যেন কাহারও পদশব্দ পাইল। সে থমকিয়া দাড়াইল। যদিও তখন বৃষ্টি নাই, মেঘের গর্জ্জন নাই, জোর হাওয়া নাই, তাহা হইলেও সূচীভেদ্য অন্ধকার তাহার আশ-পাশ ব্যাপিয়া ছিল।

আবার পদশব্দ! পূর্ণিমা ভাবিল, হয়তো কোন নিশাচর। কিন্তু নিশাচরের পদশব্দ ত এতটা সাবধানবিন্যস্ত নয়। তবে কি কেহ তাহার অনুসরণ করিতেছে!

পূর্ণিমা স্থির হইয়া এক বৃক্ষতলে দাড়াইল। পূর্ব্বশ্রুত পদশব্দ ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইল। সেই বিরাট অন্ধকার ভেদ করিয়া, এক ছায়ামূর্ত্তি আসিয়া পূর্ণিমার সম্মুখে দাঁড়াইল।

পূর্ণিমা এই অন্ধকারবেষ্টিত আগন্তুককে চিনিতে পারিল না। সে ভয়চকিত চিত্তে, চমকিতস্বরে বলিল—“কে তুমি?”

আগন্তুক পূর্ণিমার সমীপস্থ হইয়া বলিল—“আমায় চিনিতে পারিতেছ না? আমি লাজপত সিংহ!”

পূর্ণিমা। আমার অনুসরণ করিতেছ কেন—লাজপত?

লাজপত। এই অন্ধকার রাত্রে, তোমায় সঙ্গীহীন অবস্থায় বিদায় দিয়া, আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই, তাই আসিয়াছি। আর—আর—তোমায় একটা কথা বলিব বলিয়া।

পূর্ণিমা। তোমার যাহা বলিবার ছিল—তাহাতো দুর্গমধ্যেই বলিতে পারিতে। এতটা কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন কি ছিল?

লাজপত। তাহার সুযোগ পাইলাম কই? ভগবান তোমাকে অতটা রূপ-সম্পদ দিয়াছেন, কিন্তু মানুষের মনের ভাব বুঝিবার শক্তি দেন নাই। কুসুম-কোমলা রমণী হইলেও বুঝিতেছি—তুমি অতি পাষাণী।

পূর্ণিমা। কি বলিতেছ তুমি লাজপত? তুমি না রাজপুত? নারীর ইজ্জত রক্ষা করা, প্রত্যেক রাজপুতের কুলধর্ম্ম! তুমি যাহা বলিলে, তাহা অতি অশিষ্ট কথা!

লাজপত। সত্য—কিন্তু এখন আমি শিষ্টতা ত্যাগ করিয়াছি, ধর্ম্ম ভুলিয়াছি, কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন দিয়াছি, তোমার রূপমোহাকৃষ্ট চিত্ত আমায় বিপথ চালিত করিতেছে। পূর্ণিমা! তুমি কি আমার হইবে না?

পূর্ণিমা কথাটা শুনিয়া অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। তাহার কাছে আত্মরক্ষার যে কোন কিছুই নাই। এ নির্জ্জন স্থানে তাহার সহায়তা করিবার জন্য যে কেহই উপস্থিত নাই। তাহা হইলেও পূর্ণিমা এটুকু বুঝিল এ সংকট ক্ষেত্রে সাহস হারাইলেই তাহার বিপদ ঘটিবে!

পূর্ণিমা বলিল—"লাজপত! কেন রূপের মোহে পড়িয়া, হিন্দুর সর্ব্বস্ব ধন ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিতেছ? তুমি কি জান না—যে আমি হিন্দু বিধবা! আমার এ বৈধব্য সংবাদ ত তুমিই আমাকে দিয়াছ। সতীকে এ ভাবে বিদ্রূপ করিতে নাই, অসম্মানের কথা বলিতে নাই! এ জগতে আরও তো অনেক সম্পর্ক আছে। ভগ্নিরূপে আমি চিরদিন তোমায় ভালবাসিতে পারি। এই মাতৃরূপা ধরায়, মায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে? মাতৃ রূপেও ত আমি তোমায় স্নেহরসে চিরদিন পরিসিক্ত করিয়া রাখিতে

পারি! ছার এ রূপ! কত দিন এ রূপ থাকিবে লাজপত? কোথায় তোমার সে দেবত্ব, কোথায় তোমার সে রাজপুতের মহত্ত্ব! মনে ভাবিও না—এই নির্জ্জন স্থানে, আমাব রক্ষক কেহই নাই। অই অন্ধকার মণ্ডিত নীলাকাশের দিকে একবার চাহিয়া দেখ! বিমানান্তরালেস্থিত অই নীলকান্তমণিনিভ, বিষ্ণুদেবতা আমায় বলিতেছেন—কোন ভয় নাহি তোর।”

লাজপত, পূর্ণিমার এ সব কথায় একটুও দমিল না। কেননা শয়তান তখন তাহার হৃদয়ে পূর্ণরূপে আধিপত্য করিয়াছে! সে বলিল—“পূর্ণিমা! একটা অপূর্ব্ব সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া, এ জ্বালাময় জীবনটাকে সুখময় করিয়া রাখিয়াছিলাম। আমার সে মোহময়ী সুখ স্বপ্ন তুমি! আজ যে সুযোগ পাইয়াছি, এ সুযোগ হয়তো আমার জীবনেও ঘটিবে না। যে দুর্জ্জয়সিংহ, বিবাহের পব হইতে তোমায় ত্যাগ করিয়াছিল—তাহার মৃত্যুর সহিত ত তোমার সঙ্গে তার সকল সম্পর্ক লোপ পাইয়াছে! চিরদিন কেন দুঃখদারিদ্র্য পীড়নে, মর্ম্মজ্বালায় জ্বলিয়া মরিবে? আমার না হও, বহুদিনের সঞ্চিত একটি অতৃপ্ত আশা আমায় আজ পূর্ণ কবিতে দাও। জগতে কেহই দেখিবে না, কেহই জানিতে পারিবে না। একবার আমার এ সন্তাপিত বক্ষে এস। আমার এই জ্বালাময় প্রাণ শীতল হউক।”

পূর্ণিমা সভয়ে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। লাজপত সাহস করিয়া আব একটু অগ্রসর হইল। পূর্ণিমা, সেই অন্ধকারের মধ্যে পলাইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু শয়তান লাজপত, তাহা বুঝিতে পারিয়া, ত্বরিতবেগে তাহার বস্ত্রপ্রান্ত ধরিল।

পূর্ণিমার তখন মাথা ঘুরিতেছিল। তাহার পায়ের নীচের মৃত্তিকা যেন ক্রমশঃ সরিয়া যাইতেছিল। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "কে কোথায় আছ রক্ষা কর! এক অবলার সতীত্ব নষ্ট হয়।" কিন্তু কেহই সে চীৎকার শুনিয়া তাহার নিকটে আসিল না।

সবলে লাজপতসিংহকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া পূর্ণিমা সভয়ে, যুক্তকরে কাতরহৃদয়ে বলিল—"কোথায় তুমি বিপদবারণ ভগবান! তুমি যদি সত্যের হও, সতীর ধর্ম্মরক্ষক হও, তাহাহইলে আমায় এ পাষণ্ডের কবল হইতে উদ্ধার কর।"

নারায়ণের চরণপ্রান্তে বোধ হয় পূর্ণিমার এ প্রার্থনা পৌঁছিয়াছিল। কেননা—সে অদূরেই অশ্বপদশব্দ শুনিতে পাইল!

সন্ত্রস্তহৃদয়া পূর্ণিমার মনে আবার সাহস দেখা দিল। সে আবার চীৎকার করিয়া বলিল—"কে কোথায় আছ—শীঘ্র এদিকে এস! এক অবলার সতীত্ব নষ্ট হয়।"

সহসা কোথা হইতে চারিজন অশ্বারোহী, যেন ভগবৎপ্রেরিত সহায় রূপে, সেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। শয়তান লাজপত তাহাদের দেখিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে সেই অশ্বারোহী দলের যিনি অগ্রণী, তিনি প্রভুত্বসূচকস্বরে আদেশ করিলেন—"সবই বুঝিতে পারিতেছি। এনায়েতউল্লা! এ শয়তানকে এখনই বন্দী কর।"

লাজপত তখনই সেই সৈনিকদের বন্দী হইল! যিনি লাজপতকে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষতলে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলেন সেই অনাথিনী—অত্যাচারপীড়িতা রমণী ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়াছে।

বিধি প্রেরিত এই যোদ্ধৃপুরুষ, গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ করিলেন—

"দেখিতেছি, ভয়ে এই স্ত্রীলোকের মূর্চ্ছা হইয়াছে। এদের দুইজনকেই অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লও। আর পোয়া ঘণ্টার মধ্যেই আমরা প্রাসাদে পৌঁছিয়া, ইহাদের সম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য ব্যবস্থা করিব।"

দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিয়া, সৈনিকেরা ফতেপুরশিক্রি রাজপ্রাসাদের পথ ধরিল। তাহারা ফতেপুরের প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্রই, দ্বারের প্রহরী—সসম্ভ্রমে কুর্ণীশ করিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

পূর্ণিমার এই উদ্ধারকর্ত্তা আর কেহই নহেন—স্বয়ং শাহজাদা খসরু। গভীর অন্ধকার ছিল বলিয়া, খসরু পূর্ণিমাকে আদৌ চিনিতে পারেন নাই।

প্রাসাদে পৌঁছিয়াই, খসরু দুইজন তাতারীকে আদেশ করিলেন—"এই মূর্চ্ছিতা রমণীর দেহ তোমরা ইস্তাম্বুলী বেগমের মহলে লইয়া যাও।"

এই ইস্তাম্বুলী বা রুমি-বেগম আকবরশাহের একজন প্রিয়তমা বেগম। ইনি পিয়ারা ও খসরুকে বড়ই স্নেহ করিতেন। অনেক সময়, সম্রাট্‌কে খসরুর স্বপক্ষে অনেক কথা বলিতেন। তুরস্ক দেশে, ইস্তাম্বুল সহরে ইহার জন্ম হয়। তাঁহার মত সুরসিকা ও সুগায়িকা বেগম আকবরশাহের রঙ্গ-মহলে খুব কমই ছিল। সম্রাট তাঁহাকে বড়ই পেয়ার করিতেন, আর ইস্তাম্বুলী বেগমও আগরার কোলাহলময় রাজপুরী হইতে দূরে থাকিতে ভালবাসিতেন বলিয়া, ফতেপুরেই অবস্থান করিতেছিলেন। এখানে তাঁহার বাসের নিমিত্ত এক স্বতন্ত্র মহল নির্ম্মিত হইয়াছিল। এ মহলের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান।

তাতারীদের সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বুঝাইয়া দিয়া, খসরু তখনই একজন বয়োবৃদ্ধ হকিমকে ডাকাইয়া, রুমি-বেগমের মহলে পাঠাইয়া

দিলেন। তৎপরে লাজপত সিংহকে কারাগারে অবরুদ্ধ রাখিতে আদেশ করিয়া, বিশ্রামার্থে নিজের খাসকামরায় চলিয়া গেলেন।

ইস্তাম্বুলী. পূর্ণিমার পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিলেন, এ মূর্চ্ছিতা যুবতী হিন্দু। তাঁহার উদারহৃদয়ে হিন্দুমুসলমানের সম্বন্ধে কোন পার্থক্য জ্ঞান ছিল না। তিনি কন্যার মত যত্নে, সেবা-শুশ্রূষা দ্বারায় পূর্ণিমার চেতনা সম্পাদন করাইলেন। আর দেখিলেন, এই হিন্দু যুবতীর অতুলনীয় রূপ-রাশি নির্নিমেষ নয়নে দেখিবার মত রূপ বটে।

চেতনান্তে পূর্ণিমা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল—সে সজ্জাপূর্ণ সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে এক দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শায়িতা। দুই জন বাঁদি তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সুশ্রূষা করিতেছে। পূর্ণিমা বিস্মিতমুখে প্রশ্ন করিল—"আমি কোথায়? কে আমায় এখানে আনিল?"

ইস্তাম্বুলী বা রুমি-বেগম পূর্ণিমার শিয়রদেশে বসিয়াছিলেন। তিনি সহাস্যমুখে বলিলেন—"ভয় পাইও না, বিস্মিত হইও না। আমার নাম রুমি-বেগম। আমি আকবরবাদশাহের পত্নী। তোমায় পথিমধ্যে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া, শাহজাদা খসরু তোমাকে এই প্রাসাদে আনিয়াছেন। খোদাকে ধন্যবাদ দাও, যে তুমি চেতনা ফিরিয়া পাইয়াছ। তোমার জীবন রক্ষা হইয়াছে।"

খসরুর নাম শুনিবামাত্রই পূর্ণিমা ভয়ে চমকিয়া উঠিল। তাহার স্বামীর অপমৃত্যুর কারণ, তাহার দুষমন, সেই খসরু তাহাকে প্রাসাদের মধ্যে আনিল কেন? নিশ্চয়ই সে ফতেপুর-শিক্রির রাজপ্রাসাদে আসিয়া পড়িয়াছে। কেননা ফতেপুর-প্রাসাদ ভিন্ন ত আর কোন বাদশাহী রাজ-ভবন রতনগড়ের নিকটে নাই।

কথাটা ভাবিবামাত্রই, পূর্ণিমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিল। রুমি বেগম রোগীর অবস্থা দেখিয়া, তখনই বাঁদীদের কি একটা ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা তখনই এক উত্তেজক ঔষধ পূর্ণিমার মুখে ঢালিয়া দিল।

রুমি-বেগম তাঁহার প্রধানা বাঁদীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রোজিয়া! যে ঔষধ দেওয়া হইল, তাহাতে রোগিণীর প্রভাতের পূর্ব্বে বোধ হয় নিদ্রা ভাঙ্গিবে না। রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তুই যদি রোগিণীর কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করিস্ ত আমায় তখনি সংবাদ দিস্।"

বেগম নিজের বিশ্রামকক্ষে চলিয়া গেলেন। পূর্ণিমা মাদক ঔষধের গুণে তখন অঘোরে ঘুমাইতেছে। এমন সময়ে আর একজন নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, রোজিয়াকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাঁহার নিকটে আসিবার জন্য আদেশ করিলেন। এই আগন্তুক—শাহজাদা খসরু।

রোজিয়া তখনই শাহজাদার সম্মুখে আসিয়া, সম্মানের সহিত সেলাম করিল। খসরু জিজ্ঞাসিলেন—"এখনও ইহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গে নাই?"

রোজিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"জনাব! এঁর মূর্চ্ছা অনেকক্ষণ ভাঙ্গিয়াছে। নিদ্রার প্রয়োজন বুঝিয়া উত্তেজক ঔষধ দিয়া আমরা এখন উহাঁকে নিদ্রাভিভূত করিয়াছি।"

খসরু তখনও জানিতে পারেন নাই এই মূর্চ্ছিতা রমণী কে? মূর্চ্ছিতার শয্যাপার্শে উপস্থিত হইয়া তিনি যাহা দেখিলেন—তাহাতে তিনি বড়ই বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন—সেই দুগ্ধফেননিভ শুভ্রশয্যা আলো করিয়া সুন্দরী পূর্ণিমা শুইয়া আছে। তাহার শুভ্র মুখে, শুভ্র বসনে, শুভ্র অংসে,

শুভ্র বাহুলতার উপর, উজ্জল দীপালোক পড়িয়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে। এলায়িত, সংসর্পিত, সুকৃষ্ণ চিকুরজাল, মৃণালগঞ্জিত বাহুদ্বয়ের উপর পড়িয়াছে। মুদিত আঁখিপল্লব দেখিলে বোধ হয়, কোন ফুল্লনলিনীর উপর যেন একটা ভ্রমর নিশ্চলভাবে বসিয়া আছে। স্পন্দিত উরসোপরি, অসাবধানে বিন্যস্ত সূক্ষ্ম বসন, অন্তরের ভাবস্ফূরণ কিম্বা শ্বাসগতির ধীর উচ্ছ্বাসে, মৃদুভাবে স্পন্দিতায়মান!

খসরু—আকুলপিপাসাময় চিত্তে পূর্ণিমার সে অনিন্দ্যরূপরাশি দেখিলেন। কিন্তু তখনই আত্মসম্বরণ করিলেন। রোজিয়া বাঁদী যে তখনও তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। সে মনে ভাবিবে কি? কোনরূপ ব্যাকুলতা, চাঞ্চল্য দেখাইলে যদি সে কোন কথা প্রকাশ করে, তাহাহইলে রুমি-বেগমই বা কি মনে করিবেন?

ইন্দ্রিয়জয়ী বীরের মত চিত্ত দমন করিয়া, খসরু সেই মহাপ্রলোভনের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"কাল সকালে যেন সংবাদ পাই, এই হিন্দু বিবি কেমন থাকেন?"

হস্তীসমরের সেই ব্যাপার লইয়াই, পিতার সহিত খসরুর একটা দারুণ মনোমালিন্য ঘটে। অসংযতচিত্ত, যৌবনমদোন্মত্ত খসরু যখন দেখিলেন, তাঁহার রণকুঞ্জর বিধ্বস্ত হইয়াছে—আর তাঁহার পিতা অন্যায় করিয়া তাঁহার হাতিটিকে হারাইয়া দিয়াছেন, তখন তিনি আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া, শাহজাদা সেলিমকে—এমন কতকগুলি কথা বলেন, যাহাতে সেলিম, পুত্রের অবাধ্যতায় আর ঔদ্ধত্যে তাঁহার উপর ভয়ানক বিরক্ত হইয়া পড়েন। আবার এই কথাগুলি যে স্থানে হইয়াছিল, তাহার উপরের অলিন্দেই সম্রাট উপবিষ্ট ছিলেন। আকবরশাহও এই ব্যাপার হইতে

বুঝিলেন, তাঁহার আদরের পৌত্র, অন্যায় প্রশ্রয়ে কতটা উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত হইয়া উঠিয়াছে।

আর এই ঘটনার কথা যখন খসরুর মাতা শাহীবেগমের কর্ণে পৌছিল তখন তিনি তাঁহার দুর্বিনীত পুত্রকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। মাতার এ তিরস্কার খসরুর বড়ই মর্ম্মে বাজিল। ইহার উপর তাঁহার পিতামহ আকবরশাহও, সেই দিন সন্ধ্যার পর খসরুকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন, "খসরু! এখনও নিজের ভাল মন্দ বুঝিলে না? জাননা কি তুমি, আমি আর বেশী দিন নই! মৃত্যু আমার দ্বারপ্রান্তে আসন পাতিয়া বসিয়া আছে। যে পিতার সহিত তুমি আজ বিবাদ করিলে, তিনিইতো হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ সম্রাট। তাঁহার কোপমুখে পড়িলে, আমার অবর্ত্তমানে কে তোমায় রক্ষা করিবে খসরু? মনে ভাবিয়াছ কি তুমি, আমি সেকেন্দ্রার চিরশীতল শান্তিময় শয্যা ত্যাগ করিয়া, তোমার সাহায্যে আসিব? আমার অনুরোধ তুমি দিনকতক না হয় ফতেপুরের প্রাসাদে যাও। আমি ইতিমধ্যে তোমার পিতার মনের উগ্র অবস্থাটা প্রশমিত করিয়া দিই। তারপর আমার পত্র পাইলেই, তুমি আগরায় আসিও।"

পিতামহের উপদেশেই খসরু, ফতেপুর শিক্রিতে আসিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে তিন জন মাত্র শরীর-রক্ষী। পথিমধ্যে তিনি স্ত্রীকণ্ঠ নিঃসৃত করুণ চীৎকার শুনিতে পাইয়া সহসা ঘটনাস্থানে উপস্থিত হন। তাহার পর কি ঘটিয়াছিল, পাঠক তাহা জানেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে, খসরু তাঁহার বিশ্রামকক্ষে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বোজিয়া বাঁদী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কুর্ণীশ করিয়া বলিল, "শাহজাদা! রুমিবেগম আপনাকে তলব দিয়াছেন।"

খসরু এই বাঁদী প্রমুখাত পূর্ণিমার সুস্থ অবস্থার কথা শুনিয়া, নিরুদ্বেগচিত্তে রুমিবেগমের কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

রুমি বেগম খসরুকে স্নেহভবে পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন—"খসরু! সহসা আগরা হইতে তুমি চলিয়া আসিলে কেন? সম্রাটের শরীরের অবস্থা কিরূপ?"

খসরু বলিলেন—"সম্রাট ভাল আছেন।" এই কয়েকটী কথা বলিবার পরই খসরু সহসা চুপ করিয়া গেলেন। কেননা তাঁহার ফতেপুরে আসিবার প্রকৃত কারণ বলিতে গেলে, ভিতরের অনেক কথাই বলিতে হইবে।

খসরুকে সহসা নীরব হইতে দেখিয়া, রুমি-বেগম সন্দিগ্ধচিত্তে বলিলেন, "ব্যাপার কি শাহজাদা! তোমার সহসা এখানে আসিবার কারণ বলিতে ইতঃস্তত করিতেছ কেন?"

এই রুমি বেগম, খসরুর উপর চিরদিনই স্নেহময়ী। তাঁহার নিকট খসরুর কোন কিছুই গোপনীয় ছিল না। রুমির পীড়াপীড়িতে খসরু পরিশেষে সকল কথাই তাঁহাকে বলিয়া ফেলিলেন।

রুমি-বেগম কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন—"হায়! খসরু! যদি তুমি অসহিষ্ণু হইয়া, এই ভাবে তোমার পিতার সহিত বিরোধটা না করিতে তাহাহইলে হয়তো খুব ভালই হইত। বড়ই ভুল করিয়া ফেলিয়াছ তুমি!"

খসরু অনুতপ্ত স্বরে বলিল—"কি করিব দাদিজি-বেগম? কিন্তু এ সব অপরাধেরও ত মার্জ্জনা আছে! তিনি পিতা—আমি পুত্র।"

রুমি-বেগমের মুখমণ্ডল, তখনই উজ্জ্বলভাব ধারণ করিল। তিনি বলিলেন, "আছে—কিন্তু এ মার্জ্জনা তুমি চাহিলে পাইবে কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ করিতেছি। তোমার হইয়া আমিই না হয় এ মার্জ্জনা চাহিব। সুলতানের জননী খাসবেগমের মৃত্যুর পর, আমি আর সেলিমা বেগম, সেলিমের মাতৃস্থানীয়া হইয়া তাহাকে পালন করিয়াছি। আমি এই সামান্য ভিক্ষা চাহিলে, সুলতান সেলিম বোধ হয় তাহা আমাকে দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কেননা এখনও তিনি বাদশা হন নাই। আর তার উপর দুনিয়ার বাদশা আকবরশাহ এখনও জীবিত।"

খসরু বলিলেন,—"আকবরশাহের আদরিণী বেগম তুমি। আমার জন্য অতটা নীচু হইয়া, পুত্রের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিবে দাদি-জি?"

ইস্তাম্বলীর বা রুমির মুখখানি, একটা দর্পময় প্রভায় উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"স্বামীর নিকট, সন্তানের নিকট কোন কিছু চাহিবার বাধা, পত্নীর ও জননীর পক্ষে থাকা উচিত নয়। তোমার পিতা সুলতান সেলিম, আমার গর্ভে না জন্মিলেও, সম্রাটের বিবাহিত পত্নীরূপে মাতৃত্বের একটা দাবি ত আমি রাখি!"

চঞ্চলহৃদয় খসরু একটু বিদ্রূপের সহিত বলিল—"যে পুত্র পিতৃদ্রোহী, সেকি মাতৃদ্রোহী হইতে পারে না দাদি-জী?"
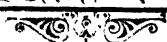
ইস্তাম্বুলী বেগম ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"চুপ্ কর! খসরু! নির্ব্বোধের মত আর কখনও কাহারও কাছে, ও ভাবে মনোভাব প্রকাশ করিও না। তাহাতে তোমার সমূহ বিপদ ঘটিবে! আগুণ যখন ধরিয়াছে তখন তাহা নিভাইবার চেষ্টা না করিয়া, ফুৎকার দানের চেষ্টা একটা ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতা। যাই হোক্ বৃথা তর্কে প্রয়োজন নাই। মীর-মুন্সীকে বলিয়া আমি আজ আগরা যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়াছি। এই হিন্দু বিবি এখানে রহিল। আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিও। আর আমি আগরায় পৌছিবার পর তোমায় যেভাবে উপদেশ দিব, সেই ভাবেই তুমি কাজ করিও।"

বলা বাহুল্য, সেই দিনের মধ্যাহ্নপূর্ব্বে, রুমি-বেগম আগরায় চলিয়া গেলেন। ফতেপুর-শিক্রি হইতে আগরা বেশী দূরের পথ নয়।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।
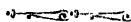
ইস্তাম্বুলীর নিকট হইতে পূর্ণিমা মাতার মত আদর যত্ন পাইতেছিল। সে দরিদ্রা—ক্ষত্রিয়া কন্যা। তাহার দারিদ্র্যের পরিচয় পাইয়াও, অতুল সম্পদেশ্বরী রুমি-বেগম যে তাহাকে কন্যাবৎ পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তাহাতে সে তাঁহার নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ হইল। আর এই দুইদিনে বোজিয়ার সহিতও তাহার একটা বেশ অন্তরঙ্গতা জন্মিয়াছিল।

শাহজাদা খসরু

রুমিবেগম পূর্ণিমাকে বলিয়া গিয়াছিলেন—"এ মহলে পুরুষমাত্রেরই প্রবেশাধিকার নিষেধ। আমার এই মহল সংলগ্ন, এক গুলাব-বাগ আছে। ইচ্ছা হইলেই তুমি সেখানে বেড়াইতে যাইও। আমি বোধ হয় পাঁচ সাত দিনের মধ্যে আগরা হইতে ফিরিব। আমি ফিরিয়া না আসিলে তুমি যাইও না।"

যার কাছে—পূর্ণিমা তাহার জীবনের জন্য অতটা কৃতজ্ঞ, তাহার এ সামান্য অনুরোধটী রক্ষা করিতে সুতরাং সে অস্বীকৃতা হইল না। বেগম চলিয়া যাওয়ার পর হইতে, রোজিয়ার স্কন্ধে নানারকমের কাজ পড়িয়াছে। সেও এখন পূর্ণিমার কাছে সকল সময় থাকিতে পারে না। পূর্ণিমার আহারের ব্যবস্থার জন্য, একটী স্বতন্ত্র মহল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হিন্দু-পাচিকা ও চাকরাণী নিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ণিমা পাচিকার হাতে খায় না। এক সন্ধ্যা আতপান্ন আহার করে।

অভ্যাসমত সে প্রতিদিনই একবার করিয়া গুল্‌-বাগে বেড়াইতে যাইত। সেই ক্ষুদ্র উদ্যানের চারিদিকে ফুটন্ত গোলাপ রাশি। ভিতরে প্রবেশ মাত্রেই মনে হয়, কে যেন চারিদিকে গুলাবজলের ফুয়ারা খুলিয়া দিয়াছে। এই উদ্যানমধ্যে বিশ্রামজন্য উন্মুক্ত আকাশতলে এক মর্ম্মরবেদী।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আকাশ আলো করিয়া চাঁদ উঠিয়াছে। রক্তবর্ণ গুলাবের গায়ে, সেই চাঁদের কিরণ পড়িয়া বড়ই সুন্দর দেখাইতে ছিল। পূর্ণিমা অনেকক্ষণ ধরিয়া এদিক ওদিক ঘুরিল। তাহার শোচনীয় অদৃষ্ট সম্বন্ধে, শয়তান লাজপতের অত্যাচার সম্বন্ধে, রুমি বেগমের উদারতা সম্বন্ধে, অনেক কথাই সে ভাবিল। তৎপরে ক্লান্তদেহে,

অবসন্নচিত্তে পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মরবেদীতে শয়ন করিল। কেননা আজকাল সে বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ণিমাকে নিদ্রিত দেখিয়া, মলয় যেন তাহার মত শ্রেষ্ঠা সুন্দরীর পরিচর্য্যার লোভসম্বরণ করিতে পারিল না। সে সদ্য প্রস্ফুটিত গুলাবেরগন্ধ চুরী করিয়া পূর্ণিমার স্বল্পবিস্ফারিত নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিল। অতি ধীরভাবে পূর্ণিমার চূর্ণঅলকগুলি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিতে লাগিল। তাহার পরিচ্ছন্ন ললাটে, মুক্তাবিন্দুর মত স্বেদধারা, নিজের সুগন্ধবাসিত স্নিগ্ধনিশ্বাসে শুখাইয়া দিতে লাগিল। এ পরিচর্য্যায় ফলে এই হইল--পূর্ণিমা আরও গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

এই সময়ে ঘটনাচক্রচালিত হইয়া, আর একজন সেই উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এখানে অপর পুরুষের প্রবেশ নিষেধ থাকিলেও শাহজাদাদের পক্ষে অবারিত দ্বার। খসরুর মহলের পার্শ্বেও এইরূপ একটা পুষ্পোদ্যান। সেখানে কেবল মালতী, যূথিকা, চম্পা ও বকুলের বাগান. গোলাপের নাম গন্ধ নাই। তাই খসরু একটা খেয়ালের বশে, গোটাকত কুটস্থ বস্‌রাই গুলাব সংগ্রহের জন্য রুমি-বেগমের উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই দুই বিভিন্ন মহলের উদ্যানের মধ্যে ব্যবধান ছিল একটী ক্ষুদ্র প্রস্তরপ্রাচীর। আর সেই প্রাচীরগাত্রে একমাত্র উন্মুক্ত ক্ষুদ্র দ্বার।

খসরু উদ্যানের পশ্চাৎ দিক দিয়া আসিয়াছিলেন, এজন্য মর্ম্মরবেদীর উপর শায়িতা—পূর্ণিমার অস্তিত্বের কোন সংবাদই জানিতেন না। সহসা তাঁহার দৃষ্টি সেই মর্ম্মরবেদীর উপর পড়িল। তিনি আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, সে নিদ্রিতা রমণী—পূর্ণিমা!

অপূর্ব্ব রূপশালিনী নিদ্রিতা পূর্ণিমার মুখে চাঁদের আলো পড়িয়াছে। বোধ হয়, যেন কোন পরী বেহেস্ত ছাড়িয়া, সেই গুল্-বাগে ফুল তুলিতে আসিয়াছিল, তারপর সে উদ্যানভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া, এই মর্ম্মরবেদীর উপর অলসিত অঙ্গ ঢালিয়াছে।

নির্জ্জনতার অবসরে, শয়তান আসিয়া খসরুর হৃদয়াধিকার করিল। খসরু শয়তানের শক্তিতে অধীর হইয়া, উদ্বেলিত আকাঙ্খাপূর্ণ চিত্তে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এমন করিয়া, এত কাছে আসিয়া ত তোমার নগ্নসৌন্দর্য্য আর কখনও দেখিবার অবসর পাই নাই। পূর্ণিমা! পূর্ণিমা! তুমি এত সুন্দর। হায়! পূর্ণিমা! আমার পিয়ারা যদি তোমার মত হইত?"

খসরুর এ আবেগময় উচ্চ চীৎকারে, পূর্ণিমা জাগিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সেই মর্ম্মরবেদী হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, রুষ্টস্বরে বলিল—"শাহজাদা! এই কি আপনার হৃদয়ের মহত্ত্ব? আমার অকালবৈধব্য ঘটাইয়াও কি আপনার আশা মেটে নাই—শাহজাদা খসরু? কোথায় গেল আপনার সে পরোপকার প্রবৃত্তি, যার জন্য মূর্চ্ছিতাবস্থায় আমায় পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন? এই নির্জ্জনাবসরে, নিদ্রিতা যুবতীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া এ উন্মাদের প্রলাপ কি আকবরশাহের পৌত্রের যোগ্য?

খসরু একটু দমিয়া গিয়া বলিলেন—"স্বীকার করি, আমি তোমার নিদ্রিত অবস্থায় এখানে আসিয়া অন্যায় কাজ করিয়াছি। কিন্তু কি বলিতেছ তুমি পূর্ণিমা! আমি তোমার বৈধব্য ঘটাইয়াছি? কে তোমায় এ কথা বলিল? খোদার দোহাই! আজও পর্য্যন্ত এ নিষ্কলঙ্ক হস্ত নরশোণিতে রঞ্জিত হয় নাই!"

পূর্ণিমা বলিল—"কিন্তু আমি লাজপতসিংহের মুখে শুনিয়াছি আপনারই আদেশে, দুর্জ্জয়সিংহকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হইয়াছে।"

খসরু উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"মিথ্যা কথা! ঘোর চক্রান্ত জালে বেষ্টিত হইয়াছ তুমি পূর্ণিমা। তোমার স্বামী দুর্জ্জয়সিংহ, এখনও জীবিত! তোমার সীমন্তের সিন্দুর এখনও সমুজ্জ্বল! তবে সে নিরুদ্দেশ।"

পূর্ণিমা। তার প্রমাণ কই শাহজাদা?

খসরু। এই দেখ! এই পত্রখানি দুর্জ্জয়সিংহ লাজপতকে দিয়াছিল তোমায় গোপনে দিতে। কিন্তু শয়তান লাজপত তাহা দেয় নাই। এ পত্র আমি তাহার আঙ্গরাখার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া পাইয়াছি।

খসরু, একখানি ক্ষুদ্র পত্র তখনই তাঁহার আঙ্গরাখার মধ্য হইতে বাহির করিয়া পূর্ণিমার হস্তে দিলেন। পূর্ণিমা—সে পত্রখানি পড়িল আর তাহা দুর্জ্জয়সিংহের স্বহস্ত লিখিত দেখিয়া বুঝিল—তাহার সন্দেহ অমূলক। শাহজাদা তাহার স্বামীহন্তা নহেন। শয়তান লাজপত সিংহ, তাহাকে কৌশলে হস্তগত করিবার জন্যই, এই ভীষণ চক্রান্তজাল সৃষ্টি করিয়াছে।

লাজপতপ্রদত্ত সেই অঙ্গুরীয়কটী বাহির করিয়া, পূর্ণিমা খসরুকে দেখাইয়া বলিল—"দেখিতেছি সেই নরাধম রাজপুত আমাকেও মিথ্যা প্রতারিত করিয়াছে! আমিও এক গভীর রহস্যময় চক্রান্তের মধ্যে পড়িয়াছি। আর সেই শয়তান লাজপত কি উদ্দেশে যে এই চক্রান্তজাল সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাও এখন বুঝিতেছি।

খসরুও যেন অন্ধকারের মধ্যে একটা আলোকরেখা দেখিতে পাইলেন। ঘটনাচক্রচালিত হইয়া, সেই দিন প্রাতঃকালেই তিনি লাজপতের

অপরাধের বিচার শেষ করিয়া, তাহার প্রতি আজীবন কারাবাসের আজ্ঞা প্রচারিত করিয়াছিলেন। লাজপত মুক্তকণ্ঠে তাঁহার কাছে সকল কথা খুলিয়া বলায়, সে জীবন ফিরিয়া পাইয়াছে বটে, কিন্তু আজীবন কারাবাসের কঠোর শাস্তি হইতে অব্যাহতি পায় নাই।

খসরুর কথা শুনিয়াও তাহার প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিয়াছে ভাবিয়া, পূর্ণিমা বড়ই অনুতপ্তা হইল। সে যুক্তকরে খসরুকে বলিল—"আমায় মার্জ্জনা করুন শাহজাদা!"

খসরু পূর্ণিমার এই বিনীত ভাব দেখিয়া সুযোগ পাইয়া বলিলেন—"তোমায় মার্জ্জনা করিতে অনিচ্ছুক আমি নই। তোমার তৃপ্তির জন্য এই শয়তান লাজপতের ছিন্ন মুণ্ড পর্য্যন্ত তোমায় উপহার দিতে পারি। তোমার জন্য না পারি কি—সুন্দরী পূর্ণিমা? আজ আমার হৃদয়ের প্রবৃত্তির বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে। আমি তোমার মত রূপসীর প্রলোভনের মুখ হইতে সেদিন পলাইয়াছিলাম, কিন্তু আজ পারিলাম না। দুর্জ্জয়সিংহ নিরুদ্দেশ! দণ্ডের ভয়ে সে আর এ দেশে ফিরিবে না। লাজপতের মত এক শয়তানাধমের কবল হইতে আমিই তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি। তাহার জন্য একটা কৃতজ্ঞতা আমার প্রাপ্য। আমার চেষ্টাতেই তুমি সাংঘাতিক মূর্চ্ছার পর, প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছ! সে প্রাণে কি আমার কোন অধিকার নাই পূর্ণিমা? আকুল আকাঙ্ক্ষা, জ্বালাময় পিপাসা, উত্তেজিত প্রবৃত্তি, চিত্তান্তরালে ছদ্মবেশে লুক্কায়িত শয়তান, আজ আমায় পিশাচ করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ণিমা! তুমি আমার সঙ্গে আমার খাসমহলে এস! রত্নালঙ্কার চাও পূর্ণিমা—আমি তোমায় গোলকুণ্ডার উজ্জ্বল হীরকে মণ্ডিত করিয়া দিব। রাজ্যেশ্বরী হইতে চাও

পূর্ণিমা—আমি তোমার জন্য পিতৃদ্রোহী হইব—পিতার মস্তক হইতে মণিময় মুকুট খুলিয়া লইয়া, তোমার মস্তকে পরাইয়া দিব। আগরার রাজসিংহাসন, তোমার সুকোমল চরণস্পর্শে ধন্য হইবে। তোমার সহিত প্রথম সাক্ষাতের পর হইতে, মুখ বুজিয়া অনেক কষ্ট সহিয়াছি। প্রবৃত্তি দমনে খুবই চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে পূর্ণিমা! আমার চেষ্টার চেয়ে, তোমার রূপের সম্মোহনী-শক্তি বড় বেশী। কেন পূর্ণিমা তুমি এত সুন্দর হইয়া এ ধরায় আসিয়াছিলে?

খসরু আবেগভরে পূর্ণিমাকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। পূর্ণিমা সরিয়া দাঁড়াইয়া, রোষদীপ্তনেত্রে বিদ্যুৎবর্ষণ করিয়া বলিল—"জানি না—মোগলরাজবংশে এমন অপদার্থ জীব জন্মিতে পারে! আকবরশাহের পৌত্র না তুমি শাহজাদা খসরু? ছার রত্নালঙ্কার! ছার আগরার মসনদ! সতীধর্ম্মপরায়ণা দরিদ্রা রাজপুত কন্যার পক্ষে এ ঐশ্বর্য্য অতি তুচ্ছ! ধিক্ তোমার ঐ কলুষিত জিহ্বাকে, যাহা এইমাত্র ঐসব কুৎসিত কথা উচ্চারণ করিয়াছে! ধিক্ তোমার পরোপকারিতায়, আর্ত্তের নিরাশ্রয়ের জীবনদানে অর্জ্জিত কৃতজ্ঞতার দাবিতে! সকল রাজপুতনারী ত অম্বরের রাজকন্যা নয়! সকল রাজপুত ত মানসিংহ নয়! এই কি তোমার হৃদয়ের মহত্ত্ব শাহজাদা? এক নিঃসহায়া, আশ্রয়হীনা, বিপন্না, ঘোর চক্রান্তপীড়িতা, অবলার নারীসম্মানের উপর এ যথেচ্ছাচার, আকবরশাহের গৌরবান্বিত নামে যে দুরপনেয় কলঙ্ক ক্ষেপণ করিবে! আমাকে পথ ছাড়িয়া দাও, আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাইতেছি।"

অন্য সময়ে, এই পরাক্রান্ত শাহজাদাকে এই সব কথা বলিলে, পূর্ণিমা

হয়ত তখনই কারানিক্ষিপ্ত হইত। কিন্তু খসরুকে তখন শয়তানে ধরিয়াছে। তাঁহার প্রাণের সহজাত মহত্ব, শীলতা, আত্মসম্ভ্রমজ্ঞান, সবই তখন চলিয়া গিয়াছে! রূপোন্মাদ ব্যাধিগ্রস্ত খসরু, পূর্ণিমার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"আর আমায় কষ্ট দিও না। আকাঙ্ক্ষার জ্বালা, তুষানলের প্রবল জ্বালার চেয়েও বেশী। পূর্ণিমা! প্রিয়তমে! আমি তোমাকে আমার ধর্ম্মপত্নী করিব। পিয়ারা বেগমকে তোমার বাঁদী করিয়া দিব। একবার তোমার ঐ পেলবকরপল্লব আমাকে চুম্বন করিতে দাও। আমি কৃতার্থ হই। মুহূর্ত্তের জন্য একবার বেহেস্তের সুখ ভোগ করি। বড়জ্বালায় জ্বলিতেছি যে আমি পূর্ণিমা।"

অসহিষ্ণু খসরু আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। তিনি সবলে পূর্ণিমার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন—"পাষাণি! তোমাকে এত মিনতি করিলাম, তবু তোমার কৃপা হইল না। আমায় দোষ দিতেছ কেন? বৃথা তিরস্কার করিতেছ কেন? দোষ আমার এই চক্ষুর, না তোমার ঐ ভুবনমোহন রূপের।"

পূর্ণিমা সবলে খসরুর হাত ছাড়াইয়া লইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "সতীর দর্পের যদি কোন মূল্য থাকে, সতীর তেজের যদি কোন শক্তি থাকে, দুর্জ্জয়সিংহের পরিত্যক্তা পত্নী হইলেও, যদি আমি পতিজ্ঞানে এ পর্য্যন্ত তাহার চরণচিন্তা করিয়া থাকি—শাহজাদা খসরু! আমি তোমায় অভিশাপ দিতেছি, তোমার ঐ কলুষিত চক্ষু একদিন না একদিন দৃষ্টিশক্তি হীন হইবে। তোমার শাহজাদার দর্প ও দম্ভ, চিরদিনের জন্য লোপ পাইবে। আজ আমার চক্ষে যে ভাবে অশ্রুধারা বহাইতেছ, একদিন তোমার চক্ষেও এই ভাবে অশ্রুপ্রবাহ বহিবে।"

ঠিক এই সময়ে, এক দীর্ঘকায় পুরুষ, সেই উদ্যানমধ্যস্থ কোন বৃক্ষের অন্ধকারময় অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া, খসরুর পিছনে আসিয়া, তাঁহাকে এমন সজোরে ধাক্কা দিলেন, যে শাহজাদা খসরু টাল্ সামলাইতে না পারিয়া, এক প্রস্তরখণ্ডের উপর পড়িয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছা আসিয়া, তাহার চেতনা বিলুপ্ত করিয়া দিল। আর পূর্ণিমা সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার উদ্ধারকারী, নীলবসনাবৃত এক মুসলমান ফকির।

ফকিরের মুখ সুদীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুতে আবৃত। তাঁহার সেই মুখে যেন অনলের দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। চক্ষু হইতে যেন অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। পূর্ণিমাকে আর কোন কথা কহিবার অবসর না দিয়া, ফকির তাহাকে বলিলেন—"নির্ব্বাক অবস্থায় আমার সঙ্গে এস। মহা বিপদ তোমার সম্মুখে!" ফকিরের হস্তে শাহজাদার অঙ্গুরীয় দেখিয়া, দুর্গদ্বারের প্রহরী সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিল।

ফকির অগ্রে অগ্রে—পূর্ণিমা পশ্চাতে। এই ভাবে অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিবাহিত হইল।

পূর্ণিমা এতক্ষণ কোন কথাই কহে নাই। সহসা সে প্রশ্ন করিল—"মহাত্মন্! এ অভাগিনী আপনার পরিচয় পাইতে পারে কি?"

ফকির গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"ব্যস্ত হইও না পূর্ণিমা! আমি তোমার অপরিচিত নহি। আমাদের গন্তব্যস্থান অতি নিকটবর্ত্তী। সেখানে পৌছিয়া, তোমায় সব কথা খুলিয়া বলিব।"

এই অপরিচিত ফকিরের মুখে তাহার নামোচ্চারিত হইতে শুনিয়া পূর্ণিমা বড়ই বিস্মিতা হইল। পরক্ষণেই ভাবিল, এই সব ফকির, সাধু
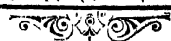
সন্ন্যাসী, দৈবানুগৃহীত মহাপুরুষ। আমার নাম জানাটা আর বেশী কথা কি?

পূর্ণিমা অগত্যা নির্ব্বাকভাবে ফকিরের অনুসরণ করিতে লাগিল। মাঠখানি পার হইয়াই, একটী গণ্ড গ্রাম। অনেকগুলি ক্ষুদ্র বাসভবন সেই গ্রামের মধ্যে। ফকির পথের বাঁক ফিরিয়া, কোন এক ক্ষুদ্র অট্টালিকার দ্বারে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন—"মৃণ্ময়ী! মৃণ্ময়ী!"

এক ক্ষুদ্রকায়া ভীলবালিকা, প্রদীপ হস্তে আসিয়া সেই বাটীর দ্বার খুলিয়া দিল। ফকির দ্বার ভেজাইয়া দিয়া সেই বালিকাকে বলিলেন, "তুমি শয়ন কর গে মৃণ্ময়ী! অনেক রাত হইয়াছে।"

পূর্ণিমা, ফকির সাহেবের এই সব কাণ্ডকারখানা দেখিয়া, বড়ই বিস্মিতা হইল। এক দীপালোকিত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই, ফকির তাঁহার কৃত্রিম শ্মশ্রু উন্মোচন করিয়া, উপরের আলখাল্লাটী খুলিয়া ফেলিয়া পূর্ণিমাকে বলিলেন—"আমায় চিনিতে পার কি তুমি পূর্ণিমা!"

পূর্ণিমা তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্রই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"একি তুমি? দুর্জ্জয়! প্রাণাধিক! অতি হতভাগিনী আমি, যে তোমাকে এতক্ষণ চিনিতে পারি নাই। তোমার এ ছদ্মবেশ ধারণের উদ্দেশ্য কি দুর্জ্জয়?"

দুর্জ্জয়। উদ্দেশ্য যাহা তাহা পরে জানিতে পারিবে। কিন্তু দেখিতেছি, দৈব তোমার বড়ই সহায়। তাহা না হইলে, ঘটনাচক্রচালিত হইয়া, আমি শিক্রির প্রাসাদমধ্যে উপস্থিত হইব কেন?

পূর্ণিমা দুর্জ্জয়সিংহের চরণবন্দনা করিয়া বলিল—"তুমি দেবতা।

আমি অতি হতভাগিনী যে তোমার মত দেবতার চরণে আশ্রয় পাইলাম না। তুমি কি করিয়া আমার সন্ধান পাইলে?”

দুর্জ্জয় বলিল—“সংক্ষেপে তোমায় সবই বলিতেছি। নির্জ্জন কারা-যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায়, আমি এক ঝটিকাময়ী রাত্রে রতনগড় হইতে পলায়ন করি। লাজপতসিংহ, সেই সময়ে রতনগড়ের সহকারী কারা-প্রহরী। সে অনুতপ্তচিত্তে, একদিন আমার নিকট মার্জ্জনাভিক্ষা করিল। সেই আমায় পলাইতে উৎসাহ দিল। এক ঝঞ্ঝাময়ী রজনীর সুযোগান্তরালে, আমি কারাকক্ষের জানালার গরাদে ভাঙ্গিয়া পলায়ন করি। সে রাত্রে খুব জল ঝড় হইয়াছিল বলিয়া—আমার পলাইবার পথে কোন বাধা হয় নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমার অঙ্গুরীয়কটী আমি সেই কারাকক্ষের এক কুলুঙ্গীর মধ্যে ফেলিয়া গিয়াছিলাম। জানতো এ আংটি-টিকে আমি চিরদিনই মন্ত্রঃপূত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এই অঙ্গুরীয় পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় পুনরায় কারামধ্যে প্রবেশ করিতে আমার সাহস হইল না। আমি মনে মনে একটা সঙ্কল্প স্থির করিলাম, যে শয়তান খসরু আমার এ দুর্দ্দশার কারণ, যে মানসিংহ অন্যায় বিচার করিয়া, আমাকে কারানিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের সকল কূট মন্ত্রণাই আমি বিফল করিয়া দিব। ভাবিলাম, শক্তি আমার অতি সামান্য বটে, কিন্তু কোন কৌশলে সুলতান সেলিমের আশ্রয় লইয়া আমার এই দুই প্রধান শত্রুর উপর প্রতিশোধ লইতে হইবে। কারণ আমি এটুকু জানিতাম, খসরুর ফতেপুরের খাস-কামরার মধ্যে, এমন কতকগুলি সাংঘাতিক কাগজ পত্র এক স্থানে লুকান আছে, যাহা হইতে আমি সুলতানের নিকট প্রমাণ করিতে পারিব, যে তাঁহার ঔরসজাত পুত্র এই শাহজাদা খসরু পিতৃ-

হত্যার মন্ত্রণা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। এই জন্যই ফকিরের বেশে, আমি খসরুর মহলে প্রবেশ করি! খসরু তাঁহার নামাঙ্কিত যে অঙ্গুরীয়ক তোমায় দিয়াছিলেন, তাহা তুমিত আমায় রাখিতে দিয়াছিলে। সে আংটী তখন কোন কাজে লাগাইবার প্রয়োজন না ঘটায় ও পরে কোন প্রয়োজনে লাগিতে পারে ভাবিয়া, তাহা অতি যত্নে আমার আঙ্গরাখার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। তোমার সেই অঙ্গুরীয়ই আজ আমার রাজপ্রাসাদে প্রবেশের ও নির্গমের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিল।

খসরু একটু আগে উদ্যান ভ্রমণে গিয়াছেন, এ সংবাদ এক বাঁদীর নিকট হইতে পাইলাম। শাহাজাদার সহিত সাক্ষাৎ করার বিশেষ প্রয়োজন এই কথা বলায়, বাঁদী আমাকে সেই কক্ষে বসাইয়া বোধ হয় খসরুকেই, সংবাদ দিতে গিয়াছিল। আর আমি এমন ভাবে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম, যে শাহজাদা খসরু কিছুতেই আমায় চিনিতে পারিতেন না।

বিশ্রামার্থে খসরুর কক্ষমধ্যেই বসিলাম। তাহার পর সুযোগ বুঝিয়া, যথাস্থান হইতে কাগজপত্র গুলি সংগ্রহেব চেষ্টা করিলাম। সে কক্ষে তখন কেহই ছিল না। বহুচেষ্টার পরও সেগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। এই সময়ে সহসা বারান্দায় কাহারও পদশব্দ পাইয়া আমি দ্রুতবেগে কক্ষমধ্য হইতে বাহির হইয়া, পশ্চাতের উদ্যানে আসিয়া আত্মগোপন করি। এখান হইতেই আমি তোমার চীৎকার শুনিতে পাই। তারপর যাহা কিছু ঘটিয়াছে, সবই ত তুমি জান!"

পূর্ণিমা, বিস্মিতচিত্তে দুর্জ্জয়ের কথা গুলি শুনিল। তৎপরে তাহার বক্ষবসনমধ্য হইতে, পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রঃপূত অঙ্গুরীয়কটী বাহির করিয়া দুর্জ্জয়ের
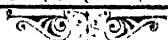
হাতে দিয়া বলিল—"এই আংটিটি লাজপত আমাকে আমার বৈধব্যের নিদর্শন রূপে দিয়াছিল। দুর্জ্জয়! ভগবান আমার প্রতি বড়ই করুণাময়। তাহা না হইলে, আজ এই অসম্ভব ভাবে আমার সীমন্তের সিন্দূর সমুজ্জল হইয়া উঠিবে কেন? এই নাও—তোমার অঙ্গুরীয়। ওঃ! কি শয়তান এই লাজপত?"

দুর্জ্জয়সিংহকে পূর্ণিমা তখন সবিস্তারে লাজপত ঘটিত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। দুর্জ্জয়সিংহ তখন বুঝিতে পারিলেন—কিরূপ অদ্ভুত ঘটনাস্রোত চালিত হইয়া, পূর্ণিমা ফতেপুর প্রাসাদে আসিয়াছিল। লাজপতের শয়তানীর কথাগুলা শুনিয়া দুর্জ্জয়ের হস্ত মুষ্টিনিবদ্ধ হইল। কিন্তু সে মনের ক্রোধ মনেই সম্বরণ করিল।

তারপর দুর্জ্জয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ধন্য সেই ভগবান যিনি আজ তোমার নারী-সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তুমি প্রস্তুত হও পূর্ণিমা—আমার সঙ্গে যাইতে। দেখিতেছি, আমার গুরুদেবের আশ্রয় তোমার পক্ষে অতি নিরাপদ। সেখানেই এখন তোমাকে কিছুকাল রাখিতে চাই। তিনি তীর্থ—ভ্রমণে যাইতেছেন; বোধ হয় হরিদ্বার হইয়া পঞ্চনদের তীর্থ গুলি দেখাই তাঁর উদ্দেশ্য। কল্যকার প্রত্যুষেই, আমি আর তুমি এই গ্রাম ত্যাগ করিব। এই বাড়ী আমার এক বন্ধুর। তাহার ঐ একমাত্র কন্যা বই আর এ বাটীতে কেহ নাই। এখানেও তোমায় লুকাইয়া রাখিতে পারিতাম। কিন্তু এই গ্রাম হইতে ফতেপুর-শিক্রি খুবই নিকটে। জানিও, এই নির্জ্জিত খসরু ইচ্ছা করিলেই নূতন বিপদ ঘটাইতে পারে।"

ইহার পর পূর্ণিমা ও দুর্জ্জয়ের মধ্যে আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

কিন্তু সময় ত কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। ত্রিযামা রজনীর শেষ-যামাবসানের সঙ্গে, উষার শুভ্র আলোকে মৃত প্রকৃতি জাগিয়া উঠিল। গত রাত্রের ঘটনা গুলি স্মৃতিপথে উদিত হইবামাত্রই, দুর্জ্জয়সিংহ ভাবিল, যেন একটা মহা দুঃস্বপ্নের মধ্যে সে রাত্রিটি কাটাইয়াছে। আর পূর্ণিমা সে রাত্রে সে যেন সুখস্বপ্নই দেখিয়াছে। আর সে ভাবিল সেদিন তাহার পক্ষে মহা সুপ্রভাত। তাহা না হইলে এরূপ ঘটিবে কেন? একেই বলে বিধির বিধান!

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্যামসলিলা যমুনার অপর পারে, সুলতান সেলিমের এক উদ্যান-প্রাসাদ ছিল। তাহার নাম ছিল "শাহী-মঞ্জিল।" সুলতান সেলিমের প্রধানা বেগম যোধাবাই শাহী-বেগমের নামানুসারেই এই ক্ষুদ্র প্রাসাদের নামকরণ হইয়াছিল।

পিতার সহিত দ্বিতীয়বার মিলনের পর, সেলিম কয়েক মাস আগরা প্রাসাদেই ছিলেন। কিন্তু চক্রান্তসংকুল রাজপ্রাসাদে দীর্ঘকাল নিঃসহায় অবস্থায় থাকিতে, তাঁহার সাহস হইল না। ইহার পরই খসরুর সহিত হাতীর লড়াই লইয়া মনোবাদের ব্যাপারটি ঘটিল। সেলিম দেখিলেন, শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন, সম্রাট তাঁহার "দুধ্‌ভাই" খাঁ আজিজের হস্তেই রাজ্যসংক্রান্ত সমস্ত জরুর কাজের ভার দিয়াছেন। পাঠক জানেন, এই খাঁ আজিজ খসরুর শ্বশুর, আর তাঁহার বৈবাহিক মহারাজ মানসিংহের

পরম বন্ধু। ইচ্ছা করিলে, আর সুযোগ ঘটিলে, ইহাঁদের চক্রান্তেই সুলতানের সকল সুখস্বপ্নের অবসান হইতে পারে।

পার্শ্বচর ওমরাহগণের উপদেশে, আর নানাদিক দিয়া বিপদ ও নিরা-পদের অবস্থা বিচার করিয়া সেলিম সিদ্ধান্ত করিলেন, যমুনার অপরপারে শাহী-মঞ্জিলে কিছুদিন বাস করাই তাঁহার পক্ষে নিরাপদ ও যুক্তিযুক্ত। আগরা-প্রাসাদের অনেক সম্ভ্রান্ত ও শক্তিমান ওমরাহ তাঁহার স্বপক্ষে। তিনি তাঁহাদের নিকট আগরা রাজপ্রাসাদের সকল গুহ্য সংবাদই পাইতে ছিলেন। আর এই শাহী-মঞ্জিল হইতে যমুনা পার হইয়া পীড়িত ভগ্নস্বাস্থ্য সম্রাটকে নিত্য একবার করিয়া দেখিয়া আসাও, তাঁহার পক্ষে কোনরূপ অসুবিধাকর হইল না।

এই শাহী-মঞ্জিলে, থাকিতেন কেবল সুলতান আর তাঁর প্রিয়তমা পত্নী শাহী-বেগম বা যোধাবাই। আর তাঁহাদের বান্দা বাঁদীগণ। সম্রাটের আদেশে খসরু যে ফতেপুরে চলিয়া গিয়াছেন, এ কথা তাঁহারা দুইজনেই জানিতেন। সুলতান সেলিম ইহাতে তিলমাত্র ব্যথিত নহেন। কিন্তু খসরুজননী শাহী-বেগম, এজন্য বড়ই একটা মর্ম্মযাতনা ভোগ করিতেছেন। তাহার প্রধান কারণ,—সম্রাটের সাংঘাতিক পীড়া, দ্বিতীয় কারণ, হাতীর লড়ায়ের শোচনীয় ব্যাপারে, পিতাপুত্রের মধ্যে পুনর্ম্মিলনের সম্ভাবনাবিহীনতা ও মনান্তর।

শাহী-বেগম তাঁহার সহোদরকে বড়ই অবিশ্বাস করিতেন। এ দুনিয়ায় যদি কেহ খসরুর মগজ একেবারে বিগড়াইয়া দিতে সক্ষম থাকেন, তাহার মনে সম্রাট হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা বদ্ধমূল করিয়া দিতে পারেন, যদি কেহ খসরুকে এই কুপরামর্শের সঙ্গে, প্রবল সেনাশক্তি, আর

অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে পারেন, তাহাহইলে সেই শক্তিমান পুরুষদ্বয় আর কেহই নহেন, কেবল তাঁহার সহোদর মানসিংহ, আর তাঁহার বৈবাহিক খাঁ আজিজ।

সুলতান সেলিমের, আর এক রাজপুত-পত্নী ছিলেন। তাঁহার নাম জগৎবাই। তিনি মাড়বারের মোটা-রাজা উদয়সিংহের কন্যা। ইতিহাসে তিনি "জগৎ-গোঁসাইনী বেগম" বলিয়া সুপরিচিত। এই জগৎবাই বেগমই ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট শাহজাদা খুরমের (শাহজাহানের) জননী। কিন্তু অন্যান্য বেগমদিগের তুলনায়, সুলতান সেলিম তাঁহার প্রথমা পত্নী অম্বর-রাজকন্যা, মানসিংহের ভগ্নি, যোধাবাই বা শাহী-বেগমকে বড়ই ভাল বাসিতেন। কেননা এই যোধাবাই রূপে, গুণে, পতিপ্রেমে অতুলনীয়া ছিলেন। আকবরশাহের আদরিণী পুত্রবধূ এই শাহী-বেগম। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞী এই—শাহী-বেগম। কিন্তু এত সুখের মধ্যে থাকিয়াও, এই গৌরবমণ্ডিতা, পত্যানুরক্তা, স্বামীর আদরে আদরিণী শাহীবেগম মহা অসুখী। আর এই অসুখের কারণ, তাঁহার অবাধ্য পুত্র খসরু, স্বার্থপর অগ্রজ মহারাজ মানসিংহ, আর কূটচক্রী বৈবাহিক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুলতান সেলিম শাহী-মঞ্জিল হইতে প্রতিদিন পরপারস্থিত আগরা-প্রাসাদে ভগ্নস্বাস্থ্য পিতাকে দেখিতে যাইতেন। আবার সন্ধ্যার সময়, তাঁহার নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া আসিতেন। সেদিন প্রাসাদে ফিরিতে তাঁহার অত্যাধিক বিলম্ব হইতেছিল দেখিয়া, শাহী-বেগম, বড়ই উৎকণ্ঠিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তিনি অধীরচিত্তে, উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে, সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দারুণ দুশ্চিন্তা, অসার দুর্নিমিত্ত কল্পনা, তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে এক
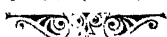
বিপ্লবময় মহা ঝটিকা উৎপাদন করিল। সেই সরস হাস্যলহরীমাখা মুখে, যেন প্রলয়ের কৃষ্ণমেঘের মত বিষাদময় অবস্থা দেখা দিল। তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য, সঙ্গীতসুদক্ষা বাঁদীরা বীণ্ ও সারঙ্গের সুরে মধুর সঙ্গীতোচ্ছাস তুলিয়া, তাঁহার প্রাণে একটু প্রফুল্লতা আনিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাও তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি অস্থির হৃদয়ে, জ্বালাময় প্রাণে, তাঁহার কক্ষের সম্মুখবর্ত্তী এক উন্মুক্ত হাওয়া-খানায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু সেই চন্দ্রালোকসমুজ্জ্বল নিশায়, কালিন্দীর শীকরকণা পরিচুম্বিত স্নিগ্ধ নৈশবায়ুও তাঁহার হৃদয়ের জ্বালাময় উষ্মা লাঘব করিতে পারিতেছিল না।

নেত্রসম্মুখে অনন্তদিকপ্রসারিত নক্ষত্রখচিত সুনীলিম ব্যোমতল, সুনির্ম্মল চন্দ্রকিরণ স্রোতে, শাহী-মঞ্জিলের গগনস্পর্শী মিনার ও স্তম্ভগুলি রজতস্রোত পরিপ্লাবিত। নিষ্কলঙ্ক রজত দীপ্তিময় অতি, শুভ্র, অমৃতবর্ষী সুধাংশুকরলেখা, সুনীলসলিলা মৃদুকলনাদিনী ধীরতরঙ্গময়ী, যমুনার চঞ্চল সলিলে পড়িয়া যেন চূর্ণীকৃত হীরকখণ্ডের মত দেখাইতেছে। আর সেই শতধাবিচূর্ণ, চন্দ্রকিরণরাগরঞ্জিত মৃদুবায়ুবিতাড়িত চঞ্চলোর্ম্মি, ঠিক যেন তাঁহার চঞ্চল ভাগ্যের মত। কখন যে কি পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহার স্থিরতা নাই!

শাহী-বেগম মনে মনে ভাবিতেছেন—"হায়! কেন অম্বর রাজবংশে জন্মিয়াছিলাম? কেন মোগল-বাদশাহের পুত্রবধূ হইয়াছিলাম? কেন এমন কুলাঙ্গার পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম? কেন এমন কূটচক্রী স্বার্থপর সহোদরের ভগ্নিরূপে, এই দুনিয়ায় আসিয়াছিলাম? দিল্লীশ্বরের পুত্রবধূ হওয়ার ত এই সুখ! অই ত অপর পারে, সহস্র

দীপালোকিত আগরার রাজপ্রাসাদ! ঐ প্রাসাদের সর্ব্বোচ্চস্থানেই ত সম্রাটের শয়ন-কক্ষ! অসংখ্য সমুজ্জ্বল স্ফটিকদ্বীপ ত ঐ রাজকক্ষ চির পূর্ণিমাময় করিয়া রাখিত। সেই সংখ্যাহীন সুগন্ধ দীপপ্রভা যমুনার বুকে পড়িয়া, কম্পায়মান হীরকচূর্ণের মনোরম দৃশ্য বিকাশ করিত। আজ সে কক্ষের দীপালোক অত জ্যোতিবিহীন কেন? হায়! তবে কি আমারই সর্ব্বনাশ হইয়াছে! কুটচক্রীদের চক্রান্তে, সুলতান বন্দী হইয়াছেন? আর—আর—আমার গর্ভজাত বিপথচালিত অবাধ্যপুত্র মোগলরাজকুলকলঙ্ক খসরু, তাহার মাতার অকালবৈধব্য সূচনা করিয়া, শোণিতকলঙ্কমাখা হস্তে রাজমুকুট পরিয়াছে! হায়! হতভাগ্য খসরু! কি সর্ব্বনাশ করিলি তুই?"

এই সময়ে সেই হাওয়া-বারান্দার বিরলান্ধকারময় এক স্তম্ভপার্শ্ব হইতে শাহী-বেগমের কথার—প্রতিধ্বনি করিয়া কে যেন একজন বলিল, "হতভাগ্য খসরু! সত্যই কি সর্ব্বনাশ করিলি তুই?"

শাহী-বেগম চমকিতনেত্রে, কম্পিতহৃদয়ে পিছন ফিরিয়া দেখিলেন—নিকটবর্ত্তী এক রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভান্তরাল হইতে, কে একজন ধীরে ধীরে তাঁহার দিকেই অগ্রসর হইতেছে। শাহী, সন্দেহাকুল চিত্তে ভয়চকিত স্বরে বলিলেন—"কে—কে তুমি? ওখানে দাঁড়াইয়া! তৎপরে একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, স্বয়ং সুলতান সেলিম তাঁহার সম্মুখে।

সুলতান বলিলেন—"শাহী! তুমি কি ভয় পাইয়াছ?"

শাহী-বেগম, সুলতানের কণ্ঠলগ্না হইয়া বলিলেন—"আঃ—কি শান্তি! তুমি আসিয়াছ আমি বাঁচিলাম। বড় জ্বালায় জ্বলিতেছিলাম যে কান্ত! দুষ্ট শয়তান নির্জ্জনে পাইয়া আমায় বড়ই জ্বালাইতেছিল! কি দুশ্চিন্তা!

কি সাংঘাতিক সন্দেহ! কি ভয়ানক দুর্নিমিত্ত কল্পনা! আমার বড়ই ভয় পাইতেছিল।"

সুলতান বলিলেন—"হয়তো তুমি ভাবিতেছিলে—মানসিংহ আর খাঁ আজিজের চক্রান্তে, আমি প্রাসাদমধ্যে বন্দী হইয়াছি। আর তোমার গর্ভজাত সন্তান শাহজাদা খসরু, পিতৃ-শোণিতে তাহার হস্ত কলঙ্কিত করিয়া, মস্তকে রাজমুকুট পরিয়াছে! তোমার শোচনীয় বৈধব্য সৃষ্টি করিয়াছে। কেমন এই কিনা?"

শাহী বলিলেন—"ঠিক তাই! হায়! কেন আমার এমন দশা হইল? খোদা! আমায় এ নরকযন্ত্রণা হইতে রক্ষা কর। আমায় মুক্তি দাও।"

সুলতান সেলিম কঠোর বিদ্রূপের সহিত বলিলেন, "না—ও ভয় তোমার এখন যাইবে না শাহী-বেগম—যতক্ষণ না খসরু ও আমার মধ্যে মোগল মসনদের স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে একটা মীমাংসা হইয়া যায়। খসরুকে কারাবদ্ধ করিয়া, গোয়লিয়র দুর্গে না পাঠাইলে তোমার ভয় ঘুচিবে না। আকবরশাহের মৃত্যু না হইলে, তোমার ভয় ঘুচিবে না। বল দেখি যোধা! সম্রাটপত্নী হওয়ায় সুখ বেশী, আনন্দ বেশী, জীবনের সকল বাসনার সার্থকতা বেশী—না রাজমাতা হওয়ায় বেশী সুখ!"

শাহী-বেগম কম্পিতস্বরে বলিলেন—"না—না, আমি কিছুই হইতে চাহি না। আমি চাই, তোমার শান্তিময় বিপদশূন্য নিরুদ্বেগ জীবন। আমি চাই—এতদিন আকবরশাহের আদরিণী পুত্রবধূরূপে তোমার শাহী-বেগম রূপে, যে দর্প, যে গৌরব, যে সুখ, যে সম্মান, যে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া আসিয়াছি, তাহাই আজীবন ভোগ করিতে। খোদা! তোমায় নিরাপদ করুন।"

সেলিম—একবার সেই মেঘাবৃত, চন্দ্রখচিত সুনীল ব্যোমতলের দিকে, তৎপরে শ্যামসলিলা মৃদুতরঙ্গরঙ্গময়ী যমুনার দিকে চাহিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"না—শাহী-বেগম! বোধ হয় খোদা তোমাকে সে সুখও ভবিষ্যতে ভোগ করিতে দিবেন না। শুনিয়াছ কি তুমি, আমার অবাধ্য পুত্র, সর্ব্বসম্মুখে আমায় অপমানিত করিয়া, যেন আরও দর্পিত হইয়াছে। আমার নিকট কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করিয়া, সে আজকাল মানসিংহের ও খাঁ আজিজের আনুগত্য করিতেছে। মানসিংহ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহাকে অসংখ্য রাজপুত সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবেন। আর তোমার খসরুর গুণধর শ্বশুর—সেই পথের ভিক্ষুক খাঁ আজিজ কোকা, যে একদিন বিশীর্ণমুখে যুক্তকরে কাতরমুখে আমার পিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, অন্নাভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল—আর ভাগ্যগুণে এখন মোগল রাজকোষের অধ্যক্ষ হইয়াছে, সেই শয়তান সম্রাটের কঠিন পীড়ার সময় রাজকার্য্যের সকল ভার পাইয়া তাহার জামাতা খসরুকে সাহায্য করিবার জন্য, রাজকোষের চাবিসংগ্রহ করিয়াছে! আমি দেখিতে চাই, সেই শুভদিন কতদূরে যেদিন পিতাপুত্রে এই ব্যাপারের একটা মীমাংসা হইয়া যাইবে। প্রিয়তমে! আমার নিজের পাপে আমি ভুগিতেছি—এ কথা খুবই সত্য। কিন্তু উদারপ্রাণ, স্নেহময় পিতার চরণে ধরিয়া অনুতপ্তচিত্তে সে পাপের, সে বিদ্রোহাপরাধের জন্য যখনই মার্জ্জনা চাহিয়াছি, তখনই যে পাইয়াছি। কিন্তু এটুকু স্থির জানিও—শাহী বেগম! আকবরশাহের হৃদয়ে যে উদারতা আছে, মার্জ্জনাশীলতা আছে, আমার হৃদয়ে হয়তো তাহা নাই।

শাহী বেগম—স্বামীর মুখে এই সব ভয়ানক কথা শুনিয়া, পুত্র-

স্নেহোদ্বেলিত হৃদয়ে বলিলেন—"তাহাহইলে তোমার অপরাধী অবোধ সন্তান খসরুকে তুমি কি মার্জ্জনা করিবে না?"

সেলিম—এক মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"না শাহী! আমার ইচ্ছা থাকিলেও হয়ত তাহাকে মার্জ্জনা করিতে পারিব না।"

অভাগিনী শাহী বেগম—স্বামীর মুখে এই সব সাংঘাতিক কথা শুনিয়া, মর্ম্মেমর্ম্মে শিহরিয়া উঠিলেন। একটু আগে যে শাহী-বেগম, স্বামীর শোচনীয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, কল্পনাচালিত একটা ভিত্তিহীন বিভীষিকায় বড়ই অধীরা হইয়াছিলেন, তিনি এখন মাতৃস্নেহোদ্বেলিত পুত্রের শোচনীয় পরিণাম চিন্তায় বড়ই অধীরা হইলেন।

শাহী-বেগম উত্তেজিত মস্তিস্কের কল্পনা বলে দেখিলেন—"তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল সন্তান খসরুর তক্তলাভের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছে। সুলতান সেলিম আগরার মসনদ অধিকার করিয়াছেন। খসরু শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায়, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে পিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান। নৃশংস ঘাতকেরা শাণিত কুঠার তুলিয়া, তাহার চারিধার বেষ্টন করিয়া, শিরশ্ছেদনের জন্য, নূতন সম্রাটের আদেশ অপেক্ষা করিতেছে। তার—পর! তার—পর!—খসরুর শোণিতাক্ত ছিন্নমুণ্ড তখনই যেন দেওয়ান-খাসের শ্বেত-মর্ম্মরমণ্ডিত হর্ম্ম্যতলকে শোণিতাক্ত করিয়া, কন্দুকের মত দূরে ঠিকরাইয়া পড়িল। সভার সকলে সে ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে চক্ষুরাবরণ করিল। ওঃ! কি ভীষণ দৃশ্য! ওঃ! কি মস্তিষ্কবিপ্লবকারী বিভীষিকা!

শাহী-বেগম মহা ভয়ে অধীরা হইয়া, তখনই চক্ষুরাবরণ করিলেন। কম্পিতস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"স্বামী তুমি—প্রভু তুমি! শক্তিমান তুমি! ছার নারী আমি! আমার সুখ দুঃখের বিধাতা

তুমি! আমার মহাবিপদে একমাত্র শান্তিদাতা তুমি। স্বামিন্! চিরসদয়! চির প্রেমময়! আমায় বাঁচাও—রক্ষা কর! আব যে সহিতে পারি না। হৃৎপিণ্ড যে ছিন্নবিছিন্ন হইয়া গেল! প্রাণে, মর্ম্মে, হৃদয়ে, বক্ষপঞ্জরে, নেত্রে, মস্তিষ্কে, যেন প্রখর জ্বালাময়ী বিদ্যুৎশিখা ছুটিতেছে। আমি যে তাহাতে পলে পলে দগ্ধিয়া মরিতেছি। শান্তিদাতা আমায় শান্তি দাও। ভর্ত্তা! আমায় ভয়হীন কর। আমায় রক্ষা কর! রক্ষা কর।”

চক্ষু চাহিয়া শাহী-বেগম দেখিলেন—সুলতান সেখানে নাই! নিঃশব্দে তিনি কখন যে সেই স্থান ত্যাগ করিয়াছেন, বেগম তাহা আদৌ জানিতে পারেন নাই। এক মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, যোধাবাই বলিলেন—“তুমি যে আমার প্রতি চিব করুণাময় ছিলে! আজ এত নিষ্ঠুব হইলে কেন? তোমার স্নেহে, যত্নে, আদরে, গৌরবে, গরবিণী হইয়া, আমি যে রাজপুতের দর্প, ভিন্নধর্ম্মী মোগল সম্রাটের পুত্রবধূত্বের হীন কলঙ্ক, সবই ভুলিয়াছিলাম! আমার এ মর্ম্মজ্বালার শান্তি তুমি ভিন্ন আর কে করিবে সুলতান! হিন্দুস্থান তোমার হোক, রাজ্যেশ্বর তুমিই হও, মোগলের রাজকোষ তোমার রাজছত্রের উপর সুবর্ণধারা বৃষ্টি করুক! কোটিশ্বর তুমি—লক্ষ লোকের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা তুমি। কোনও ভিক্ষা আমি তোমার কাছে চাহি না—এ দাসীর একমাত্র ভিক্ষা, তোমার ঔরসজাত সন্তান অই হতভাগ্য খসরুর জীবন! আমার খসরুকে ফিরাইয়া দাও, তাহাকে কারারুদ্ধ করিও না, নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিও না। এই অবাধ্য, অশান্ত, অপরাধী সন্তানকে ব্যাধভয়ভীতা পক্ষিণীর মত বুকের ভিতর লুকাইয়া লইয়া, একবস্ত্রে আমি তোমার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিব,—ভিক্ষান্নে উদর পোষণ করিব। আমি আর আমার

এই অবাধ্য সন্তান, আর কখনও তোমার দ্বারে কৃপা ভিক্ষা করিতে আসিবে না।"

শাহী আর যন্ত্রণা সহিতে না পারিয়া, নিজের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া হর্ম্মতলে লুটাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"আকবরশাহের পুত্রবধূ হওয়ার কি এই সুখ? পবিত্র রাজপুতকুলে জন্মানোর কি এই সুখ? রাজ্যপিপাসু পুত্রদ্রোহী স্বামীর পত্নী হওয়ার কি এই সুখ? বিপথ চালিত অবাধ্য হীনভাগ্য সন্তানের জননী হওয়ায় কি এই সুখ? ভাগ্য! তুমি কি এতই ছলনাময়?

দুগ্ধফেণনিভ শয্যা আশ্রয় করিয়াও, শাহীবেগমের নিদ্রা হইল না। শুভ্রশয্যায় কে যেন অগ্নিকণা ছড়াইয়া দিয়াছে। তাহার কক্ষমধ্যে এক রজত নির্ম্মিত গুলাব-জলের ফোয়ারা ছিল। সেই ফোয়ারা হইতে গুলাব-সারের মনোমদ সুগন্ধ বাহির হইতেছিল। অন্য সময়ে এই চিত্তোদ্‌ভ্রান্তকর মদিরগন্ধ, শাহী-বেগমের বড়ই তৃপ্তিজনক বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু সেদিন যেন তাহা বিকট পূতিগন্ধময় বলিয়া বোধ হইতেছিল।

অন্তরে বাহিরে দারুণ উষ্মা। অবস্থা বুঝিয়া, বাঁদীরা অগুরুবাস-বিলেপিত ব্যজনী লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে যেন আরও জ্বালা বাড়িয়া উঠিল। শাহী-বেগম—রোষভরে গালি দিয়া, তাঁহার চিরানুগৃহীত, চিরাশ্রিত বাঁদীদের সেই কক্ষ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। বাঁদীরা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেল।

বেগমের এই চঞ্চল অবস্থা দেখিয়া, এক সঙ্গীতকুশলা সুন্দরী বাঁদী, বীণা হস্তে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। বসরাই গালিচামণ্ডিত—হর্ম্মতলে বসিয়া, সে বীণাবাদন করিতে লাগিল।

এই বাঁদীর গান শুনিতে, শাহী-বেগম বড়ই ভাল বাসিতেন। কিন্তু সেদিন যেন তিনি দেখিলেন—সেই বাঁদীর কণ্ঠস্বর অতি বিকৃত, আর সুর যেন অতি বেসুরা। বীণার ঝঙ্কার হইতে যেন ভৈরবী আলেয়ার অশ্রুমাখা কাতর ক্রন্দনের সুর বাহির হইতেছে। শাহী-বেগম—তাহার হাত হইতে সবলে বীণাটী কাড়িয়া লইয়া—দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। সুকোমল হস্তের শক্তি প্রয়োগে নিক্ষিপ্ত হইলেও, বীণটা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। শাহী-বেগম বাঁদীকে পদাঘাত করিয়া বলিলেন—"তুই জাহান্নমে যা! শয়তানী! তুইও আমায় কাঁদাইতে আসিয়াছিস্!"

শাহী-বেগম জানিতেন—গভীর রাত্রে বাহিরের মহলে, এক নির্জ্জন কক্ষ মধ্যে বসিয়া, তাঁহার স্বামী সুলতান সেলিম, অনুগত ওমরাহ ও গুপ্ত প্রণিধিগণের নিকট হইতে গুহ্য সংবাদ সংগ্রহ করিয়া, নানাবিধ কূট মন্ত্রণা করেন। সুলতানের সহিত সে রাত্রে সাক্ষাতের আর কোন সম্ভাবনাই নাই। রক্তাম্বুদতুল্য মদিরা, মদালসাময়ী রমণীগণ, সুলতানের উত্তেজিত মস্তিষ্কে শান্তি আনয়ন করিয়া, তাঁহাকে নিদ্রাভিভূত করে। সুতরাং সে রাত্রে তিনি স্বামীর প্রত্যাগমন বা তাঁহার নিকটে গমনের প্রত্যাশা ছাড়িয়া দিয়া, আরও নিরাশা পীড়িতা হইয়া পড়িলেন।

শাহী-বেগম প্রাণে জ্বালা, মর্ম্মে অশান্তি লইয়া,—স্নিগ্ধ হইবার বাসনায় বাতায়ন পথে গিয়া দাঁড়াইলেন। সমস্ত আকাশ ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া চাঁদ তখন আকাশের এক দিকে হেলিয়া পড়িতেছে। যেন সে যমুনায় ডুবিবার চেষ্টা করিতেছে। গবাক্ষ নিম্নের গুলাববাগ হইতে, গুলাব ও চামেলির মিশ্রগন্ধ মলয়বাহিত হইয়া, সেই কক্ষমধ্যে বাতায়ন পথে প্রবেশ করিতেছে। তবু তাহাতে তৃপ্তি নাই—আনন্দ নাই—শান্তি

নাই—প্রীতি নাই! মানুষের মনের মধ্যেই ত সব। স্বর্গ, নরক, সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি, তৃপ্তি সবইতো এই মনের ভিতর।

শাহী মনে মনে ভাবিলেন—"চাঁদ যমুনা সলিলে ধীরে ধীরে ডুবিতেছে কেন? তাহারও মনের অবস্থা কি আমার মত বিপ্লবময়! এই বাতায়ন পার্শ্ববর্ত্তী বারান্দার নিম্নেই ত যমুনার—শ্যামসলিলরাশি, মৃদুগর্জ্জনে সঙ্গমের পথে ছুটিয়াছে। কত—গভীর, কত স্নিগ্ধ—কত শান্তিকর এই যমুনার জল। ডুবিয়া মরিলে কি হয় না? আমার এ বিষের জ্বালার কি শান্তি হয় না! নিজের মৃত্যুতো—নিজের হাতে! ঐ যমুনায় ডুবিলে ত সব জ্বালা মিটিয়া যায়। তবে অনর্থক এ দারুণ দুশ্চিন্তার চিতানলে পুড়িয়া মরিতেছি কেন?"

পরক্ষণেই ভাবিলেন—"এ সংসারে যাহা কিছু সুখের, সৌভাগ্যের পরিচয়, তাহার সবই তো পাইয়াছি। যখন এত সুখেও আমার এত দুঃখ, আর দুঃখ সহিতেই যখন এই ধরায় আসিয়াছি, তখন আমার মরাই ভাল! স্বামী হৃদয়হীন, পুত্র অবাধ্য, প্রাণ—জ্বালাময়। তবে মরিব না কেন?"

না—আমার মরা হইল না। যমুনার শ্যামতরঙ্গমণ্ডিত চূর্ণচন্দ্রকরচুম্বিত, কৃষ্ণসলিলে আমার ডুবিয়া মরা হইল না। কে আমার এ সাধের মরণে বাধা দিতেছে? আর কেউ নয়—কেবল সেই খসরু! সে যে কাতর কণ্ঠে, বলিতেছে—"মা! তুমি মরিও না, তুমি মরিলে আমার কত দুর্দ্দশা হইবে, তাহা একবার ভাবিয়াছ কি? তোমার স্নেহের আদরের এই সর্ব্বস্বধন খসরু যে তার নিষ্ঠুর পিতার আদেশে, কারানিক্ষিপ্ত হইবে। বিষপ্রয়োগে, বা গুপ্তঘাতকের অস্ত্রে, তোমার পুত্রের অতি শোচনীয়

মৃত্যু ঘটিবে! তুমি বাঁচিয়া থাকিলে, নিষ্ঠুর পিতার চরণে ধরিয়া ত এ ভয়াবহ মৃত্যুর প্রতিকার করিতে পার। না—মা, তুমি মরিও না! আমি অবাধ্য, অশান্ত, পিতৃদ্রোহী, কুপথচালিত, রাজ্যলোভী কিন্তু মাতৃদ্রোহী নহি! সবাই আমায় ত্যাগ করিতে পাবে, এমন কি খোদা পর্য্যন্ত আমায় ত্যাগ করিতে পারেন—কিন্তু তুমি পারিবে কি? তুমি—যে, আমার মা! তুমি যে রাজপুত কুমারী—তুমি যে মোগলের রাজকুললক্ষ্মী!

আর কি মরা হয়! কোথা হইতে আমার প্রাণে, এ সব চিন্তার উদয় হইতেছে? না—মরিব না! কোন্ দুঃখে মরিব! আকবরশাহের পুত্রবধূ আমি। ভবিষ্যৎ রাজরাজেশ্বর এই বিশাল হিন্দুস্থানের দণ্ডমুণ্ড বিধাতা সুলতান শাহজাদা সেলিমের ধর্ম্মপত্নী আমি। রাজরাজেশ্বরীর শ্রেষ্ঠাসনে বসিয়া, কোন্ অভাবে, কোন্ মর্ম্মজ্বালায়, কোন্ দুঃখে, এ সুখ-স্বপ্নভরা দুনিয়া হইতে দীন ভিখারিণীর মত সরিয়া যাইব? না—না, মরা হইবে না। যাহাতে আকবরশাহের দেহান্তের পর এই হিন্দুস্থানের রাজ্যেশ্বরী হইতে পারি, তাহার চেষ্টা করিব। তখন সম্রাজ্ঞীরূপে, জননীরূপে, আমি আমার খসরুকে রক্ষা করিব।"

এইরূপ মস্তিষ্কবিপ্লবকারী বহুবিধ চিন্তার পর, শাহী-বেগম, বাতায়ন পথ ত্যাগ করিয়া পুনরায় শয্যায় আসিলেন। এবার সর্ব্বদুঃখনাশিনী, শান্তিদায়িনী, সর্ব্বসন্তাপহারিণী, স্বপ্নসঙ্গিনী নিদ্রা আসিয়া, তাঁহার নলিন নয়নের পক্ষ্মপুটে, মোহের অঞ্জন মাখাইয়া দিল। শাহী-বেগম, জাগ্রতে জ্বালায় জ্বলিতেছিলেন। নিদ্রায় যেন একটু শান্তি পাইলেন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই, তিনি খসরুকে এক পত্র লিখিলেন—"তোমার পিতামহের বড়ই সংকট পীড়া। বাঁচিবেন কিনা সন্দেহ। এই

পত্র পাঠ মাত্র আগরায় চলিয়া আসিবে। মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিও না।
আগরা প্রাসাদে আমার মহলেই তুমি আমার সাক্ষাৎ পাইবে।"

সুলতানকে না জানাইয়া, তাঁহার এক বিশ্বস্ত রাজপুত সেনানীকে দিয়া, সওয়ার ডাকে শাহীবেগম, এই পত্রখানি খসরুর নিকট ফতেপুর শিক্রিতে পাঠাইয়া দিয়া, প্রাণে যেন একটা মহা শান্তিলাভ করিলেন হায় জননী! হায় রমণী। হায়! তোমার পুত্রস্নেহ!

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

যে বাঁদীর সহিত ফকিরবেশী দুর্জ্জয়সিংহের সাক্ষাৎ হইয়াছিল—সেই বাঁদীই খসরুকে উদ্যান মধ্যে সংবাদ দিতে গিয়াছিল—এক বৃদ্ধ ফকির তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, কক্ষমধ্যে অপেক্ষা করিতেছেন খসরু নিজের উদ্যান হইতে বাহির হইয়া, গুল্‌বাগে আসেন। কাজেই বাঁদী, উদ্যানবাটিকা মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, ফিরিয়া আসে।

এ দিকে রোজিয়াও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ণিমাকে দেখিতে না পাইয়া, তাহার সন্ধানে গুল্‌বাগে যায়। সেখানে সে শাহজাদাকে বেদীর পার্শ্বে মূর্চ্ছিতাবস্থায় দেখিয়া, একটা মহা সোরগোল উপস্থিত করে। পরে বান্দারা খসরুর মূর্চ্ছিত দেহ বহন করিয়া তাঁহার কক্ষে লইয়া আসে।

সে আজ তিনদিনের কথা। খসরু এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন বটে,

কিন্তু সেই অপরিচিত ফকির যে কে, তাহার কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া, বড়ই একটা সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছেন।

খসরুর মনের অবস্থা অতি ভয়ানক। তাঁহার বিষণ্ণ চিত্ত কোন মেতই পূর্ব্বাবস্থায় আসিতেছে না। খসরু, সর্ব্বদাই পূর্ণিমার কথা ভাবিতেছেন। যে জিনিসের জন্য লোকে একটা বেশী আকাঙ্ক্ষা করে, সেটা না পাইলে, তাহার সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাটা যেন নিষ্ফলতার ফলে আরও বাড়িয়া যায়। পূর্ণিমার এই বিরাগের জন্যই খসরুর অনুরাগটাও খুব বাড়িয়া উঠিতেছিল। খসরু মনে মনে ভাবিতেন—শীঘ্রইত আমায় আবার আগরায় যাইতে হইবে। সম্রাটের পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে—বাঁচিবেন, কিনা সন্দেহ! মহারাজ মানসিংহও আমাকে বিশেষ জেদ করিয়া আগরায় যাইতে লিখিয়াছেন। যদি ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে, মোগলের মসনদ আমারই হয়, তাহাহইলে ঐ শয়তানী পূর্ণিমাকে যে উপায়ে পারি, আমার বাঁদীর বাঁদী করিব।"

নির্জ্জন কক্ষমধ্যে বসিয়া খসরু যখন, পূর্ণিমার উপর ভীষণ প্রতিশোধ কল্পনা করিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে, শাহী-বেগমের সেই জরুর পত্রখানি তাঁহার নিকটে পৌছিল। পত্রখানি পড়িয়া, তাঁহার মন বড়ই চঞ্চল হইল। কেননা—ফতেপুর শিক্রি ত্যাগ করিয়া শীঘ্র আগরায় চলিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া, মহারাজ মানসিংহও তাঁহাকে এইভাবের একখানি জরুর রুবকারী লিখিয়াছিলেন। এ সব ত্বরিত আহ্বানের মধ্যে, নিশ্চয়ই কোন ভয়ানক ব্যাপার নিহিত আছে ভাবিয়া, খসরু কাল-বিলম্ব না করিয়া, সেই দিনই পঞ্চাশত সওয়ার সমভিব্যাহারে, আগরার পথ ধরিলেন।
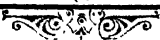
খসরু যে সময়ে আগরার পথে, সেই সময়ে আগরা প্রাসাদে, সম্রাটের কক্ষ মধ্যে আর এক সাংঘাতিক ব্যাপারের অভিনয় সূচনা আরম্ভ হইয়াছিল। সে ব্যাপারটি এই।

সম্রাটের পীড়া বড়ই বৃদ্ধি হইয়াছে। পীড়া—কষ্টকর প্রবাহিকা। সম্রাটের প্রধান চিকিৎসক হাকিম আলি মির্জ্জা, চিকিৎসার জন্য আহূত হইয়াছেন। তখনও সম্রাটের দেহে শক্তি যথেষ্ট। এই শক্তির জোরে তিনি সারিয়া উঠিবেন, ইহা ভাবিয়া হাকিম আলি পীড়ার প্রথমাবস্থায় কোনরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিলেন না। এইরূপে আট দিন কাটিল। নবম দিনে হাকিম আলি সম্রাটকে বলিলেন—"জাঁহাপনা! যদি অনুমতি করেন এইবার আমি ঔষধ দিই। এই বার্দ্ধক্যে ক্রমাগতঃ রোগ উপেক্ষার ফল হয়ত সহসা সাংঘাতিক হইতে পারে।"

সম্রাটের শরীরও বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। তিনি আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। রাজ-চিকিৎসকের ঔষধে, আমাশয় আরাম হইয়া গেল বটে, কিন্তু জ্বর দেখা দিল। চিকিৎসকের মুখ বড়ই বিষণ্ণভাব ধারণ করিল। হাকিম আলি সম্রাটের পার্শ্বচর ও মোগল দরবারের প্রধান চিকিৎসক। সম্রাট দরবারে আমীর ওমরাহ দলের লোক। কিন্তু তাঁহার মনে কেমন একটা বিশ্বাস জন্মিল, যে এ যাত্রা সম্রাটকে এই রোগের মুখ হইতে বাঁচান বড়ই দুর্ঘট হইবে। নিতান্ত বিশ্বস্ত দুই একজন আমীর-ওমরাহ যাঁহারা সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ, তিনি তাঁহাদেরই কেবল সম্রাটের সাংঘাতিক পীড়ার কথা বলিলেন। এই শ্রোতাদের প্রধান হইতেছেন—খাঁ আজিজ। শাহজাদা খসরুর শ্বশুর। খাঁ আজিজের নিকট হইতে মানসিংহ এ গূহ্য সংবাদটী শুনিলেন।

অদৃষ্ট প্রেরিত নিয়তি চক্র আবার এক সংকট ক্ষেত্রে মহাবেগে আবর্ত্তন করিল।

সম্রাট স্বর্ণখচিত শয্যায় শায়িত। সময় অপরাহ্ন। কক্ষের বাতায়ন দ্বার উন্মুক্ত। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তরাগকিরণ, প্রাসাদচূড়ায় পড়িয়াছে। নীল যমুনার কালো বুকে, কে যেন রক্তচন্দনের প্রলেপ দিয়া গিয়াছে। বড়ই সুন্দর সময়। কিন্তু সম্রাটের মনে, এ বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনে, আর পূর্ব্বের সে আনন্দ নাই। কেননা—তাঁহার আয়ু-সূর্য্য অস্তমিত প্রায়।

শয্যাশায়িত সম্রাট, এখন নির্জ্জনতার বড়ই প্রিয়। কেহ তাঁহার সম্মুখে আসিলে, তিনি বড়ই বিরক্তি বোধ করেন। রাজান্তঃপুরিকাদের সহসা কক্ষমধ্যে আসিবার হুকুম নাই। সম্রাটের শয্যাপার্শ্বে থাকে কেবল চারিজন চিরানুগৃহিতা বিশ্বস্ত বাঁদি।

সম্রাট চক্ষু মুদিয়া ভাবিতেছেন—এই গোধুলিরাগরঞ্জিতা হাস্য মুখরিতা প্রকৃতির বুকে, যেমন এইবার নিশার কৃষ্ণছায়া ব্যাপ্ত হইবে, উজ্জ্বল মেদিনী অন্ধকারময়ী হইয়া মৃত্যুর অধীন হইবে, একদিন হয়ত এইরূপ এক সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই, আমার এ জীবন সূর্য্য, কালের অন্ধতমসময় গর্ভে চিরদিনের মত অস্তমিত হইবে। এই ধনজন পূর্ণ, সৌভাগ্য সম্পদময়ী আগরা, এই রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত বিরাট ভূধরের মত মোগলের দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ, এই অগণ্য সুন্দরীর পদাঙ্কচিহ্নিত কোলাহল মুখরিত রঙ্গমহাল—এই অসংখ্য রাজন্যবর্গ পূর্ণ আমখাস্‌ ও দেওয়ানীখাস্‌ সবই থাকিবে—চলিয়া যাইব কেবল আমি। নানা রাজ্যজয়ে, লুণ্ঠনে কোটী কোটী মুদ্রার সমুজ্জ্বল জহরত মণিমুক্তা আমার রাজ ভাণ্ডারে সঞ্চিত

তাহাতো আর আমার অঙ্গশোভা বৰ্দ্ধন করিবে না। আমার ভাগ্যবলে বাহুবলে অৰ্জ্জিত এই বিশাল হিন্দুস্থান, এই বাদশাহীর দর্প ও গৌরব এই অরাতিহৃদয়স্তম্ভনকারী দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, এই "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" স্তুতিগানের তীব্র প্রতিধ্বনি, হৃদয়স্তম্ভনকারী সমর জয় নিনাদ "আল্লাহো-আকবর" আরতো আমার চিত্তের ও শ্রোত্রের তৃপ্তি বিধান করিতে পারিবে না। হায় মৃত্যু! তুমি কি এতই ভীষণ! মরুভূমির খরোষ্ণ বায়ুপ্রবাহ মধ্যে একদিন যে নিশ্বাস বহিয়াছিল, এই অগণ্য আলোকমালা মণ্ডিত রত্নখচিত, পুষ্পবাস বাসিত, রাজপ্রাসাদেই কি তাহার পরিসমাপ্তি হইবে?

তিন পুত্র আমার। সবাই আমার নয়নানন্দ বৰ্দ্ধন, জীবনের বন্ধন, শূরবীর, সাহসে অদ্বিতীয়, রণে অজেয়। তাহাদের দুইজন গিয়াছে, আছে কেবল একজন। সে আমার অবাধ্য, তবুও স্নেহময়। সে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান সেলিম। সহস্র অপরাধে সে আমার নিকট অপরাধী। কিন্তু আমার অফুরন্ত পুত্রবাৎসল্য, তাহার সকল অপরাধকেই বালকের অপরাধের মত উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। সেলিমের মত প্রিয়, সুদর্শন, পিতৃভক্ত, স্নেহশীল পুত্র ত আর আমার নাই! আমার সাধের হিন্দুস্থান যে এই সেলিমকে দিয়া যাইব—মরণের সময়ে ইহাতেই আমার যথেষ্ট শান্তি!

আর হতভাগ্য খসরু! সে আমার আদরের পৌত্র। সেলিমের সন্তান সে—সেলিমের চেয়েও সে আমার বেশী প্রিয়! কিন্তু সে অবাধ্য পিতৃদ্রোহী। আমার জীবদ্দশায় সে আমার জীবনোপম পুত্র, আমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, সুলতান সেলিমকে সর্ব্বসমক্ষে অপমান করি

য়াছে। সে অপমান আমার। আমার পুত্রকে যে এ ভাবে উপেক্ষা করিতে পারে, সে আমার চক্ষে ত্যজ্য—ঘৃণ্য, অপদার্থ, অতি হেয়! আমি যে এই খসরুকে সমগ্র দাক্ষিণাত্যের একচ্ছত্রা অধিকার দিয়া যাইব সঙ্কল্প করিয়াছিলাম! কিন্তু এ সব ঘটনার পর, সে যে আমার চক্ষুশূল হইয়াছে। সে যে আমার এ স্নেহময় হৃদয় হইতে জন্মের মত নির্ব্বাসিত—বিতাড়িত।

কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী, মোগল-সম্রাটের মনের অবস্থা যখন এইরূপ, সেই সময়ে একজন বাঁদী সংবাদ আনিল—শাহজাদী বেগম যোধাবাই সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের সম্মতি প্রার্থিনী।

সম্রাট, তখনই সেই বাঁদীকে সম্মতিসূচক আদেশ প্রদান করিলেন। বস্ত্রালঙ্কার ভূষিতা, অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যময়ী, সম্রাট আকবরের আদরণীয়া পুত্রবধূ অম্বর রাজকন্যা যোধাবাই, সম্রাটের অনুমতি পাইয়া সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যে দুইজন বাঁদী তখন ভারত-সম্রাটের পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহারা ইঙ্গিতমাত্রেই সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

শাহী-বেগম যোধাবাই, যথারীতি কুর্ণীস করিয়া, সম্রাটের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মলিনমুখে বলিলেন—"দয়াময় খোদা—দুনিয়ার বাদশা, শাহ্-ইন্-শাহকে দীর্ঘ জীবন দান করুন।"

আকবরশাহ স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"আসিয়াছ মা! ভালই হইয়াছে। একটা কথা তোমায় বলিবার জন্য বড়ই উৎসুক ছিলাম। তোমার ঐ মঙ্গল কামনা, বোধ হয় এবার খোদার চরণতলে পৌছিবে না। সেই দয়াময় বিধাতা আমায় অনেক দিয়াছেন—কিন্তু আমি তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য কিছুই দিই নাই। বীরত্বের মদগর্ব্ব, ঐশ্বর্য্যের গরিমা, বাহুবলের দর্প, হিন্দুস্থানের বাদশাগিরির অভিমান, ইহাতেই এতদিন

মোহাচ্ছন্ন ছিলাম। কিন্তু এতদিন পরে আমার সে ভ্রম ভাঙ্গিয়াছে; যোধা! শাহী! বড় আদরের গরবিনী পুত্রবধু তুমি আমার। হিন্দু ও মুসলমানকে প্রীতির বন্ধনে বাঁধিবার জন্য, হিন্দুস্থানে মোগল-সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল দৃঢ় করিবার জন্য, আমিই এই মোগলরাজবংশের কুললক্ষ্মীরূপে, তোমায় আমার প্রাসাদে বরণ করিয়া আনিয়াছি। অম্বররাজকন্যা, যাহাতে ভারতেশ্বরী হইতে পাবেন, তাহাই আমার অন্তিম বাসনা। সুলতান সেলিম ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট। তুমি ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞী। সাতটি দিনের আবর্ত্তনে, হয়ত এই মহা পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে মা।"

যোধা সম্রাটের এই সব মর্ম্মস্পর্শী কথা শুনিল। আনন্দের পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রাণ মহাবিয়োগাশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল! সম্রাটের সেই কান্তিময় বিশাল দেহ যে কালিমাময় মৃত্যুচ্ছায়া সমন্বিত হইতেছে—তাহাও সে বুঝিল। আর বুঝিল—এ সম্রাজ্ঞীর পদলাভে তাঁহার কোন আনন্দই নাই। তাঁহার স্বামী সুলতান সেলিম, কখনই ত মার্জ্জনাশীল নহেন। খসরু যে তাঁহার চক্ষে বড়ই অপরাধী। কোনরূপেই যে তাহার নিস্তার নাই।

যোধার নলিননেত্র অশ্রুপূর্ণ হইল। সে সমস্ত অশ্রুর একটী বিন্দু আকবরশাহের হস্তের উপর পড়িল। সম্রাট পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া যোধার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তুমি কাঁদিতেছ কেন মা! ভারতের রাজরাজেশ্বরী তুমি! তোমার চক্ষে অশ্রুজল! আমায় একটু শান্তিতে মরিতে দাও। তোমার অশ্রুজল দেখিয়া মরিলে আমি যে বেহেস্তে গিয়াও শান্তি পাইব না। চাঘটাই-বংশের কুললক্ষ্মী তুমি। এ

সংসারে নিত্যইত যোগ-বিয়োগ ঘটিতেছে। নূতনকে স্থান দিয়া পুরাতন ত চিরদিনই সরিয়া যায়। আমার জন্য চিন্তা করিও না। বৃথা কাতর হইও না। তোমাদের রাজপুতের স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ়তায়, চিত্তকে পাষাণ কর।"

যোধাবাই বলিলেন—"ভারতেশ্বর! শাহ্-ইন্-শাহ! দুনিয়ার মালেক এ বাঁদীর একটী ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে, তাহা পূরণ করিবেন কি?"

আকবর যোধাবাইয়ের মুখের দিকে বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া বলিলেন—"কি প্রার্থনা মা তোমার! কোটী কোটী টাকার মণিমাণিক্যপূর্ণ রত্ন-ভাণ্ডার, তোমাকে ও সেলিমকে দিয়াছি যে সিংহাসনে বসিয়া এখনও আমি হিন্দুস্থানের সম্রাট, তাহাও তোমাদের দিয়াছি। না—না, আর একটী জিনিষ তোমাকে এখনও দিই নাই।"

শয্যা হইতে অর্দ্ধোত্থিত ভাবে উঠিয়া, আকবরশাহ তাঁহার উপাধান নিম্ন হইতে এক ক্ষুদ্র কুঞ্জিকা বাহির করিয়া, শাহী-বেগম যোধাবাইয়ের হস্তে দিয়া বলিলেন—"পার্শ্বের তোষাখানা গৃহে গজদন্তনির্ম্মিত এক সিন্ধুক আছে, তাহার এই চাবি। চাবি খুলিলেই তার মধ্যে আর একটী ক্ষুদ্র পেটিকা পাইবে। তাহা আমার নিকট লইয়া আইস!"

শাহীবেগম তখনই পার্শ্বের কক্ষে চলিয়া গেলেন। ফিরিতে অতি সামান্য বিলম্ব হইল। সেই পেটিকাটী খুলিয়া, আকবরশাহ, এক দীপ্তিময় হীরকহার, ও একছড়া মতিরমালা বাহির করিয়া শাহী-বেগমের হাতে দিয়া বলিলেন—"তুমি ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞী। এই হীরকহার তোমার অভিষেকের মঙ্গলাশীর্ব্বাদ। গোলকুণ্ডা বিজয়ের পর, সেখানকার বহুমূল্য হীরকে তোমার জন্যই এ কণ্ঠহার নির্ম্মিত। এর মূল্য—কোটী টাকা। আর এ মতিরমালা ছড়াটী খুবই বহুমূল্য। এটি তোমার

পুত্রবধূ—আমার আদরিণী পেয়ারা-বেগমকে পরিতে দিও। আহা! সে মতির মালা পরিতে কত ভালবাসে।”

সম্রাটের দান—ইচ্ছা না থাকিলেও, শাহী-বেগম তাহা অবনতমস্তকে গ্রহণ করিলেন। তারপর বিচলিত স্বরে বলিলেন—“আমি এ রত্নের প্রত্যাশায় আপনার কাছে আসি নাই। আমার নারীজীবনের খুব বহুমূল্য রত্ন যেটি, তাহা আমায় ভিক্ষা দিন সম্রাট্।

আকবরশাহ এক মহা সমস্যার মধ্যে পড়িয়া বলিলেন—“সমগ্র হিন্দুস্থান তোমায় ত দিয়াছি। এ বিরাট দানের পর তুমি আর কি চাও মা?”

শাহী-বেগম যুক্তকরে বলিলেন—“সমগ্র হিন্দুস্থানের অধিকারে আমার কোন প্রয়োজন নাই—জঁাহাপনা। দাক্ষিণাত্যে বা বঙ্গদেশে যেখানে হউক, আমায় একটী ক্ষুদ্র জায়গীর দিন্। আমি আর খসরু সেখানে গিয়া বাস করি।”

আকবরশাহের রোগকাতর বিশীর্ণমুখে ভ্রুকুটি-ভঙ্গী দেখা দিল। সম্রাট মনে মনে বলিলেন—“শাহী-বেগম! এতক্ষণে তোমার মনের কথা বুঝিয়াছি। দেখিতেছি, তুমিও মানসিংহের ছলনায় ভুলিয়াছ। খসরু মানসিংহকে পৃষ্ঠবলরূপে পাইয়া, আমার রাজ্যাধিকারী পুত্র, তাহার জন্মদাতা পিতাকে, অতি হীনচেতার মত অপমান করিয়াছে। আর তাহাও আমার চোখের উপর। বলিব না ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু এই শোচনীয় ঘটনাই, আমার এই সাংঘাতিক পীড়ার প্রধান কারণ। কেবল তোমার মুখ চাহিয়াই আমি খসরুকে এই অপরাধের জন্য কোন শাস্তি দিই নাই। জানিও শাহি! এখনও আমি এই বিশাল হিন্দুস্থানের মালেক—আকবরশাহ। এখনও এই হিন্দুস্থানের দণ্ডমুণ্ডের

একমাত্র বিধাতা আমি। আর এ কথাও জানিও, যে হিন্দুস্থানের এই মসনদ, মোগলসম্রাট আকবরশাহের জ্যেষ্ঠপুত্রের। খসরুর নয়, খসরুর পৃষ্ঠপোষক অম্বরাধিপ মহারাজ মানসিংহেরও নয়।

এমন সময়ে এক সুন্দরকান্তি যুবক, সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—"সত্যই তাই দুনিয়ার সম্রাট! কিন্তু এ অধম খসরু, হিন্দুস্থানের সিংহাসন চাহে না, মোগল-বাদশাহের উত্তরাধিকারিত্বের দাবি করিতে চাহে না। চাহে—তাহার সন্তপ্তা, শান্তিহীনা, মাতার অশ্রুমোচন করিতে। তাহার চিরবিষণ্ণ মুখে আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটাইতে।"

সম্রাট দেখিলেন—শাহজাদা খসরু তাঁহার শয্যাপার্শ্বে অবনতজানু হইয়া এই সব কথা বলিতেছেন। খসরু, কর্ম্মদোষে এখন আর পূর্ব্বের মত, তাঁহার নয়নানন্দকর নহে। বিরাগ—অনুরাগকে দূরে সরাইয়া দিয়াছে, স্নেহের স্থান—ঘৃণা অধিকার করিয়াছে। সম্রাট এখন খসরুর উপর বড়ই বিরক্ত!

আকবরশাহ বিরক্তির সহিত বলিলেন—"কার হুকুমে তুমি ফতেপুর-প্রাসাদ হইতে চলিয়া আসিলে খসরু?"

খসরু দর্পিতভাবে বলিল—"এই মূর্ত্তিময়ী বিষাদপ্রতিমা স্নেহময়ী জননী, যাঁর স্তন্যপান করিয়া এ দেহের অস্তিত্ব, যাঁর গর্ভে জন্মিয়া আজ আমি মোগল-সম্রাট আকবরশাহের পৌত্র, যাঁর উপদেশে আজও আমি শয়তানের শক্তির অধীন হই নাই, আমার সেই দেবীরূপিণী মাতার আদেশে, আমি এখানে আসিয়াছি সম্রাট!"

আকবরশাহ, খসরুর এ দর্পিত উত্তরে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"রাজ-নীতির সহিত, পারিবারিক ব্যাপারের ত কোন সংস্রব নাই। রাজনীতির

কূট উদ্দেশ্য চালিত হইয়া, আমি তোমায় ফতেপুরে পাঠাইয়াছিলাম। বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম, আমার দ্বিতীয় আদেশ না পাইলে ফতেপুর প্রাসাদ কখনই ত্যাগ করিবে না। ভারতসম্রাটের আদেশ অবমাননার পরিণাম কি তা জান খসরু ?"

খসরু, একটু পূর্ব্বে দ্বারান্তরাল হইতে তাঁহাদের সকল কথোপকথনই শুনিয়াছিল। তখন তাঁহার মস্তিষ্কে এক বিপ্লবময় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। কাজেই খসরু উত্তেজিতভাবে বলিল—"এ অবমাননার ফল কারাগার, আর অপমৃত্যু—তাও আমি জানি সম্রাট! তাহা জানিয়াই ত আপনাব বিনানুমতিতে এ কক্ষমধ্যে আসিয়াছি। কিন্তু আপনিও ত মাতৃভক্ত সন্তান,—রাজরাজ্যেশ্বর! আমার পিতাকে আপনি যে ইলাহাবাদে বন্দী করিতে গিয়াছিলেন, তাহাও ত এক রাজনীতির ব্যাপার! তবে পথিমধ্যে আপনার মাতার সংকট পীড়ার কথা শুনিয়া, তখনি আগরায় ফিরিয়া আসিলেন কেন? রাজনীতির কুটিলপথ ত্যাগ করিয়া, পারিবারিক ব্যাপারের, মমতাসমুজ্জ্বল রাজ্যে প্রবেশ করিলেন কেন? আব মাতৃবিয়োগের পর, এই জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্যে, বালকের মত সাতদিন ধরিয়া পরলোকগতা জননীর জন্য অশ্রু বিসর্জ্জনই বা করিলেন কেন সম্রাট? আপনি শক্তিমান রাজ্যেশ্বর! আমি আপনার শক্তিহীন দীন প্রজা। রাজ-চরণে অপরাধী হইয়া থাকি, যে দণ্ড ইচ্ছা হয় আমায় দিন।"

অন্যসময়ে হইলে রোগজীর্ণ আকবরশাহ হয়তো খসরুর মুখে এই সব যুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া, তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া, সাদরে তাহার মুখচুম্বন করিতেন। কিন্তু রোগধর্ম্মজনিত মস্তিষ্ক ও দেহের যন্ত্রণাময় অবস্থায়, তিনি ভাবিলেন—খসরুর এরূপ বাচালতা, ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতা,

সম্রাটের প্রত্যক্ষ রাজশক্তির অবমাননা বই আর কিছুই নয়! তা' না হইলে আকবরশাহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সে এত দর্পময় কথা বলিতে সাহস করে?

আকবরশাহ বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন—"খসরু! বড় ধৃষ্ট তুমি! বড় দর্পিত তুমি! বড় অবাধ্য তুমি! তোমার এ ধৃষ্টতার ফল তুমি এখনই পাইবে। সম্রাট উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন,—খাঁ আজিজ্?"

রাজকার্য্যের জন্য কখন কি প্রয়োজন হয় ভাবিয়া, খসরুর শ্বশুর খাঁ আজিজ, সম্রাটেরই আদেশে তাঁহার পার্শ্বের একটী কক্ষে দিবারাত্র উপস্থিত থাকিতেন। সম্রাটের আহ্বানে খাঁ সাহেব তখনই কক্ষমধ্যে আসিয়া কুর্ণীস করিয়া, বিস্মিতমুখে বলিলেন—"হুকুম ফরমায়েস করুন—জাঁহাপনা!"

আকবরশাহ—অবিচলিত স্বরে খাঁ সাহেবকে বলিলেন—"এই শাহজাদা খসরু, রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনে ঘোর অপরাধী। ইহাকে ইহার কক্ষ মধ্যেই, শাহজাদার পদোচিত সম্মানের সহিত নজরবন্দী করিয়া রাখিবে। আমার অনুমতি ভিন্ন প্রাসাদের বাহিরে যাইতে দিবে না। খসরুর রক্ষাবিধানের জন্য, তুমিই সম্পূর্ণরূপে দায়ী রহিলে আজিজ খাঁ।"

আজিজ খাঁ বিস্মিতমুখে, খসরুকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। আর শাহীবেগম—হস্তীদন্তনির্ম্মিত রত্নালঙ্কারপূর্ণ সেই পেটিকাটি ঘৃণার সহিত সেই গালিচামণ্ডিত মর্ম্মরময় হর্ম্মতলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, উন্মাদিনীর মত দ্রুতবেগে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

কক্ষ জনশূন্য হইলে, আকবরশাহ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, মনে মনে বলিলেন—"ঠিকই করিয়াছি। মৃত্যু—আমার অতি নিকটে। এখন

সেলিমের ধ্রুব স্বার্থ—আমার চোখের উপরে। প্রকারান্তরে খসরুকে মানসিংহ ও খাঁ আজিজের শয়তানী শক্তির প্রভাব হইতে, কৌশলে দূরে রাখিয়া, সঙ্গত ব্যবস্থাই আমি করিয়াছি। শাহী-বেগম! তোমার প্রার্থনা প্রকারান্তরে পূর্ণ করিয়া, শাহজাদা খসরুকে সুলতান সেলিমের ক্রোধ মুখ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে, আমি যে এই ছোটখাট একটী চাল চালিলাম, তাহা তুমি বুঝিতে পারিলে না—এই আমার মহা দুঃখ।

ক্ষুদ্র হইলেও, এই ব্যাপারটা বড়ই উত্তেজনাময়। এতজ্জনিত উত্তেজনা ফলে সম্রাটের দুর্ব্বল শরীরে একটা অবসাদময় অবস্থা দেখা দিল। তিনি বাঁদীকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া, উত্তেজক সরবৎ ফরমায়েস্ করিলেন।

সরবতের মাদকতার ফলে, সম্রাট দীর্ঘকালের জন্য নিদ্রিত হইলেন। নিদ্রায় তিনি স্বপ্ন দেখিলেন,—খসরু যেন আগরার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে। মানসিংহ ও আজিজ কোকার সহায়তায়, অসংখ্য সেনাবল লইয়া, তাঁহাকে ও তাহার সিংহাসনাধিকারী পুত্র সুলতান সেলিমকে, বন্দী করিতে আসিতেছে।

স্বপ্নের ঘোরে, সম্রাট চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"সেলিম! সেলিম!"

সেলিম সেই সময়ে নিদ্রিত সম্রাটের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে ছিলেন। তখনই তাহার নেত্রসম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "পিতা! এই যে আমি। আপনি কি কোন দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলেন?"

আকবরশাহ নেত্রোন্মীলন করিয়া বলিলেন, "হাঁ! বড়ই কষ্টকর দুঃস্বপ্ন সেলিম! এমন ভয়ানক স্বপ্ন আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। স্বপ্নে দেখিলাম—খসরু যেন অসংখ্য সেনাবল লইয়া আগরা দুর্গ-আক্রমণ করিয়াছে। আমার সাধের আকবরাবাদ, শ্মশানে পরিণত করিয়াছে।

তোমাকে আমাকে হত্যা করিবার জন্য—রঙ্গমহলের চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহাকে আজ মধ্যাহ্নে, আমি নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছি। কেন—জান? তোমারই স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য। যাও সেলিম! একবার গিয়া দেখিয়া এসো, খসরু তাহার কক্ষে আছে, কি সত্যই পলাইয়াছে?"

সেদিন যে সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, সম্রাটের প্রধানা বাঁদীর নিকট সেলিম সবই শুনিয়াছিলেন। সুতরাং পিতার আদেশে তখনই সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"আপনার ও ভীষণ দুঃস্বপ্ন মিথ্যা হইয়াছে জাঁহাপনা! খসরু তার শয়নকক্ষেই নিদ্রিত রহিয়াছে। সাধ্য কে তার, যে সে আগরা দুর্গ হইতে পলায়ন করে।"

সম্রাট একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আঃ বাঁচিলাম! কিন্তু আমার একটী অনুরোধ রাখিবে কি সুলতান সেলিম?"

সেলিম। অনুমতি করুন শাহ-ইন্-শাহ!

আকবর। ভ্রম তো সবাই করে। একটা মহা ভ্রান্তিবশে তুমিও একদিন বিদ্রোহী হইয়াছিলে। বালকের চাপল্য ভাবিয়া, আমি তোমায় মার্জ্জনা করিয়াছিলাম। সে কথা তোমার মনে আছে ত?

সেলিম। আপনার মত মার্জ্জনাশীল উদারহৃদয় পিতা, এ দুনিয়ায় কয়জন আছেন সম্রাট!"

আকবর। তুমি আমার বড় আদরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাহাহইলে তুমিও আমার মত মার্জ্জনাশীল না হইবে কেন সেলিম! তোমার পুত্র খসরুকে নজরবন্দী করিবার জন্য আদেশ প্রদান সময়ে, আমার বুকের কলিজা ফাটিয়া গিয়াছিল; তবুও পাষাণ হইয়া তোমার হিতার্থে তাহা করি-

য়াছি। ভুলিয়া যাইও না—সেলিম! রাজপুতের উষ্ণ রক্ত এই শাহজাদা খসরুর ধমনীতে। বড়ই উগ্র, বড়ই প্রতিশোধপরায়ণ, বড়ই নির্ব্বন্ধ-বান, অসিব্রতধারী এই রাজপুত জাতি। এর প্রমাণ—মেবারের মহা-সমর। জীবনের এই অন্ধকারময় সন্ধ্যাতেও আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, খসরু, তোমার ও আমার কৃত এ অপমান ও তজ্জনিত নিরাশার যন্ত্রণা, দীর্ঘকাল সহ্য করিতে পারিবে না। তুমি সিংহাসনে বসিলেই সে নিশ্চয়ই বিদ্রোহী হইবে। আমার এই অনুরোধ যে, সেই সময়ে তুমি আমার মত মার্জ্জনাশীল সম্রাটরূপে, স্নেহময় পিতারূপে, তাহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিও। তাহাকে হত্যা করিও না। কারারুদ্ধ করিও না। আমার নিকট আজ এই পবিত্র প্রতিশ্রুতি কর সেলিম। ভারতসম্রাট আকবরশাহ কখনও কাহার কাছে কোন ভিক্ষাই চাহেন নাই। সম্ভবতঃ এই খসরু যখন তোমার রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তখন ত আমি সেকেন্দ্রায় শান্তিময় গহ্বরে চির শান্তিময় নিদ্রাসমাচ্ছন্ন থাকিব। কে তখন এই নির্ব্বোধ খসরুকে বাঁচাইবে সেলিম! আমার চরণ স্পর্শ করিয়া, তুমি শপথ কর সুলতান! তোমার প্রতিশ্রুতি না পাইলে, মরণেও যে আমার শান্তি নাই।"

সম্রাটের এত ভালবাসা এই খসরুর উপর! মরণের পর তাহার কি হইবে তাহার জন্য এতটা ব্যাকুলতা!

সেলিম, পিতার পদযুগ স্পর্শ করিয়া তাঁহার ইচ্ছামত প্রতিশ্রুতি করিলেন। আকবরশাহ সেলিমের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—"সুলতান সেলিম! প্রাণাধিক পুত্র আমার, খোদা তোমার মঙ্গল করুন। আমার বুকের খুব একটা ভারি বোঝা তুমি এখনই নামাইয়া দিলে।"

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"কিস্ বাস্তে? দুনিয়াকি সারী খুঁশিয়া কি খাত্মা হো গই হৈ। ফির্ কিস্ উম্মেদ পর জিন্দ্গী বসর করুঙ্গী? এ্যায়ে রব্! মুঝে আপ্নে কদ্মোপর্ পনাহ্ দে। এ্যায়ে মৌৎ! এ্যায়ে রফীক্! তু মেরী সারী দর্দোঁ কো মিটা কর্ মুঝে হামাশাহ্ কে লিয়ে রাহৎ পৌছা।"*

শাহী-বেগমেব সকল আশার বন্ধন ছিঁড়িয়াছে। তাঁহার উপর বাদশাহের অবজ্ঞা ও বিরক্তি, খসরুর অবরোধ ব্যাপার—শাহী-বেগমের চিত্তের ভবিষ্যৎ আশা-সূত্র জাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন কবিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার শেষ আশা ভরসার স্থল ছিলেন—এই ভারতসম্রাট আকবরশাহ। যখন যাহা কিছু প্রার্থনা করিয়াছেন, সম্রাট তখনই তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন। হায়! তিনিও শেষে ভাগ্যদোষে নিষ্ঠুর হইলেন? এই কি হিন্দুস্থানের সম্রাটের ন্যায়বিচার—যে বিচারের ফলে আমার জীবনাধিক খসরু, মার্জ্জনাযোগ্য দোষে অপরাধীর মত নজরবন্দী হইল?"

দারুণ মনস্তাপে—প্রচণ্ড নিরাশা পীড়নে, শাহী-বেগম উল্লিখিত ভাবে জ্বালাময়চিত্তে, মনোভাব প্রকাশ করিয়া, মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছিলেন।

---

* আর কেন? সংসারের সকল সুখতো ফুরাইয়াছে। আর কি আশায় বাঁচিব? খোদা! মেহেরবান। আমায় তোমার চরণে আশ্রয় দাও। এসো—এসো—মৃত্যু! এসো সখা। আমার সকল জ্বালা নাশ কর। আমায় চির শান্তি দাও!

যাঁহার জীবনের সকল সাধ ভস্মীভূত হইয়াছে, সকল আশা চূর্ণ হইয়াছে, সুখের উজ্জ্বল দেউটীগুলি একে একে নিভিয়া আসিতেছে, সংসার যার চক্ষে তিক্ত, সুখসম্পদময়ী সরস প্রকৃতি যার চক্ষে শ্মশান, মলয়প্রবাহও যার পক্ষে বিষময়, যার প্রাণের চারিধার বেড়িয়া বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা অহরহঃ জ্বলিতেছে, সে বাঁচিতে চাহিবে কি সাধে ?

সেদিন যোধার অদৃষ্টের মত প্রকৃতিদেবীও ঘোর রণরঙ্গময়ী। সন্ধ্যা হইতেই খুব কালো মেঘে আকাশ ছাইয়াছিল। প্রহরাধিক রাত্রে ঝড় উঠিল, বৃষ্টি নামিল। বিদ্যুৎ চমকিল। আর ভীম প্রভঞ্জন প্রকৃতিবক্ষে মহাপ্রলয় উপস্থিত করিল।

যোধা অস্ফুটস্বরে বলিলেন—এই তো উপযুক্ত অবসর। সুপ্তা মেদিনী বক্ষে মেঘ, বৃষ্টি ও বজ্রনাদ। দিগন্তব্যাপী প্রলয়ান্ধকার। মেঘমন্দ্রের হৃদয়-স্তম্ভনকারী গুরুগম্ভীরধ্বনি। সুকৃষ্ণমেঘমালা মধ্যে দামিনী স্ফুরণ। মৃত্যুর অন্ধকার যেন সারা মেদিনী ছাইয়া ফেলিয়াছে। দাসীবাঁদী গোলামনফর, তাহারাও ঘুমাইতেছে। আর মরিবার জন্য আমি কেবল জাগিয়া আছি।”

শাহী-বেগম নিরাশ হৃদয়ে হাওয়া-বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যোমতলব্যাপী, কৃষ্ণমেঘের কোলে চঞ্চলা চমকিয়া উঠিল। যমুনাগর্ভ হইতে কালপুরুষ যেন যমুনার বুকে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—“এস শাহী-বেগম! যদি শান্তি চাও ত আমার রাজ্যে এস। আকবরশাহের পুত্রবধূ হইয়া কি সুখ পাইয়াছ তুমি শাহী-বেগম? আজন্ম জ্বালায় জ্বলিয়া, অগ্নিজ্বালাবিশুষ্ক শ্মশান-তরুর মত জীর্ণ অস্তিত্বের ফল কি? সুখভোগের জন্য জন্মিয়া আজীবন দুঃখ ভোগ যে বড়ই অসহনীয়।”

অশরীরি কালপুরুষের কঠোর আহ্বানবাণী শুনিয়া, শাহী-বেগমের

প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। আবার আকাশের বুকে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। ত্রাসকম্পিতা শাহী-বেগম, কোমলকরপল্লবে চক্ষুরাবরণ করিয়া, দ্রুতপদে তাঁহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হায়! কি দুর্ভাগ্য! ঘরে বাহিরে, কোথাও যে জ্বালার বিরাম নাই।

বেগম, নানাদিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলেন, "মৃত্যুই তখন তাঁহার শ্রেয়ঃ! মৃত্যুই জীবনের শান্তি! মৃত্যুই নব জীবন! মৃত্যুই ধ্রুব! মরিব—কিন্তু মরিবার সুবিধাকর উপায় কই? কে আমায় বলিয়া দিবে? যমুনাগর্ভে ত ডুবিয়া মরিতে পারিব না। সে মৃত্যু যে বড় লজ্জার কথা! অসূর্য্যম্পশ্যা, মোগলরাজকুলবধূর, বিগতপ্রাণ বিবর্ণ মৃতদেহ, যে সবারই চক্ষে পড়িবে! এটা যে শোচনীয় কলঙ্ক! মরিতেই যদি হইল তবে এ কলঙ্ক কিনিয়া মরিব কেন? মোগল-রাজকুলে সকলের ঘৃণার পাত্রী হইব কেন? তাহা হইলে কি উদ্বন্ধন! না—না—উদ্বন্ধনে মৃত্যু বড়ই যন্ত্রণাকর! বড়ই শোচনীয়! বাদশাহের পুত্রবধূর—গৌরবজনক মৃত্যুর পথ ত এ সব নয়।"

শয়তান এইবার উপযুক্ত অবসর পাইয়া বলিল—"কেন কাতর হইতেছ শাহী-বেগম? অম্বরপ্রাসাদ হইতে যে তীব্র হলাহল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলে—সে বিষের কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ? সে বিষ ত তোমার পেটিকার মধ্যেই লুকানো আছে। তুষারবাসিত সরবতের সহিত সেই তীব্র হলাহল মিশাইয়া আকণ্ঠ পান কর। বাদশার রঙ্গমহলে এর আগে অনেক বেগম মর্ম্মযাতনায়, প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, এইভাবে বিষপান করিয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।"

সম্রাটের পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া, আজ রাত্রে তোমার স্বামী সুলতান সেলিম আগরার রাজপ্রাসাদেই থাকিবেন। তোমার স্নেহের পুতলী খসরু

আগরা দুর্গমধ্যে নজরবন্দী! দাসীবাঁদী সবাই নিদ্রালসসমাচ্ছন্ন। ঝড়বৃষ্টির ভীষণ-নাদে, সমগ্র বিশ্বের বধিরতা উপস্থিত হইয়াছে। যাও—এখনই সেই তীব্র হলাহল বাহির করিয়া আন। কল্য প্রভাতে তোমার স্বামী সুলতান সেলিম এখানে আসিয়াই দেখিবেন, তুমি শয্যায় শুইয়া আছ—কিন্তু চেতনাহীন, স্পন্দহীন, অনুভূতি শক্তিহীন। মহানিদ্রায় তোমার আঁখি পল্লব, জন্মের মত মুদিত হইয়া গিয়াছে।

যোধাবাই শয়তানের ছলনায়, তখনই স্বর্ণখচিত এক ক্ষুদ্র হাত-বাক্সের মধ্য হইতে, পূর্ব্ব সংগৃহীত তীব্র হলাহল বাহির করিয়া, তাহা সরবতের সহিত মিশাইলেন। এই সময়ে আবার বজ্রধ্বনি হইল। তাঁহার হাত কাঁপিয়া উঠিল। ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া, শাহী-বেগম বিষপাত্রের নিকট হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা তিনি শুনিলেন, কে যেন একজন তাঁহার দ্বারপ্রান্তে আবির্ভূত হইয়া, অতি কাতরস্বরে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, "মা!"

এ যে খসরুর কণ্ঠস্বর! পাগলিনীর মত, শাহী-বেগম তখনই দ্বারের নিকটে চলিয়া গেলেন। সেই আহ্বানকারী যেন মায়াবলে অন্তর্দ্ধান হইল। যোধা ভয়ে নেত্রাবরণ করিলেন। পরক্ষণেই সেই কক্ষমধ্য হইতে, সেইরূপ ক্ষীণস্বরে, কাতরকণ্ঠে আবার কে যেন ডাকিল—"মা!"

শাহজাদী বেগম যোধাবাই, এই নবাগত শুভ্রবসনাবৃত মূর্ত্তি চিনিলেন। ও মূর্ত্তি যে খসরুর। সভয়ে সবিস্ময়ে দেখিলেন, খসরুর শুভ্র বসনের উপর সুলোহিত শোণিত চিহ্ন! চক্ষু কোটরগত, মুখজ্যোতিঃ পাণ্ডুবর্ণ, নেত্র পলকহীন, অঙ্গ স্পন্দনবিহীন। নিশ্চল পাষাণপ্রতিমার মত, ভিত্তিসন্নিকটে তখনও সে মূর্ত্তি নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

সেই ছায়ামূর্ত্তি যেন অস্ফুটস্বরে বলিল—"আর কেন মা? কি সুখের

আশায়, এ জ্বালাময় রাজপ্রাসাদে থাকিবে? জান না কি—আমার আজ মৃত্যু ঘটিয়াছে। গুপ্তঘাতকের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে, আমার হৃৎপিণ্ড ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছে। যার আশায় এখনও জীবনধারণ করিয়া আছ, সে এই সূক্ষ্মদেহ লইয়া জন্মের মত তোমার কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছে। মৃত্যু—মৃত্যু! কি শান্তি! সকলের সখা যে এই চিরশীতলস্পর্শ মৃত্যু! মহা পাপীর পুণ্য-বানের, সম্রাটের, ভিখারীর, চির শান্তিদাতা যে এই মৃত্যু! আর এক কথা শোন মা! যে আকবরশাহের আদেশে আমি কারারুদ্ধ হইয়াছিলাম, সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী সম্রাটও মরিয়াছেন। এ জগতে—মৃত্যুই ত অভ্রান্ত সত্য। জীবনটা প্রকাণ্ড মায়া-প্রহেলিকা, মহামিথ্যা। মৃত্যুর অত সহজ উপায় তোমার সম্মুখে রহিয়াছে। তবে মরিতে ভয় পাইতেছ কেন জননি? না মরিলে, তুমি তোমার খসরুকে আর দেখিতে পাইবে না।"

ছায়ামূর্ত্তি, তখনই সেই মর্ম্মরমণ্ডিত ভিত্তিগাত্র হইতে—তড়িদ্বেগে সরিয়া গেল। আবাব বিদ্যুৎ চমকিল। ইরম্মদ আবার ভীষণভাবে হুঙ্কার করিয়া উঠিল। শাহী-বেগম—মূহুর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া,সেই সরবত মিশ্রিত হলাহল, আকণ্ঠ পান করিয়া, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিলেন। সে শয্যা—যেন তাঁহার বাসর-শয্যা। শাহী-বেগম সেই মৃত্যুবিষেব ক্রিয়াবশে চক্ষু মুদিলেন। এটা নিদ্রা—না, চিরশান্তিময় মহানিদ্রার পূর্ব্ব সূচনা?

প্রভাতেও তাঁহার এ নিদ্রা ভাঙ্গিল না। এ চিরনিদ্রায় জাগরণ আনিবার শক্তি ত এ দুনিয়ায় সেই বিধাতাপুরুষ ভিন্ন আর কাহারও নাই। সব ফুরাইল! এত যন্ত্রণা, এত কাতরতা, এত নিরাশা, এত মর্ম্মদাহ এত উৎকণ্ঠা, এত ভাবনা—সব শেষ হইল। হায়! হতভাগিনী শাহী-বেগম!

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই ভীষণ ঝটিকাময়ী রাত্রে, শাহী-মঞ্জিলে যে ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়া গেল—জগতে কেহই তাহা জানিতে পারিল না। এই ব্যাপারে যাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল—তাঁহারাও—না।

সেইদিন সম্রাটের পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায়, হিতাকাঙ্ক্ষী ওমরাহগণের উপদেশে এবং কর্ত্তব্যের দায়িত্বে পড়িয়া, সুলতান সেলিম শাহী-মঞ্জিলে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই। হায়! যদি ফিরিতেন ত ভালই হইত।

পরদিন প্রভাতে শাহী-বেগমের প্রধানা বাঁদীই, এই ভয়ানক ব্যাপার সর্ব্ব প্রথমে জানিতে পারে। সে তখনই বাহির মহলে গিয়া, সম্রাটের বিশ্বস্ত সহচর ও সেনাপতি ফরিদবেগকে, এই ভীষণ অপমৃত্যু সংবাদ জানাইল।

বিপদে অবিচলিত, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, ফরিদবেগ দাসীবাঁদীদিগকে এ কথা প্রকাশ সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিয়া, তখনই যমুনার' পরপারে আগরা রাজপ্রাসাদে পৌছিলেন, সুলতান সেলিমকে অতি গোপনে শাহী-বেগমের মৃত্যু সংবাদ জানাইলেন। এ সংবাদ শুনিয়া সেলিম বজ্রাহত পথিকের মত চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার চোখের সম্মুখে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া উঠিল। স্পন্দনহীন নেত্রে—ফরিদের মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া

থাকিয়া তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"এও কি সম্ভব! ইয়ে মেরে মেহেরবান খোদা! আমার বুকে এ শেলাঘাত করিলে কেন প্রভু! এ মহাদুঃখ দিলে কেন প্রভু?"

ফরিদ, সেলিমের এই ব্যাকুল অবস্থা দেখিয়া, সাবধান করিয়া দিয়া বলিল—"সুলতান! সম্রাট ত আজ ভাল আছেন। আপনি এখনি শাহী মঞ্জিলে ফিরিয়া চলুন। পাষাণে বুক বাধুন। বড়ই সংকট ক্ষেত্র আপনার সম্মুখে। যাহা হইবার তাহাতো হইয়া গেল। তাহাতে বাধা দিবার শক্তি ত এ দুনিয়ায় কাহারও নাই। তবে কেন—বৃথা যাতনা ভোগ! এ সংবাদ, আগরা রাজপ্রাসাদে পৌছিলে ভয়ানক অনর্থ ঘটিবে।

এক অপ্রত্যাশিত মহাবিপদ তখন সুলতানের সম্মুখে। বুকের ভিতরে প্রলয়ের ঝড় উঠিলেও, তিনি অতি কষ্টে মনোভাব দমন করিয়া, উপস্থিত কর্ত্তব্য চালিত হইয়া, দীর্ণ হৃদয়ে, বিষাদমলিন মুখে শাহী মঞ্জিলে আসিয়া পৌছিলেন। তাঁহার মনের অবস্থা সে সময়ে ভয়ানক বিপ্লবময়। সারা বিশ্ব যেন তাঁহার চোখের সম্মুখে আগাগোড়া ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। শাহী-মঞ্জিলে প্রবেশ করিতে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

সকল বেগমের মধ্যে, এই শাহী-বেগম যে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। যেমন প্রতিদ্বন্দীহীন রূপ—তেমনি গুণ। রাজপুতের তেজ ও দর্প মুখমণ্ডলে, অভিমান—অন্তরের প্রত্যেক স্তরে, পতিপ্রেম—প্রত্যেক শিরার রক্তকণিকায়, আত্মসমর্পণ প্রত্যেক কথায়, প্রতি কার্য্যে আর অদর্শনে ব্যাকুলতা, মিলনে আনন্দ, পতিরহিতের জন্য সর্ব্বস্বসমর্পণ, সকল বিষয়েই

যে শ্রেষ্ঠ ছিল এই শাহীবেগম। হায় শাহী! হায় শাহী! কি সর্ব্বনাশ করিলে তুমি?

সেলিম, প্রাণের মধ্যে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা লইয়া, শাহী-বেগমের মৃত্যুচ্ছায়ামণ্ডিত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রাণে কম্পন, অঙ্গে শিহরণ, মস্তিষ্কে মহাবিপ্লব। রজতময় খট্টাঙ্গের উপর শুভ্রশয্যা আলো করিয়া, রত্নালঙ্কারমণ্ডিত,অপূর্ব্বরূপপ্রভাময় সুন্দর বপু নিশ্চল ভাবে পড়িয়া আছে। কে বলে, সে দেহে, সে মুখে, মৃত্যুর মলিন ছায়া পড়িয়াছে! না—না—এ ত মৃত্যু নয়—নিদ্রা! শাহী অঘোরে ঘুমাইতেছে।

সেলিম শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আকুল হৃদয়ে, উন্মাদের মত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন—"শাহি! শাহি! আমি আসিয়াছি।"

কে উত্তর দিবে? কোথায় শাহী? যে সংসারের সকল মায়া কাটাইয়া চলিয়া যায়, সে কি আর ফিরিয়া আসে? স্বামী ডাকিলে আসে না, পুত্র কাঁদিলে আসে না, পিতামাতার কাতরব্যথাময় চীৎকারেও ফিরিয়া চাহে না! হায়! এমনই মৃত্যুর শক্তি! এমনই এই মহা তিরোধানের প্রভাব।

সেলিম—ধীরে ধীরে সেই শয্যাপার্শ্বে আসিয়া, উন্মাদের মত বিকট-দৃষ্টিতে, একবার সেই রত্নখচিত, দর্পণমণ্ডিত, অসংখ্য স্ফটিক দীপাধার শোভিত, কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়া আবেগপূর্ণ স্বরে—বলিলেন—"অভিমান করিয়াছ? কাল আমি আসি নাই বলিয়া, কথা কহিতেছ না মানময়ি! আজীবন তোমায় জ্বালাইয়া আসিয়াছি বলিয়া, নিদ্রার ছলনায় আমায় প্রত্যাখ্যান করিতেছ, এত অভিমানিনী তুমি? এত নিষ্ঠুর প্রাণ তোমার?

ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট, পত্নীর চিরাত্মসমর্পণের চির উপেক্ষাকারী,

সুলতান সেলিম—তখনই যোধার সেই মৃত্যুমলিনদেহের উপর আছড়াইয়া পড়িলেন। আবার তখনই, ভয়ে, আতঙ্কে, নিরাশায় দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া উন্মাদের মত বিকট চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"না—না, এত জীবন নয়,—মৃত্যু! সুখের মৃত্যু নয়—ভীষণ আত্মহত্যা! শাহী শেষে আমায় ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল!"

দয়াময় বিধাতা! আমায় যে অমূল্যরত্ন কৃপাবশে দান করিয়াছিলেন, মূর্খ, বর্ব্বর, কাণ্ডজ্ঞানহীন আমি—সে রত্ন চিনিতে না পারিয়া, স্ফটিকখণ্ড-জ্ঞানে তাহাকে কালসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছি। জীবনেও আমার শান্তি হইবে না, মরণেও আমার স্মৃতির জ্বালা মুছিবে না। দাও করুণাময় বিধাতা! আমার এই সখীসঙ্গিনী, সচিবস্বরূপা, শাহী-বেগমকে ফিরাইয়া। আমি সিংহাসন চাহি না, দুনিয়ার ঐশ্বর্য্য চাহি না, আধিপত্য ও সম্রাটের দর্প চাহি না, আগরা রাজকোষের অতুল্য মণিমাণিক্যও চাহি না। আমার চিরজ্যোতির্ম্ময়ী, চিরপ্রেমময়ী, চিরউপেক্ষিতা, শাহীকে একবার ফিরাইয়া দাও। আমি তাকে দু'টো কথা জিজ্ঞাসা করি।

জীবনে যাহাকে অনাদব করিয়াছি, মরণে যাঁহার জন্য কাঁদিতে আসিয়াছি, চিরশীতল সমাধিগর্ভে যাহার শেষ বিশ্রাম স্থান রচনা করিয়া দিয়াও অতীতের স্মৃতি ভুলিতে পারিব না, তাহাকে একবার মুহূর্ত্তকালের জন্য, পুনরায় প্রাণময়ী করিয়া দাও। খালি একবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কোন্ অপরাধে সে আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল।"

সেলিম, শতবার সেই মৃত্যুমলিনমুখে ব্যাকুলভাবে চুম্বন করিলেন, তবুও শাহী অধীর ভাবে উঠিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল না। কত ডাকিলেন—সে উত্তর দিল না। কত সাধিলেন, সে ফিরিয়াও চাহিল না।

এই সময়ে, সেলিম সেই কক্ষদ্বারপ্রান্তে যেন কাহারও পদ শব্দ পাইলেন। তবে কি শাহী? না, এতো শাহী নয়। এ যে তাঁর প্রধানা বাঁদী রুবিয়া।

সেলিম রোষভরে বলিলেন,—"কে তুই?"

রুবিয়া বলিল—"আমি জনাবের বাঁদীর বাঁদী রুবিয়া!"

সেলিম। তুই শয়তানী! আমার দুঃখ দেখিয়া বিদ্রূপ করিতে আসিয়াছিস্?

রুবিয়া। সে সাহস ত এ বাঁদীর নাই শাহজাদা!

সেলিম রোষভরে হাঁকিলেন—"তাতারী জুম্‌রাণ!"

আহ্বানমাত্রেই এক কৃষ্ণকায়া তাতারী আসিয়া কুর্ণীস করিয়া, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। সেলিম সেই তাতারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"এ বাঁদীর বাঁদী রুবি, আমার দুঃখ দেখিয়া বিদ্রূপ করিতে আসিয়াছিল। ইহাকে কক্ষমধ্যে লইয়া গিয়া দশ কোড়া লাগাইয়া, শাহী-মঞ্জিল হইতে এখনিই দূর করিয়া দে।"

তাতারী বিস্মিতনেত্রে, একবার সুলতানের মুখের দিকে চাহিল। সত্যই কি সুলতান উন্মাদ! সে বলিল—"সুলতানের হিতের জন্য মরিতেও আমি প্রস্তুত, কিন্তু আমি জনাব মর্ত্তাজাখাঁর আদেশে এখানে আসিয়াছিলাম। এক অতি জরুর সংবাদ লইয়া খাঁ সাহেব আপনার কক্ষে অপেক্ষা করিতেছেন।

মুর্ত্তাজা খাঁর নাম শুনিয়া, সেলিম আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন। বাঁদীকে মুক্তি দান করিয়া, তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন। দেখিলেন, বাদসাহের সেনাপতি, তাঁহার প্রিয়সুহৃৎ, মুর্ত্তাজাখাঁ মলিন মুখে বসিয়া চিন্তামগ্ন।

মূর্ত্তাজার পাংশুমলিন মুখভাব দেখিয়া, সুলতান সেলিম মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। ব্যস্তভাবে বলিলেন—“সংবাদ কি মুর্ত্তাজা ?”

মূর্ত্তাজা বলিলেন, “সংবাদ বড়ই অশুভ! সম্রাটের পীড়া খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। মানসিংহ ও খাঁ আজিজ, খসরুকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য কূটচক্র আঁটিতেছেন। আপনি আগরা-প্রাসাদে সম্রাটকে দেখিতে গেলেই, তাঁহারা আপনাকে নিশ্চয়ই বন্দী করিবেন। এর চেয়ে অশুভ সংবাদ আর কি হইতে পারে সুলতান ?”

সেলিমের মুখমণ্ডল এই সাংঘাতিক সংবাদে, মলিন ভাব ধারণ করিল। তিনি মুখভঙ্গী করিয়া চিন্তিতভাবে কেবলমাত্র বলিলেন—“বটে!”

মূর্ত্তাজা বলিলেন—“কিন্তু এজন্য আপনার ততটা বিচলিত হইবার প্রয়োজন নাই। শাহী-মঞ্জিলের ছাউনীতে আপনার নিমকভোজী পাঁচ হাজার মোগলসেনা বসিয়া বসিয়া দানাপানি হজম করিতেছে। তাহাদের এই মুহূর্ত্তেই প্রস্তুত হইতে আদেশ করুন। তাহারা দৌলতবাগের ঘাটে—পার হইয়া, আগরার এক ক্রোশ দূরে ছাউনী করিয়া থাকুক। আর একটা কথা—শাহী-বেগমের এই শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ, এখনও আগরা-প্রাসাদে পৌছায় নাই। যতটা সংগোপনে পারেন, আজই রাত্রে বেগমকে দৌলতবাগে সমাধিস্থ করুন। কাঁদিবার সময় ঢের আছে সুলতান। আরও এক মহাক্রন্দন আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আর ইহাও জানিবেন, আমরাও আমাদের সেনাবল লইয়া আপনার সাহায্যার্থে প্রস্তুত থাকিব।”

মূর্ত্তাজা খাঁ, ব্যস্তভাবে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। মৃত্যুজ্বালার সঙ্গে মহা বিপদ আসিয়া জুটিলে, ঠিক্ যেন জ্বলন্ত অগ্নিতে [illegible]ের মত হয়।
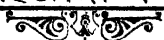
নানাদিক দিয়া ভাবিয়া, প্রাণের শোক প্রাণের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া, পাষাণে বুক বাঁধিয়া, অশ্রুপ্রবাহকে ধৈর্য্যের বাঁধে বাঁধিয়া রাখিয়া, সেলিম সেই দিন গভীররাত্রে, দৌলতবাগে তাঁহার প্রাণপ্রতিমাকে শীতল সমাধি-গর্ভে চিরবিসর্জ্জন করিয়া আসিলেন। সব গেল! মাটী, মাটীতে মিশাইল। রহিল—কেবল জ্বালাময়ী স্মৃতি, গলিত ধাতুস্রাবের মত অগ্নিময় মর্ম্মজ্বালা, সংযমদমিত দীর্ঘনিশ্বাস, আর অস্থিপঞ্জরভেদী মহাবিয়োগের প্রখর বিদ্যুৎজ্বালা।

সমস্ত রাত্রিটা সুলতান সেলিম, অশ্রুবর্ষণ করিয়া কাটাইলেন। সেই মর্ম্মরখচিত কক্ষ! সেই মিনার কাজ করা কক্ষ প্রাচীর! সেই অপূর্ব্ব কক্ষসজ্জা। সেই কক্ষবিলম্বিত—অসংখ্য স্ফটিক দীপাধার। সেই ফুলের সুবাস, সেই গবাক্ষপথপ্রবিষ্ট যমুনার শীতল বায়ুপ্রবাহ, সেই শ্যামা, দধিয়াল, ভৃঙ্গরাজ, পাপিয়ার সম্মিলিত সঙ্গীতকাকলী। কিন্তু যার জন্য এ কক্ষ এ ভাবে সজ্জিত—সে যে নাই। দেহ আছে—প্রাণ নাই। শূন্য পিঞ্জর পড়িয়া আছে, কিন্তু পাখী পলাইয়াছে। ফুলের পাপড়ি ঝরিয়া পড়িয়াছে, তবুও সুগন্ধ আছে। যাহাকে লইয়া স্মৃতির জ্বালা, সে গিয়াছে তবু স্মৃতি আছে।

পরদিন মধ্যাহ্নে সংবাদ আসিল, মানসিংহ ও আজিজ খাঁর চক্রান্ত বিফল হইয়াছে। মহা প্রতাপশালী ওমরাহ ও সেনাপতি সৈয়দখাঁ চাঘটাই, এই চক্রান্তের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া, মানসিংহের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। আর সম্রাট তাঁহাকে প্রাসাদে যাইতে আদেশ করিয়াছেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বর্ণখচিত পালঙ্কে, রোগবিশীর্ণদেহ ভারতসম্রাট শুইয়া আছেন। তিনি নিদ্রিত। নাড়ী অতি দুর্ব্বল—হৃদয়ের স্পন্দন অতি মৃদু। ঠিক যেন একটা মোহাচ্ছন্ন ভাব! আর তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, চিকিৎসক হাকিমআলি। হাকিমআলি, নিঃশব্দে, একদৃষ্টিতে সম্রাটের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। আর সেই রাজখট্টাঙ্গের, অতি নিকটে বসিয়া সম্রাটের নিকটাত্মীয় মহারাজ মানসিংহ ও খাঁ আজিজ, এবং বাদশাহের চিরানুগত বাল্যবন্ধু, শিকারসহচর কাদের জাঁহান মুফ্তি।

সুলতান সেলিম—বিলাসী, ব্যসনাসক্ত, আমীর ওমরাহগণের অসম্মানকারী, মহাপণ্ডিত আবুলফজলের হত্যাকারী, ইত্যাদি অনেক কথার অবতারণা করিয়া, মানসিংহ ও আজিজ খাঁ ওমরাহগণকে সেলিমের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাদাম্ভিক, মহাবীর, সৈয়দখাঁ চাঘটাই—একটী যুক্তিযুক্ত আপত্তি তুলিয়া, মহারাজ মানসিংহের সকল কূটচক্রই ব্যর্থ করিয়া দিলেন।

তিনি ওমরাহদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হইতে পারে, সুলতান সেলিম যথেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্ধত স্বভাব। তাহাহইলেও, তিনি ভিন্ন আর কাহাকেও আমরা সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিব না। ন্যায়ের, ধর্ম্মের, কর্ত্তব্যের অনুরোধে, সম্রাট আকবরশাহের নিমকের অনুরোধে, আমরা সকলেই সুলতান সেলিমকে সমর্থন করিব। আমি

সম্রাটের একজন প্রধান সেনাপতি। আমার কথা উপেক্ষা করিলে, আমি সম্রাটকে সব কথাই জানাইব। আপনাদের সকলকেই শূলে যাইতে হইবে। মহারাজ মানসিংহ! জনাব আজিজ্ সাহেব! এরূপ অন্যায় ব্যবস্থা করিলে আমি ও আমার অধীনস্থ আমীরগণ প্রাণপণে আপনাদের কার্য্যে বাধা দিব। সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্রই সিংহাসনাধিকারী। পুত্র থাকিতে পৌত্র কে?"

সৈয়দ খাঁর কথায় ভয় পাইয়া, অধিকাংশ আমীর-ওমরাহ সেই গুপ্ত সভা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। মানসিংহের দল দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তাঁহার সকল আশা ভরসার বিলোপ হইল। সৈয়দখাঁর আদেশে, রাজা রামদাস কছ্ওয়াহা তখনই সসৈন্যে আগরার রাজকোষ রক্ষায় ব্রতী হইলেন। এ সব হইতেছে ইতিহাসের কথা! এখন সম্রাটের মৃত্যুর মুহূর্ত্তের কথাই বলিব।

সম্রাটের ওষ্ঠপুট সহসা নড়িয়া উঠিল। রাজচিকিৎসক হকিমআলি তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"কি আদেশ করিতেছেন জাঁহাপনা!"

আকবরশাহ বলিলেন—"আলি! আমার শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত। খোদা আমায় আহ্বান করিতেছেন। কই সেলিম, এখনও যে আসিয়া পৌছিল না! হায়! আমার শেষ কর্ত্তব্যগুলি বুঝি আর করা হইল না।"

এই সময়ে সুলতান সেলিম, হকিমআলির ইঙ্গিতে, সম্রাটের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, বিষণ্ণমুখে, অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিলেন—"এই যে আমি শাহ-ইন্-শাহ! আপনার নরাধম পুত্র! আপনার অবাধ্য সন্তান!"

সম্রাট স্নেহময় স্বরে বলিলেন—"পিতৃস্নেহের নিকট, কোন সন্তানই [illegible] বঞ্চিত হয় না। যাহারা মনুষ্যনামের অযোগ্য—এমন

সন্তানকেও, পিতা অসীম স্নেহবশে, তাহার সকল অপরাধই মার্জ্জনা করিয়া থাকেন। বেশী আর কি বলিব সেলিম! তিনটী প্রধান চিন্তায় আমার জীবন কাটিয়াছে। প্রথম—সেই মহিমাময় দয়ার আধার, খোদা, যিনি এই দীন্ দুনিয়ার পয়দাকর্ত্তা—তাঁহার প্রতিনিধিরূপে এই রাজ্য শাসন। দ্বিতীয়—আমার এই আদরের হিন্দুস্থান। তৃতীয়—তুমি! আজ তোমাকে হিন্দুস্থানের তথ্ত দিয়া, আমি খোদার স্নেহময় ক্রোড়ে বিলীন হইতে চলিলাম। খাঁ আজিজ্! এই প্রাসাদে আমার আদেশমত প্রধান প্রধান আমীরগণ ও সেনাপতিগণ উপস্থিত আছেন ত?"

খাঁ আজিজ্ যুক্তকরে বলিলেন—"জাঁহাপনার হুকুমে, সবাই পার্শ্বস্থ কক্ষে জাঁহাপনার শেষ আদেশের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

আকবরশাহ বলিলেন—"বহুৎ খুব্! তাহাদের সকলকে একবার এখানে আসিতে বল।"

খাঁ আজিজের আহ্বানে সকলেই সম্রাটের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অবনত মস্তকে, লোকান্তরে প্রস্থানোদ্যত সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন।

আকবরশাহ, একবার সকলের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে একটা অপূর্ব্ব জ্যোতির আবির্ভাব হইল। সম্রাট তাঁহার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে সমবেত, ওমরাহদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বেশী কথা বলিবার শক্তি আমার নাই! জিহ্বা ক্রমশঃ অসাড় হইয়া আসিতেছে, নেত্র দৃষ্টিশক্তিবিহীন হইতেছে। তবুও দুই চারিটী কথা তোমাদের বলিব।"

"তোমাদের সকলেই শূরবীর, আমার আশ্রয়ে প্রতিপালিত, আমার অনুগ্রহে অতুল ধনেশ্বর। আমারই সৃজিত সমরক্ষেত্রে, অদ্বিতীয় সমরকুশল সেনাপতি। তোমরা তোমাদের অসি খুলিয়া, আমা

শেষ সম্মান প্রদর্শন কর। সবাই নতজানু হইয়া আমার শয্যাপার্শ্বে বসো।"

তখনই অসংখ্য অসিফলক কোষমুক্ত হইয়া উজ্জ্বল দীপালোকে ঝকমক্ করিয়া উঠিল। ওমরাহগণ, সম্রাটের আদেশে তরবারি সমর্পণ করিয়া যুক্তকরে তাঁহাব দ্বিতীয় আদেশ অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সম্রাটের নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। উচ্ছাসবশে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। স্বরের জড়তা উপস্থিত হইল। তিনি তখনই এই ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,—"আমার সকল আদেশই, তোমরা চিরদিন দেবতাব আদেশবাণীর মত মান্য করিয়া আসিয়াছ। যতক্ষণ এ নশ্বর জীবন, এ প্রাণকোষে প্রাণের অতি ক্ষীণ স্পন্দন—ততক্ষণ আমি আকববশাহ। এ হিন্দুস্থান ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার। শোন সকলে, আমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিমকে আমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিলাম। সেলিম রহিল, তোমাদের প্রতিশ্রুতি রহিল, আকবরশাহের শেষ আদেশ রহিল। যতদিন তোমাদের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন আমার সেলিমকে রক্ষা করিয়া চলিও। তোমরা আমার এই অবোধ সন্তানের পিতৃতুল্য, সোদব তুল্য, সখা তুল্য! সকলেই আমার শেষ শয্যা স্পর্শ করিয়া শপথ কর!"

সম্রাটের আদেশে সকলেই শপথ গ্রহণ করিল। সম্রাটের ইঙ্গিতে তাঁহার এক পার্শ্বচর, তাঁহার নিজ ব্যবহৃত উষ্ণীষ ও তরবারি আনিয়া দিল। পরপারের পথিক সম্রাট—তাহা স্বহস্তে সেলিমকে পরাইয়া দিলেন।

জীবনদীপের তৈল ফুরাইয়াছে। নেত্র আরও জ্যোতিঃহীন হইতেছে। চারিদিকে প্রলয়ের অন্ধকার নামিতেছে। সেই মাংসপেশীময় বিশাল ... শিথিল হইয়া আসিতেছে। শেষ সব ফুরাইল! সম্রাট মৃত্যুর

মুহূর্ত্তপূর্ব্বে কেবলমাত্র বলিলেন—"সেলিম! শাহীবেগমকে দেখিও। খ—স—রু! খো—দা!"

আর বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না। দীপ নিভিল। নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। ধরণী কাঁপিল। দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা মহারবের ভীষণ প্রতিধ্বনি জন্মের মত লোপ পাইল! গ্রহনক্ষত্র জ্যোতিঃহীন ভাব ধারণ করিল। গভীর শোকাচ্ছন্ন হইয়া চাঁদ, আকাশের গায়ে খুব কালো মেঘের অন্তরালে মুখ লুকাইল। প্রকৃতি স্তব্ধনিশ্বাসে, দিল্লীশ্বরের মৃত্যু দেখিল। মরুভূমির মধ্যে যে নিঃশ্বাসের অবির্ভাব হইয়াছিল, আগরার মণিখচিত—অসংখ্য দীপালোকিত কক্ষে, সে নিশ্বাসের তিরোভাব হইল। আকবরের মৃত্যুর পর সেলিম, "আবুল মজঃফর নূরউদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর" নাম ধারণ করিয়া, হিন্দুস্থানের মসনদ অধিকার করিলেন। খসরুর, মানসিংহের ও খাঁ আজিজের সকল আশা ফুরাইল। আর নিজকক্ষে পীড়িতাবস্থায় শায়িত শাহজাদা খসরু জানিতেও পারিল না, যে তাহার দুইটী সাংঘাতিক সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। সে মাতৃহীন ও পিতামহ হীন হইয়াছে!

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আকবরের মৃত্যুর পর—সমগ্র হিন্দুস্থান বিশেষতঃ রাজধানী আগরানগরী গভীর শোকাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। জাহাঙ্গীর ও আগরার সমস্ত ওমরাহবৃন্দ, বিগতপ্রাণ সম্রাটের দেহ স্কন্ধে বহন করিয়া, নগ্নপদে, শূন্যমস্তকে, সেকেন্দ্রার অন্ধতমসময় গহ্বরে, তাহা অনন্তকালের জন্য নিক্ষেপ

করিলেন। বলাবাহুল্য—হতভাগ্য শাহজাদা খসরুও এই শববাহী দলের মধ্যে ছিল! সে নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ, অশ্রুপূর্ণ নেত্র। হায় খসরু!

সময়ের মত চিকিৎসক আর নাই। দিনের পর সপ্তাহ, সপ্তাহের পর পক্ষ, পক্ষের পর মাস, ধীরে ধীরে কাটিয়া গেল। জাহাঙ্গীর বাদশাহ, পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

অন্য কেহ হইলে মানসিংহ ও আজিজ্ খাঁকে হত্যা করিতেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর আত্মীয়শোণিতে হস্তরঞ্জিত করিলেন না। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে মার্জ্জনা করিয়া,—মানসিংহকে আরও উচ্চপদ দিয়া, বাঙ্গলার ভৌমিকদের বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করিলেন। আর খাঁ আজিজকে পঞ্চনদের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। আবুলফজলের হত্যাকারী, অর্চ্চার রাজা, বীরসিংহদেও, নূতন সম্রাটের নিকটে কৃতজ্ঞতার চিহ্নরূপে প্রচুর পুরস্কার ও জায়গীর লাভ করিলেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর, আকবরশাহের মৃত্যুর পরদিনেই খসরুকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। খসরু তখনও জানিতে পারে নাই যে তাহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। এমনি জাহাঙ্গীরের মন্ত্রণাগুপ্তির চাতুর্য্য। খসরুকে জাহাঙ্গীর, ইলাহাবাদ প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব ভার দিতেও চাহিয়াছিলেন কিন্তু সে তাহা লয় নাই। তাহা হইলেও, তিনি তাহার উপর সমস্ত বিরাগ ভুলিয়া গিয়া, তাহাকে যথেষ্ট আদরযত্ন করিতে লাগিলেন।

রাজ্যাভিষেক উৎসবের পরেও, তাহার মাতা শাহীবেগম, আগরা প্রাসাদে আসিলেন না দেখিয়া, খসরু বড়ই সন্দিগ্ধ হইল। সে পিতাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার মা এখন কোথায় পিতা?" বড়ই কাতর প্রশ্ন। পিতার চক্ষের অশ্রুধারা, মুখে—ব্যাকুলতা, বিষাদ মলিন

ভাব, আর পিতাকে তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে বিলম্ব করিতে দেখিয়া, খসরু আবার বলিল,—"জাঁহাপনা! আমার মা কোথায়?"

খসরুর এই আকুল প্রশ্নে, জাহাঙ্গীরের চক্ষু দুটী ছল ছল করিয়া উঠিল। সম্রাটনেত্রনিঃসৃত দুই একবিন্দু উষ্ণ অশ্রুধারা, খসরুর হাতে পড়িল। খসরু চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—"কাঁদিতেছেন কেন আপনি জাঁহাপনা। তবে কি আমার মা নাই?"

জাহাঙ্গীর আর গোপন করিতে পারিলেন না। যে সাংঘাতিক শোচনীয় সংবাদ, দুইমাস কাল তিনি অতি গোপনে রাখিয়াছিলেন, তাহা ত আর চাপিয়া রাখা চলে না। জাহাঙ্গীরের নেত্রনির্গত শোকাশ্রুই যেন তাঁহাকে হাতেনাতে ধরাইয়া দিল। তিনি বলিলেন—"প্রিয়তম পুত্র! প্রাণাধিক খসরু! তোমার জননী শাহীবেগম এখন স্বর্গবাসিনী। ধরিতে গেলে, তুমি আমি, আর সম্রাট আকবরই তাঁহার অকালমৃত্যুর কারণ।"

জাহাঙ্গীর, সবিস্তারে সেই ভীষণ দিনের সমস্ত ঘটনা, ধীরে ধীরে পুত্রের নিকট বিবৃত করিলেন। তাঁহার জননীর পবিত্রদেহ যে দৌলত-বাগে বিনাড়ম্বরে সমাহিত হইয়াছে, তাহাও বলিতে ভুলিলেন না।

খসরু এ শোচনীয় সংবাদে বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। বজ্রাহত ব্যক্তির মত উদাসদৃষ্টিতে, পিতার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তাহাহইলে দুনিয়ায় আমার আপনার বলিবার আর কে রহিল পিতা!"

জাহাঙ্গীরের মনে এই সময়ে মৃত সম্রাটের নিকট অতীত শপথের কথা জাগিয়া উঠিল। "আমার মত মার্জ্জনাশীল পিতা হইও"—এ কথাও মনে পড়িল। জাহাঙ্গীর খসরুর অশ্রুধারা মুছাইয়া দিয়া, তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিলেন,—"কেন খসরু! আমি ত রহিলাম।

সমগ্র হিন্দুস্থানের এই বাদশাগিরি, একচ্ছত্র আধিপত্য, এ মসনদ—একদিকে—আর তুমি একদিকে।"

খসরু পিতার চরণে ধরিয়া, অশ্রুপূর্ণনেত্রে, কম্পিতস্বরে বলিলেন,—"পিতা! আমিই আপনার অকৃতজ্ঞ সন্তান। আমার একটী প্রার্থনা পূর্ণ করুন। তাহা না হইলে এ জীবনে আর আমি শান্তি পাইব না। আপনি যদি দৌলতবাগের কুঠীতে আমায় মাস কয়েকের জন্য থাকিতে অনুমতি দেন—তাহাহইলে আমি মাতার সমাধির উপর অশ্রুবর্ষণ করিয়া, আর পিতামহের সমাধির পার্শ্বে বসিয়া প্রাণের শান্তিলাভ করি।"

জাহাঙ্গীর, খসরুর এ সঙ্গত প্রস্তাবে কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। খসরু সেইদিনই আগরা প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া, যমুনার অপর পারে "দৌলতবাগে" চলিয়া গেল। শাহী-মঞ্জিল হইতে দৌলতবাগ দুইক্রোশ। খসরুর সঙ্গে গেল, তাঁহার পেয়ারের কয়জন বাঁদী আর পিয়ারা বেগম।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

খসরু আজকাল বড়ই অব্যবস্থিত চিত্ত। সর্ব্বদাই খেয়ালের অধীন। দিন কতক আজিজ খাঁ ও মানসিংহ, খসরুর মনে হিন্দুস্থানের মস্‌নদের সুখস্বপ্ন জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, আকবরশাহের মৃত্যুর সঙ্গে সে স্বপ্ন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দুই দুইটা দারুণ শোক ভুলিবার জন্য তিনি সেরাজি ধরিলেন।

খসরুর অনেক কুসঙ্গী ছিল। শাহজাদা খসরু, এখন বাদশাহপুত্র বলিয়া পাঁচ হাজারী মন্সবদার। শাহজাদা রূপে যে সব জায়গীরের স্বত্ব জাহাঙ্গীর নিজে উপভোগ করিতেন, তাহার সবই খসরুকে দিয়াছিলেন।

আগে কোন উৎসব ব্যাপার ভিন্ন, খসরু সেরাজি স্পর্শ করিতেন না। কিন্তু জাহাঙ্গীরের পুত্র ত তিনি। পিতার শাসন-শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত হইয়া তিনি এই ভরাযৌবনে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে লাগিলেন। মদিরাস্রোতে, সুকণ্ঠী সুন্দরী বাঁদীদের সঙ্গীতঝঙ্কারে, আনন্দ কোলাহলে, বিলাসের তাণ্ডব নর্ত্তনে, দৌলতবাগের কক্ষগুলি প্রচণ্ড কোলাহল মুখরিত হইতে লাগিল। শান্তিময় কক্ষে শয়তানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

পিয়ারাবানু—সবই দেখে, সবই শুনে। যে শাহজাদা খসরু একদণ্ড তাহাকে নয়নান্তরাল করিয়া থাকিতে পারিতেন না, এখন তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়াই পিয়ারার পক্ষে বড় দুর্ঘট। পিয়ারা—স্বামীকে অনেক বুঝাইত। তিনি যে সম্রাটপুত্র, ভবিষ্যতে হিন্দুস্থানের মালিক, তাহাও বলিতে ভুলিত না। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মেরকাহিনী। শাহজাদা খসরু পিয়ারার ক্রমাগতঃ উপদেশে, বড়ই ত্যক্ত হইয়া অন্দরমহল ত্যাগ করিলেন। পিয়ারা, প্রতিদিনই তাহার খাসবাঁদী আমিরাকে খসরুর সন্ধানে পাঠাইত, খসরু তাহাকে গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিতেন। এই দুই মাসে এতটা অধঃপতন হইয়াছে শাহজাদা খসরুর!

যখন প্রাণের জ্বালা খুব বাড়িয়া উঠিত, খসরু দৌলতবাগ প্রাসাদের নিভৃতপ্রান্তে রচিত মাতৃসমাধির পার্শ্বে বসিয়া, বালকের মত অবিরল

অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন। অগুরু, কস্তুরী, জাফরান্‌মিশ্রিত সুগন্ধি পুষ্পমাল্য, মাতৃসমাধির উপর বিছাইয়া দিয়া, সমাধিবেষ্টনকারী মর্ম্মরবেদীর চারিদিকে লোবানের কিম্বা অগুরুর সুগন্ধ দীপ জ্বালিয়া দিত। আর সেই সমাধিপার্শ্বে নতজানু হইয়া বসিয়া, অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিত—"কোথায় গেলে তুমি রত্নালঙ্কারভূষিতা, উজ্জ্বল জ্যোতিঃবিমণ্ডিতা, রাজরাজ্যেশ্বরী জননী আমার! পিতা আমার এখনতো ভারত-সম্রাট! তাঁর সিংহাসনের পার্শ্বে যে তোমার আসন শূন্য পড়িয়া আছে। এস মা একবার! এই চিরশীতল, চিরান্ধকার, সমাধিগর্ভ হইতে উঠিয়া। তোমার আদরের খসরু, তোমার জীবনসর্ব্বস্ব খসরু, তোমার নীরব সমাধি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে।"

এ জগতে আমার তাহাহইলে কেহই কি আপনার নাই? কই কেউতো আমার এই মহাদুঃখে সান্ত্বনা দিতে আসিল না! সর্ব্বসন্তাপ-নাশিনী, স্নেহের পবিত্রমন্দাকিনী, মা যাহার নাই, তার কি দুনিয়ায় কেহই নাই? কেন পিয়ারা বেগম ত আমার আছে! কিন্তু কোথায় পিয়ারা বানুর সেই হাস্যরঞ্জিত সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল, কোথায় সেই আবেগময় সম্বোধন! কোথায় তার সেই পলকে প্রলয় জ্ঞান! কোথায় তার সেই বিরহে কাতরতা, মিলনে—প্রফুল্লতা! দেখিতেছি, সারা দুনিয়া আমার উপর করুণা বিহীন। আমার দীর্ণ হৃদয়ের শোণিত শোষণে উদ্যত। আমায় কাঁদাইতে, ভাবাইতে, তারা ভালবাসে—আনন্দ পায়। এ দুনিয়া কি জাহান্নমে যায় না?"

খসরু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, চোখের জল মুছিয়া, সেই সমাধিভূমি ত্যাগ করিল। দৌলতবাগের ফুলের বাগান চিরদিনই প্রসিদ্ধ। খসরু

সেই চন্দ্রালোকিত পুষ্পবাসসমাকুলিত উদ্যানপথে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিল, এক মম্মরবেদীর উপর কে যেন নিস্পন্দভাবে শুইয়া আছে !

খসরু সেই শুভ্রপ্রস্তরবেদীর নিকটস্থ হইবামাত্র, যে শুইয়াছিল সে পদশব্দ পাইয়া উঠিয়া বসিল। খসরু অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, সেই চন্দ্রালোকবিধৌত মম্মরবেদীর উপব শুইয়া, পেয়ারেবানু বেগম !

খসরু বিরক্তিব স্বরে বলিল,—"তুমি এখানে কেন পিয়ারা !"

পিয়ারা বলিল—"আমাকে কি এখানেও আসিতে নাই শাহজাদা ?"

খসরু। তা বলিতেছি না। একাকিনী তুমি। এত রাত্রে তোমার ভয় করে না ?"

পিয়াবা। আমার সকল ভয় যে তোমাব জন্য প্রাণাধিক ! তুমিত আগে এমন ছিলে না। দিনরাত সেরাজীপানে বিভোর থাক, শতবার ডাকিয়া, লোক পাঠাইয়া, তোমার দেখা পাই না। সমস্ত রাত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রভাত করিয়া ফেলি, তাহাতেও তোমার করুণা হয় না। তোমার বাঁদী আমি। চরণাশ্রিতা পেয়ারা বেগম আমি। সেবিকা আমি। সর্ব্বস্ব আমি ! এখনও আমার কথা শোন। এখনও সৎপথে ফিরিয়া এস। তুমি এখানে যাহা কিছু কর, তার সকল সংবাদই তোমার পিতার কাণে গিয়া পৌছায়। তাঁর নিযুক্ত ও অর্থে ক্রীত বাঁদী ও বান্দারা এই মহলে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহা বোধ হয় তুমি জাননা। এখন হইতে বুঝিয়া চল—নিরাশার কষ্ট, ভুলিয়া যাও। আশার ছলনা পদদলিত কর। আমাকে আনন্দময়ী বলিয়া আলিঙ্গন কর। এ হিন্দুস্থান একদিন তোমার হইবে।"

খসরু বিরক্তির সহিত বলিলেন—"আর তুমি তখন রাজরাজেশ্বরী

হইয়া আমার পার্শ্বে, সেই মসনদে বিরাজ করিবে কেমন পিয়ারা! এই তো তোমার সুখস্বপ্ন! একদিন তোমার পিতার পরামর্শে, যে হলাহল তুমি আমার শরীরের শোণিতকণার মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিলে, সেই বিষের প্রচণ্ড জ্বালা, আজও ভোগ করিতেছি। আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ তুমি! আর কেন?"

খসরুকে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া, পিয়ারা তাঁহার পদযুগ ধরিয়া বলিল—"স্বামিন্! নিষ্ঠুরের মত পদদলিত করিয়া চলিয়া যাইও না; আমার আর কে আছে?"

খসরুর স্কন্ধে তখন শয়তান চাপিয়াছে। সেরাজাপানের একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা, তাহার প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছে। সে থাকিবে কেন? শয়তান যাহাকে টানে—সে যে জাহান্নমের পথই ধরিবে। কাজেই খসরু, পিয়ারাকে রুষ্টভাবে বলিল—"পথ ছাড়! বৃথা ত্যক্ত করিও না, কেন অপমানিত হইবে—পিয়ারাবানু?"

পিয়ারা বুঝিল, তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। সেই চিরানুরক্ত শাহজাদা, এখন এতটা বিরক্ত তাহার প্রতি! পিয়ারা, আবার খসরুর পদযুগ ধরিয়া বলিল "আমার মানঅপমান সবই তুমি। তোমার অনুরাগ বিরাগ, সবই আমার চক্ষে সমান। তোমার চরণের দাসী, চরণ ধরিয়া আছে। পার যদি—তাহাকে অতি নিষ্ঠুরের মত পদদলিত করিয়া চলিয়া যাও!"

নির্ম্মম খসরু, হৃদয়হীন খসরু, পিয়ারার কাতরক্রন্দন এসব অনুনয় বিনয় কিছুই কাণে তুলিল না। সেই শয়তান খসরু, কোমলাঙ্গী, রোরুদ্যমানা বড়ই অভিমানিনী, বড়ই গরবিণী, পিয়ারাকে পদাঘাত করিয়া, ঘৃণার সহিত, বিরক্তির সহিত, সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

এই আঘাতে সোনারলতিকা পিয়ারা মাটিতে লুটাইতে লাগিল। তারপর আশায় বুক বাঁধিয়া, নেত্রমার্জ্জনা করিয়া বলিল—"মেহেরবান্ খোদা! ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া, কখনও আমি তোমায় একান্তচিত্তে ডাকি নাই। আজ ডাকিতেছি। আমার সকল দর্প চূর্ণ হইয়াছে, সকল ভ্রম ভাঙ্গিয়াছে। দয়াময়! আমার নিজের কোন কামনাই নাই, কোন প্রার্থনাই নাই। তুমি আমার বিপথচালিত স্বামীকে সুপথে চালিত কর। তাঁহার উপর তোমার মঙ্গলাশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর। এ দুনিয়ায় আমার আর কেহই যে নাই! জাহাঙ্গীর বাদশাহের, জ্যেষ্ঠ পুত্রবধু আমি। এই কি আমার শাস্তি! এই কি আমার সুখ? বড়ই হতভাগিনী আমি যে খোদা।"

পেয়ারা নেত্রবারি মুছিয়া স্পন্দিতহৃদয়ে, ক্ষুব্ধচিত্তে, তাহার মহলে চলিয়া গেল। আর খসরু, তাহার সেরাজীসেবী মোসাহেবদলের সহিত মিলিয়া, এক নারকীয় অতি বীভৎস আনন্দে মত্ত হইলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে আরও তিনমাস কাটিল। খসরুর মধ্যে বিধাতা যে সব মানবদুর্ল্লভ সুগুণ নিহিত করিয়াছিলেন, তাহার সবই তখন কুসঙ্গে আর সেরাজীর শক্তিতে লুপ্তপ্রায়। বুদ্ধিবিকৃত, মস্তিষ্ক সদাই উত্তেজিত। কুসঙ্গীদের প্রলোভনে, এই সময়ে খসরু গোপনে সেনাসংগ্রহ করিতে

লাগিলেন। তিন চারিজন দুর্দ্দান্ত সেনাপতি—তাঁহাকে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিল। তাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন, আফগান আবদুল রহিম ও সেনাপতি হাসান্‌বেগ।

শয়তানেরা বিদ্রোহী খসরুকে পঞ্জাব দখল করিতে পরামর্শ দিল। পঞ্জাব দখল করিলে, প্রচুর অর্থ, যথেষ্ট সেনাবল, তাঁহার করায়ত্ত হইবে। তারপর মানসিংহ ও তাঁহার শ্বশুর খাঁ আজিজ, যদি গোপনে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করেন, তাহা হইলে বাহুবলে তিনি বিশ্ববিজয়ী। আগবাব মসনদ্‌ নিশ্চয়ই তাঁহার হইবে।

জাহাঙ্গীর তাঁহার পুত্রের মতিগতি বিশেষ সন্দিগ্ধনেত্রেই লক্ষ্য করিতে-ছিলেন। ইতিমধ্যে দুর্জ্জয়সিংহ, একদিন সুযোগমত তাঁহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া, অনেক গুহ্যকথাই ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে। দুইখানি প্রয়োজনীয় পত্র বহুদিন পূর্ব্বে মানসিংহ তাহাকে রাখিতে দিয়াছিলেন। কিন্তু নানা ঘটনাচক্রে তিনি তাহা ফিরাইয়া লয়েন নাই। এই পত্র দুইখানিই খসরুর বিরুদ্ধে সাংঘাতিক প্রমাণ। ইহার একখানি পত্রে খসরু মানসিংহকে লিখিয়াছিলেন—"যদি আপনি আমার পিতাকে নজরবন্দী অথবা কারারুদ্ধ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে হত্যা করিবেন না। তাঁহার চক্ষু অন্ধ করিয়া দিবেন। এজন্য পুরস্কাররূপে অর্দ্ধেক হিন্দুস্থান আপনাকে ছাড়িয়া দিব।"

জাহাঙ্গীর নানাবিধ কূট প্রশ্ন করিয়া, যখন দুর্জ্জয়সিংহের সেই পত্র দুখানির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেন, তখন তাঁহার প্রাণে প্রতিহিংসার দাবানল জ্বলিল। সেইদিনই তিনি খসরুকে বন্দী করিয়া, গোয়ালিয়র দুর্গে আবদ্ধ রাখিবার সংকল্প করিলেন। দুর্জ্জয়সিংহ জাহাঙ্গীরের সেনাদলে

সেনাপতির পদ পাইল। আর খসরুর আবাস স্থান দৌলতবা গ, সম্রাটের আদেশে, সেইদিনই ভীমকায় সতর্কনেত্র মোগল প্রহরীবেষ্টিত হইল।

কিন্তু—খসরু, দুর্ব্বুদ্ধিচালিত হইয়া, এক ঝটিকাময়ী রাত্রে, কুসঙ্গীদের সহিত ছদ্মবেশে, পুরীর বাহির হইয়া গেলেন। কেহই তাঁহাকে ধরিতে পারিল না।

খসরুর পলায়ন সংবাদ, পরদিন প্রভাতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাণে পৌঁছিল। তিনি গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পাইলেন, খসরু পাঞ্জাবে গিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিবে। আর খসরুর এক বিশ্বাসী অনুচর, সম্রাটের কঠোর পীড়নে, সমস্ত গুহ্যকথাই ব্যক্ত করিয়া ফেলিল। জাহাঙ্গীর প্রচুর সেনাবল লইয়া, পাঞ্জাবে খসরুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

এই বিদ্রোহ ব্যাপারে খসরুর শেষ সর্ব্বনাশ ও অধঃপতন সূচনা হইল। খসরু লাহোর অবরোধ করিলেন। লুটপাট করিয়া অর্থ ও সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। গোবিন্দ-ওয়ালের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, খসরু পিতৃহস্তে বন্দী হইলেন। সম্রাট, নির্জ্জিত পুত্রকে লইয়া আগরায় ফিরিলেন। খসরু কারাগারে রহিলেন।

কারাগারের যন্ত্রণার উপর দিয়া, সব ব্যাপার মিটিয়া গেলে—খসরু সে যাত্রা পরিত্রাণ পাইতেন বটে, কিন্তু তাহা হইল না। মৃতসম্রাটের নিকট প্রতিশ্রুতিস্বত্বেও, জাহাঙ্গীর পুত্রের উপর মার্জ্জনাশীল হইতে পারিলেন না। খসরু তাঁহাকে একদিন কারারুদ্ধ করিয়া অন্ধ করিয়া দিবার জন্য, মানসিংহের সহিত পরামর্শ আঁটিয়াছিল, সে সাংঘাতিক পত্র তখনও তাহার হস্তগত। খসরুর এই বিদ্রোহের শাস্তি অতি ভয়ানক হইল। ইতিহাস বলে, সম্রাট জাহাঙ্গীর ক্রোধান্ধ হইয়া, পুত্রের চক্ষু অন্ধ

করিয়া দেন। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী সমসাময়িক ইতিহাস লেখক টাভার্নিয়েও এই অন্ধত্বের কথা, তাঁহার ভ্রমণ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

নেত্রের জ্যোতিঃ বিনষ্ট করিয়া, সম্রাট পুত্রকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন। রাজপ্রাসাদের কয়েকটী কক্ষ খসরুর জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। হায! নিষ্ঠুর পিতা! কোথায় রহিল আকবরশাহের নিকট তোমার সেই প্রতিশ্রুতি, যে তুমি তাঁহার মত মার্জ্জনাশীল পিতা হইবে। দোষ ত তোমার নয় সম্রাট! দোষ এই হতভাগ্য—চিরবিড়ম্বিত, চিরবিপথচালিত খসরুর অদৃষ্টলিপির। হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ সম্রাট যে খসরু, সম্রাট আকবরের পৌত্র যে খসরু, শাহী-বেগমের জীবনসর্ব্বস্ব যে খসরু, মহা পরাক্রান্ত মানসিংহের ভাগিনেয় যে খসরু, তাহার এই অন্ধত্ব—এই শোচনীয় পরিণাম, এই জীবন্মৃতবৎ অবস্থা, তাহার ললাট লিখনের শোচনীয় পরিণাম। কিন্তু এই অন্ধত্বেও খসরুর জীবন-লীলার অবসান হয় নাই। দীর্ঘকালব্যাপী অন্ধত্বের পর, আরও কি ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা আমি "সম্রাজ্ঞী নূরজাহানে" ব্যক্ত করিব।

খসরু তাঁহার এই দৃষ্টিহীনতায় তিলমাত্র ব্যথিত নহেন। অনুতপ্ত শাহজাদার মনের দৃঢ়বিশ্বাস, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং পিতৃদ্রোহিতার উপযুক্ত ফলই হইয়াছে। এই শোচনীয় অবস্থায় সবাই অন্ধ খসরুকে ত্যাগ করিল। সঙ্গে রহিল—কেবল সেই অভাগিনী পিয়ারা-বেগম। আর আকবরসাহের বিধবা রুমি-বেগম! রুমির কাতর অনুরোধেই জাহাঙ্গীর পুত্রকে হত্যা না করিয়া চিরান্ধ করিয়া দিলেন। অতি শোচনীয়ভাবে অন্ধ খসরুর দিনগুলি কাটিতে লাগিল। পতিপরায়ণা, স্বামীর সুখদুঃখভাগিনী পিয়ারার সান্ত্বনাই, খসরুর তখন একমাত্র সুখ।

খসরু, তাঁহার কক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী হাওয়া-বারান্দায় বসিয়া আছেন। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। সেদিন পূর্ণিমা। চাঁদের আলো যমুনার বুকে পড়িয়া, তার ফেনিল কৃষ্ণসলিলকে রজতস্রোতময় করিয়া দিয়াছে। খসরু একদৃষ্টে যমুনার দিকে চাহিয়া আছেন। যমুনার কল কল ছল ছল ধ্বনি—তার শ্রুতিযুগলের তৃপ্তিসাধন করিতেছে!

খসরু তখন একা। পিয়ারা একটু আগে তাঁহার কাছে ছিল। খসরুর অনুরোধেই পিয়ারা তাহার কক্ষ হইতে বীণটা আনিতে গিয়াছে কেননা খসরু তাঁহার এই অন্ধত্বের দিনে, দুঃখের দিনে, তাহার দুঃখের সঙ্গিনী পিয়ারার গান শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। পিয়ারা ঈশ্বরের মহিমাসূচক ভক্তিভরা গজলগুলি গাহিত। তাহা শুনিয়া খসরুর প্রাণে একটা শান্তি আসিত

খসরু আসন হইতে উঠিয়া, হাওয়া বারান্দার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উন্মুক্ত আকাশের দিকে চাহিয়া যুক্তকরে বলিলেন—"দাও চির আলোকময়! আমার নেত্রের জ্যোতিঃ ফুটাইয়া। দাও চির জ্যোতির্ম্ময় আমার এই অন্ধকার চক্ষুসম্মুখে আবার নূতন দীপ্তি ফুটাইয়া। কতদিন আমি নীলাকাশে তারকার জ্যোতিঃ দেখি নাই, কতদিন আমি, অনন্ত ব্যোমগাত্রে তুলারাশিবৎ মেঘরাজ্যের মধ্যে চাঁদের লুকোচুরী খেলা দেখি নাই। কতদিন আমি গোলাপের রক্তরাগ, চামেলির শুভ্রজ্যোতিঃ দেখি নাই। কতদিন আমি আমার জীবনসঙ্গিনী পিয়ারার সুন্দর মুখখানি দেখি নাই। খোদা! মেহেরবান! বাসনার ধ্বংশে, প্রবৃত্তির সমাধিতে, আকাঙ্ক্ষার বিসর্জ্জনে, মনের শান্তি পাইয়াছি বটে, কিন্তু প্রাণের মধ্যে কি যেন একটা হাহাকার ধ্বনি আলেয়ার সুরে নিত্যই

জাগিয়া উঠে। শয়তানী পূর্ণিমা! তোমার অভিশাপই ফলিল। যে নেত্রের ছলনায় একদিন তোমার রূপ দেখিয়া উন্মাদ হইয়াছিলাম, আজ কোথায় সে পাপের অগ্রদূত আঁখিতারা আমার! কিছুই আর চাহি না তোমার কাছে করুণাময় খোদা! পলকের জন্য—মুহূর্ত্তের জন্য আমায় একবার দেখিতে দাও তোমার ঐ তারকামণ্ডিত, শশাঙ্ক জ্যোতিঃপূর্ণ নীলাকাশ, ঐ শোভাসম্পদময়ী নৈশপ্রকৃতি, ঐ যমুনা কত সুন্দর!"

এই সময়ে ছায়া মূর্ত্তির মত একজন তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া স্নেহময় কণ্ঠে বলিল—"কি দেখিতেছ একদৃষ্টে তুমি শাহজাদা?"

খসরু একটু মলিন হাসি হাসিয়া, পিয়ারার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, বলিলেন—"এখনও তোমার ভ্রম গেল না পিয়ারা বানু! এখন কি আমার দৃষ্টি আছে! কি দেখিব আমি? আমার বহির্দৃষ্টি লোপ পাইয়াছে—অন্তর্দৃষ্টি বাড়িয়াছে। বিরাটবিশ্ব আমার চোখে ডুবিয়া গিয়াছে—কিন্তু প্রাণের মধ্যে সেই মঙ্গলময় বিশ্বপতির বিরাটরূপ অধিকার বিস্তার করিতেছে। নেত্রের আর কি প্রয়োজন! আমার দুঃখের সঙ্গিনী, চিরআদরিণী, স্বামী-সেবা পরায়ণা, পতিপ্রেমোদ্বেলিতা পিয়ারা, যতদিন আমার পার্শ্বে থাকিবে, ততদিন যে আমি নেত্রময়—দৃষ্টিময়।

খসরু পিয়ারাকে আবার প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। বিশ্বপ্রকৃতি এই প্রেমাভিনয়ে যেন হাসিয়া উঠিল।

সম্পূর্ণ।